লখীন্দর দিগার

লখীন্দর দিগার

গুণময় মান্না

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা ৯

শ্রীসুধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তেরশো পঞ্চান্ন সালের সতেরোই অগ্রহায়ণ সকাল বেলা।

লাঙলের ফলার মুখে মাটি ফেড়ে উঠছে। একটা লম্বা রেখা, তার দুপাশে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে এলানো মাটির ঢেলা। শুকনো বা সবুজ ঘাস, কাটা-ফসলের বুঁচি চাপা পড়ছে সেই মাটিতে। সেগুলো পচে সার হয়ে উঠবে।

'হেট্-ট্-টা ট্-ট্ হট্...হেই...'

শিরা-ওঠা লম্বা হাত দুটো লাঙলের বোঁটাখানাকে চেপে ধরেছে শক্ত করে। ওই হাতের মধ্যেই আর একটা কাঠিও ধরা আছে। গোরুগুলোকে শাসন করতে হবে, পথ-নির্দেশ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, মাটিও অবাধ্য। কোথাও পিছলে যাবে ফলা, কোথাও বা বেশি পোঁতা হয়ে আটকে যাবে। তাই, আগে-পেছনে টেনে, বামে-ডাইনে হেলিয়ে, বা ওপরে-নিচে চাপ কমিয়ে-বাড়িয়ে সতর্ক থাকতে হয়। ভুরু কুঁচকে ওঠে।

'ও রাম, তোর শীত কাট্‌ল ?'

সারি দিয়ে চার জন কৃষক লাঙল করছে।

মাথায় ময়লা চাদর জড়ানো। সামনের দুজনের গায়ে গামছা, তৃতীয় জন কোঁচার খুঁট জড়িয়েছে, আর চতুর্থ জন একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা।

'আর অখিল মামা, ই যে শীত পড়েছে, ই কাটবেনি। কাল রেতে আবার জ্বর এসছিল গো...'

'কুইলান খেইছ ?'

যে-উত্তর প্রায়ই শুনতে হয়, তাই রাম বললে। অনেকবার অনেক কিছু করা হয়েছে, কিছুই হয়নি।

শীতের এই সময়টা চাষ দেবার সময় নয় সাধারণত। সমস্ত মাঠে এখন আমন ধান ফলে সোনা বিছিয়ে রয়েছে। এখন ফসল কেটে ঘরে তোলার সময়। কিন্তু মনসাখালির ধারে, মাঠের শেষ প্রান্তে এই নিচু জমিগুলোর কথা আলাদা। মা-লক্ষ্মী দুবার ফসল দেন এতে। ভাদ্রের শেষে একবার আউস তুলেছে ওরা। আবার এখন চাষ দিচ্ছে, শীগ্রিই 'বোরো' ধান রুইবে ওরা। মনসাখালির নিচে বেঁধে তারই জলে সেচের ব্যবস্থা হবে। ফসল উঠবে চৈত্র মাসে।

শীতের সকালটা বিষণ্ণ মনে হয়। কুয়াশা অনেকটা কেটে গিয়েছে, কিন্তু

আবহাওয়া পরিষ্কার নয় মোটেই। পুবদিকে লাল-বর্ণ সূর্যের রোদ এই কুয়াশা কেটে এসে মাঠে পড়ছে ছড়িয়ে। এখনো সে আলোর বিবর্ণতা কাটেনি।

দুটি মানুষের ধোঁয়াটে ছায়া এসে পড়ে ওদের সামনে। তাড়াতাড়ি করে হেঁটে এগোচ্ছেন জমির পাশের উঁচু আল দিয়ে ঝাঁকরার ফণীবাবু, আর শ্যামচন্দ্রবাবু। ওঁরা বাঁকায় গিয়ে বাস ধরবেন ঘাটাল যাবার। এখান থেকে বারো মাইল পুবের মহকুমা-শহর ঘাটাল।

'ফণী খুড়া দেরী করে ফেললেন যে গো। এতখন ত কোন কাল ক্যাঁচকা-ফুরের মাঠ পেরি যান গো?'

ফণী খুড়ো তাকালেন। হাসলেন একটু।

'বলি, তোমার শাউড়ী কি ছাড়েনি নাকি। ভর রাতটাই ধরে রেখে দিলে?'

এবার ফণীবাবু হাসলেন ভালো করে। এ পরিহাসে যোগ দিতে হবেই। গ্রামের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ। সে ভাব এড়ানো যায় কী করে।

'না রে বাবু। তোমার খুড়ীই ছাড়েনি রে বাবু। নাও গো বিড়ি নাও।'

তারপর আর দেরী সয় না। রাস্তার ওপরেই বিড়িটা রেখে ফণী খুড়ো চলে যান। হাতে-বোনা মাফলারটা টান করে জড়িয়ে নেন মাথার চার দিকে। তাঁর সঙ্গীটিকে বলেন, 'বোধ হয় বেলা হয়ে গেল।'

'না, বাস্ তো আটটায়। সাড়ে আটটারটা পেলেও চল্‌বে।'

এই তাড়াতাড়ি করার কারণ আছে। ঘাটালের ফৌজদারী কোর্টে কাজ ওঁদের। অন্তত সোমবারটা ঠিক সময়ে পোঁছনো চাই।

এদিকে বিড়িটা পড়েই থাকে রাস্তার ওপর। আরো কিছুক্ষণ ওখানে পড়ে থাকবে। এক দম কাজ করার পর বিশ্রাম নেবার সময় বিড়িটা খাবে। যখন খুশি যেমন-তেমন করে লাঙল বন্ধ করতে পারে না ওরা। বড় জোর একটু আগেই ওরা দম নেবার জন্যে থামতে পারে, এই যা।

ফণীবাবু আর শ্যামবাবুর কথা ভাবছে ওরা। প্রত্যেক সোমবারে ওঁরা ঘাটালে যাবেন, ফিরে আসবেন শনিবারে বিকেলে। বেশ আছেন ওঁরা। টাকা-কড়ি তো মন্দ রোজগার হয় না, তার ওপর গাঁয়ে খাতির কত ওঁদের। এ-অঞ্চলের মামলা-মকদ্দমা কম নয়। প্রত্যেক ব্যাপারে ওঁদের তোষামোদ করতে হবে। না করেও পারা যায় অবিশ্যি, কিন্তু মামলার তদ্বির করলে যতটা ফল পাওয়া যায়, না-করলে তার আধা ফলও হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ফস্‌কে যায়।

'তা অখিল-মামা, আজকাল অদের আর খাতির নাই। উ কোর্টের

লোকদিকে আর দেখতে পারেনি কেউ। ই শালা আজকাল আইন-কাইনের কুন্থু ঘাড়গন্দান নাই। তার উব্‌রে আবার নোতন আইন হচ্ছে। আগে তবু আইনের সত্যি-মিথ্যে ছিল!'

অপর দুজন কৃষকের নাম লখীন্দর দিগার আর পরান মণ্ডল। লখীন্দরই এদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। সবাই তাকে দাদা বলে ডাকে।

সে বললে, 'কুন কালে আর আদালতের সত্যমিথ্যা ছিল, বাবু। সব কালেই সমান।'

এ নিয়ে কথা আর এগোয় না। অন্তত, এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো বিদ্যে নেই ওদের।

অখিল কিন্তু বলে, 'যাই বল তুমি লখীন্দদাদা, আমার কিন্তু উ কোটের কাজ ভাল লাগে। ভগমান ত কপালে দেয়নি। পোড়াকপাল, লেখাপড়া বাবুগিরি আমাদের ভাগ্যে নাই। সেই শুভঙ্করী কষতম পাঠশালে, তারপর লাঙলবাড়ি ধরেছি। আর ওই শ্যামচন্দ, উ আমার কাছে তেরিজ কষা দেখি' লিত। আর তার আজ লসিব দেখ...'

রাম তার কথা কেড়ে নিলে। 'আর ফণীবাবু কি বলে জান। সেদিন ওর কাছে লাঙলের দাম আনতে গেলম, তা উনি বললে, তোরা বেশ সুখে আছু, রাম। জিগাসলম, তা কেমন করে হয়গো খুড়া? বলে, তোরা খাটিস, তোদের মাগ-ছেলে খাটে। তার উব্‌রে, ই খালে মাছ ধরসি, উ জলায় শাক তুলসি। কিনিস তোরা ক-পয়সার জিনিস! আর আমাদের দেখ, একলা কাজের মানুষ, একগাছি ঘাসও কিন্‌তে হয়। কদিক সামলাই। আমার বড্ড রাগ হল বাবু, কিণ্তক কিছু বলতে পারলমনি।'

রাম তার এই রকমই এক অভিজ্ঞতার কথা বলে। 'সেদিন কেঁচকাপুরের সিং-মশায়দের ওখেনে খাট্‌তে গেছলম। ছোট-তরফের বাবু বলল কি জান? বলল, রাজা হবার থেকে পরজা অনেক ভাল বাবু। থালে আর জমি সামলাবার ঠ্যালা পুয়াতে হবে নি!'

লখীন্দর এরপর কথা বলে। বাঁ দিকের গোরুটার ল্যাজ মুড়ে দিল ও। এইবার বাঁক ফিরতে হবে।

'থালেই বল। কেউ সুখী নাই রে বাবু। আমার কথাটা যদি লাও ত বলি। তোমাদের লখীন্দদাদার ত বয়স কম হলনি। ঘাটালে গেছি গো অনেকবার, মেদ্‌নীপুরটাও চক্কর দিয়ে এসেছি। এই সেদিনে একবার ঘাটাল

গেছলম ভাইপোটাকে জামীন দিতে। তা সে রকমটি আর নাই। আগে মানুষ সুখী ছিল। এখন দুহাতে পয়সা লুটছে, কিন্তু আনন্দ নাই।'

'হ্যাঁ দাদা, ইটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এমনটা কেনে হল বল দিকিনি। আমার কথাটাই ধরনা, আগে ক'পয়সাই বা পেতম...'

এ আলোচনা পুরাতন। এ ব্যাপারে সবার অভিজ্ঞতাই সমান।

লখীন্দর বলে, 'তবু ব্যাপারটা দেখ একবার। সবাই ভাবছে তার কপালটাই মন্দ, অন্য লোকে ভাল আছে।'

'কেনে এমনটা হল বল দিকিন!' রাম আবার বলে।

'হবেনি কেনে। আজকাল জাত-ব্যবসা করে কেউ! শালা বামুন বলে, রইল তোমার পূজা-আচ্চা, শহরে যেয়ে জুতার দোকান ফাঁদল। চাষা বলছে, ল্যাঙলের বোঁটা ধরবনি আর। আমার কথাটা ধর থাহলে। তুমি ভাবছ রামের কাজটা ভাল, রাম ভাবছে অখিলের কাজটাই ভাল।'

রাম বললে, 'তাহলে সতীশবাবু যে বলত সব কাজই ভাল, সেটা তমারগে বলতে চাও থালে সত্যি?'

সতীশ এ অঞ্চলের নামজাদা, ফেরারী কৃষককর্মী। তার কথায় এদের মধ্যে সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে।

তবু অখিল কথাটার প্রতিবাদ করে। 'উ কথাটা আমি মানতে পারবনি। তোমারগে বলতে চাও, উকীল-মুক্তার আর চাষীমানুষ সব এক দরের লোক, থালে পণ্ডিতে-মুখ্যুতে তফাত নাই?'

লখীন্দর বললে, 'তা তুমি যাই বল অখিল, উ কথা আমার মনে লেয়।'

রাম উৎসাহিত হয়ে ওঠে। 'আমারও উ কথা খুব ভাল লাগে। কাজ ভগমানের ছিষ্টি, থালে ইটা বড় উটা ছোট হবে কি করে। তোমাদের পাঁচজনের আশীব্বাদে দু-পাঁচটা ধম্মকথা ত শুনেছি। তুমিই বল, রামচন্দ চণ্ডালকে মিতা বলেনি?'

'তাইত। সে চণ্ডালটি যদি তার কাজটি না করত, থালে রামচন্দের কাজ চলত কি করে। আজ তুমি চাষী, তোমার হাল বন্দ কর দিকিন, কালকে দেশের উকীল-মুক্তাররা দেখি কি খায়।' লখীন্দর বললে, আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে।

রাম বললে, 'সতীশবাবু থালে ঠিকই বলে বল।'

অখিল বললে, 'হ্যাঁ রাম, সতীশবাবুর খবর কি জান? অনেকদিন তেনাকে দেখিনি। সেই কবে বর্ষাকালে দেখেছিলম তেনাকে।'

'হ্যাঁ, উনি একজন ছেলার মত ছেলা। লেখাপড়া শিখেছে বটে, দেমাকটি নাই।'

'তা উনি এখন এখেনে নাই। কেউ বলে কলকেতায় গেছে চাকরি করতে, কেউ বলে, না, এখেনেই কোথাও আছে...লুকি' আছে। চাষাদিকে উনি বলে, তোমরা একটু জাগ। নিজেদের জিনিস বুঝে লাও। তোমরা যদি না পারলে ত তোমরা মরলে। মেরে ফেলবে তোমাদের!' রাম বলে।

অখিল বললে, 'তা তোমরা যাই বল বাবু, উনির কথা আমাকে ভাল লাগেনি। আমাদিগে উনি মাতি' দিতে চায়। ঢের দেখেছি, বাবা, কাজের সময় কেউ কোথাও নাই। লাভের দায়ে আমরাই মরব।'

লখীন্দর বলে, 'তা মন্দ বলনি তুমি। ই কথা ত অনেক দিন থেকেই শুনে এলম। আর ব্যাপারটা ত দেখছ। চাষীরা ত লড়ে দেখেনি এমন লয়, গুলিগোলাও চলেছে, মানুষ মরেওছে। কিন্তু আজ ই গেল ত সে এল। আবার সে একদিন গেল ত আর একজন, ই শালা এই রকমই চল্‌ছে। তবে, তুমি যে বললে, অখিল, ওরা আমাদিকে মাতি' দেয়, আর নিজেরা পালি যায়, তা ঠিক লয়। পিথিবীতে অনেক রকম মানুষ আছে, ভাই, ঠগও পাবে সাঁচ্চাও পাবে। তা ভাই ভাল বাবুও আমি দেখেচি।'

'সে কথা লয় তুমি ঠিক বললে। কিন্তু কে সাঁচ্চা আর কে মন্দ তা তুমি বুঝবে কি করে। হুঁহুঁ...'

'সে-কথা ঠিক। সেটা ঠিক।'

এদের মধ্যে পরান এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। ও কেবল হুঁ-হাঁ করেছে। হেসেছে নয়তো মৃদু মৃদু। ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখে বললে, 'এব্‌রে দম লাওগো...'

রোদ্দুর স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। কাছে-দূরে ঘাসের ওপর যে শিশির ছিল, তার চিহ্ন নেই। ওদের শীত কেটে গেছে কখন। গরম বোধ হচ্ছে শরীরে। হাতের, পায়ের পেশী টনটন করে উঠছে, টান হয়ে পড়েছে। একটু জিরিয়ে তামাক টেনে ঠিক করে নিতে হবে।

পরান আগে গিয়ে উঁচু আলটায় রাস্তার ধারে বসে। কলকেতে তামাক সেজে বলে, 'কইগো লখীন্দদাদা, লাও।'

গোরুগুলো জোয়াল-কাঁধে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেমনুটি দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওদের। জাবর কাটছে আস্তে আস্তে।

দূরে কেঁচকাপুরের গ্রাম পেরিয়ে এক সার মেয়ে-পুরুষ আসছে। মাথায় ওদের মাছের ঝাঁকা, মাছ বিক্রি করতে যাচ্ছে। ঝাঁকা মাথায় করে মেছুনীদের

পথ চলবার এক রকম অদ্ভুত ভঙ্গী আছে। দুলে-দুলে গমকে-গমকে এগোবে ওরা। সুগঠিত তাগা-পরা হাত দুটো আগে পিছে দুলিয়ে তাল রাখবে চলার। মাথার ওপর ঝাঁকাটাকে ধরার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এমনিই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

গ্রাম শেষ হয়েছে যে তাল-দিঘিটার কাছে, সেখানে বাঁক ফিরল ওরা।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে লখীন্দর।

'বেলা অনেক হল গো। মেছো-মাগিরা মাছ বিক্রি করতে যাচ্ছে!'

'তাই দেখি!'

হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে। রামের বাঁয়া-গোরুটা মাটিতে মাথা নামিয়ে শিং ঘষছিল। জোয়াল থেকে কোন-রকম ঘাড়টা খুলে যায় ওর। আর তারপর লাঙল থেকে সরে গিয়ে একটু ইতস্তত করে, প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না। তারপর সোজা দৌড় দেয়। একটু দূরে গিয়ে কয়েকটা পাক দিয়ে, ল্যাজটা ওপরে তুলে, শিঙ নামিয়ে।

রাম উঠে পড়ে ছোটে। 'হেই-হা-অঅ-হাঅঅ...'

মাথাটা খোলা পেতেই গোরুটা দৌড় দিয়েছিল, কিন্তু ওটা যে অত দূর অমন করে ছুটতে থাকবে সেদিকে খেয়াল ছিল না। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছে। 'শালাকে মেরে জল খাব আজ। যা-যা...গোভাগাড়ে যা, এ মুখো না হতে হয়।'

লখীন্দর সচকিত হয়ে ওঠে। 'শালা রামকে আজ ভুগাবে। পরান, যা না রে একবার...'

পরান ওঠে। রামের মতো অতো জোরে নয়, তবু ছুটতে থাকে ও। গোরুটা সোজা পুব দিকে ছুটছে। রাম দক্ষিণ দিক দিয়ে, আর পরান উত্তর দিক দিয়ে ছুটল।

ইতিমধ্যে মেছুনীর দলটা কাছে এসে পড়েছে। শ্রীবাস বললে দল থেকে হেঁকে, 'লখীন্দখুড়া, তামুক একটুন রেখো গো। একটু পেরি' দিয়ে এসি, কেঁচকাপুরের জলাটা পার করে দিই, বাবু।'

শ্রীবাস তার স্ত্রীকে মাছ বিক্রি করতে পাঠাচ্ছে। ঝাঁকাটা বয়ে দিয়ে গেল খানিকটা। কথামতো কেঁচকাপুরের মাঠটাও পেরোল না। শ্রীবাস, একটু এগিয়ে ফিরে এল। তামাকের আকর্ষণেই হয়তো ওর সঙ্গে আরও একজন ফিরে এল। সে হচ্ছে সুবাসী। ডাকসাইটে মেছুনা এ-অঞ্চলের। এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তাই রোজ যেতে পারে না। ওর মেয়েকে পাঠায়।

'সিবাস, এস বাবু। তামুক লাও।'

'লখীন্দখুড়া, আর শরীরটা বয়নি বাবু।' শ্রীবাস বসে পড়ে তামাক টানে। চাঙ্গা করে নেয় শরীরটা। তারপর আরামের নিশ্বাস ছাড়ে, 'আঃ, বাঁচালে বাবু।'

'কোথা মাছ চালান দিলে রে, বাবু। চন্দখানায়, লয়? তা দেশে-ঘরে কিছু বিচ্‌লে ত মাছের মুখ দেখি আমরা?'

'তাহলে হক কথা বলি, খুড়া', ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীবাস বললে, 'গাঁয়ে পয়সা পাই নি বাবু, পোষায়নি, বুঝতেই পারছ...'

'তা ঠিক, তা ঠিক ..' লখীন্দর ঘাড় নাড়ে, চিন্তিতভাবে।

'হ্যাঁ খুড়া, তুমি কি ই কথা শুনেছ...' শ্রীবাস কলকেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'গোবিন্দর মায়ের খবর শুনেছ?'

'নারে বাবু, কী হইছে বল দিকিন্। ঝাঁকরার উদিকে অনেকদিন যাইনি, বাবু।' ওরা ঘন হয়ে আসে, গোবিন্দ নামটা ওদের ভয়, আশা আর শ্রদ্ধা এক সঙ্গে উদ্রেক করে। 'গোবিন্দর খপর পাওয়া গেল কিছু? ওর মা নাকি পাগলের মত হইছে?'

'না রে বাবু, এতদিন সব ঠিক ছিল। তা আজ সকালে গোবিন্দর মা এল আমাদের ঘরে। বললে, মাছ দাও সিবাস চার পয়সার। বের্ত আমি আর পালন করবনি। যে ছেলার মায়ের এত অপমান হয়, সে ছেলার মঙ্গলের জন্যে আর আমি বের্ত করবনি। তা মাছ লিয়ে গেল। লখীন্দখুড়া কি ইসব শুন নাই কিছু?'

'না, কি হইছিল বল দিকিন?'

'চন্দখানা থিকে পুলিস এসেছিল ভোরবেলা। গোবিন্দর মাকে বলে, দে তোর ছেলাকে বার করে। কোথা রেখেছু বল। আমরা খবর পেইছি রেতের বেলায় তোর ছেলা ঘরে এইছে। গোবিন্দর মা যত বলে, আমি কিছুই জানিনি, ততই ওরা জুলুম করে। না, তুই জানু বল। ওকে ভয় দেখায়। শেষকালে রেগে গিয়ে বলে, ওগো বাবু দারগা, তোমরা ছেলাকে আমার কি খুঁজবে? আমি যে তার মা রইলম, আমার ব্যথাটা বুঝ দিকিন একবার। ভগমান যেন তাই করে, তোমরা তাকে খুঁজে পাও। না হয় তার মরা মুখটাও একবার দেখাও আমাকে। বাছাকে একবার দেখি। কতদিন দেখিনি বল দিকিন। বাছা একবছর কোথা চলে গেছে। দাও তোমরা একবার এনে। তা খুড়া, ই কান্নাকাটি কি পুলিসে শুনে। ওরা বড় আশা

করে এসেছিল, বাবু। বললে, তুই মাগী ছল করছু। ঘর-দোর তন্নতন্ন করল ওরা, তারপর গোবিন্দর মাকে ঘাড় ধরে বাইরে বার করে দিল পর্যন্ত।' ওরা কেউ কথা বলে না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীবাস আবার বলে, 'ই তোমাকে আমি বলে রাখলম খুড়া। ইটা কিন্তু ভাল হলনি। গোবিন্দর মাকে অমন করে অফমানটা করা ভাল হলনি। হাজার হোক মেয়া মানুষ। চাদ্দিকে কি সব শুনতে পাই, মানুষের আর মাথার ঠিক নাই। কখন কী যে হবে বলা যায়নি গো। এই তমাদের শীরসের কথাই ধর না, গোবর্ধনের সেই জমিটা লিয়ে কী হল? ই ছাড়া আবার আমনপুরের কথাও শুনা যায় আজকাল। তাই বলছিলম, দিনকাল বড় ভাল লয়।'

লখীন্দর এবারেও কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। তারপর শুরু করে আস্তে আস্তে, 'কিছু কিছু কানে আসে, সবই আসে। তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি, জানত কাচ্চা-বাচ্চা লিয়ে ঘর করি। কিন্তু ইটাও জানি গো, বাকি থাকবেনি কেউ, সবাইকেই টানবে।'

অখিল কিছু বলে না। জমিতে ও নেমে যায়। পরান গরুটাকে ধরেছে। ঠেঙিয়ে গোরুটার কিছু বাকি রাখেনি রাম। রাগে ও তখনও ফুলছে। তাই ওরাও কিছু কথা বলে না, বলতে পারে না। চুপচাপ যে যার কাজ করে চলে। গরুগুলোকে আবার লাঙলে জুড়ে দেয়।

'আজ তাহলে আসি, লখীন্দখুড়া।' শ্রীবাস বিদায় নিতে চায়।

'এস, বাবু।'

অনেক্ষণ পর্যন্ত লাঙলের কোঁচ-কাঁচ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। দূরে বনের ওপর দিয়ে চিলগুলো চক্রাকারে ঘুরছে। মাঠে মেয়েরা শাক তুলছে কোথাও, কোথাও বা গোবর কুড়োচ্ছে, ঘুটে তৈরীর জন্যে।

এক সময় রাম কাঁদতে আরম্ভ করে। হাতের লাঙলটা এদিক ওদিক বাঁকে। ঠিক রাখা যায় না।

'গোরুটাকে মেরে শেষ করে দিছি, বাবু। কিছু নাই আর!' ওর রোগা পাঁজর দুটো ওঠানামা করে। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে যায়। 'খেতে দিতে পারিনি। তাই বোধায় উ পেটের জ্বালায় ছুটেছিল।' কান্নার বেগটা কোন রকমে রুদ্ধ করে আবার বলে, 'খালেই বল। এতদিন কাজ করে দিল আমার! আজ ওকে দুটা খেতে দিতে পারলমনি। উল্টে ওকেই মারলম। ওহো-হো-ও...'

বুক-ফাটা কান্নামেশানো দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সজোরে

দুই

মতি, গোবিন্দের মা, স্নান করে শিব-মন্দিরে পূজো দিতে এল। এরই কথা চাষ দিতে দিতে কৃষকরা আলোচনা করছিল। বিধবা-মানুষ, তাই থান কাপড় পরা। আধময়লা, ধোয়া কাপড়। মাথায় রুখু চুলগুলো ভিজে— পরিষ্কার বোঝা যায়। দুপয়সার লাল চিনি, আর পূজারী বামুনের এক পয়সা দক্ষিণা নিয়ে এসেছে।

মন্দিরে ঢুকবার পথে মালতী আটকাল তাকে। মালতী ভিন্‌গ্রামের পরিচিতা মেয়ে, সকলের সঙ্গে তার স্নেহের সম্বন্ধ। মেয়েটি বালবিধবা, আত্মীয়-পরিজন-সহায়-সম্বলহীন হয়ে কোনও রকমে দিন কাটায়।

সে বললে, 'মতিপিসি, এমন সময় মাড়য় (মন্দিরে) পূজা দিতে এলে গা।'

'হ্যাঁ মা, একটু চানজল লুব।'

মালতী সতর্ক হয়ে মতির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল। আজ সকালেই ও খবরটা শুনেছে। মতির হয়রানি পীড়া দিয়েছে ওকে।

'একটু দেরী করে মাড়য় যাবে, পিসি।'

'কেনে গা, কেনে এমন কথা বলছু তুই?' পরিষ্কার বোঝা যায় মানসিক যন্ত্রণা আর নৈরাশ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মতি। স্নান করার পর মুখখানা কালো হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো লাল।

'মাড়য় হরি চৌধরীকে দেখলম, পিসি। তার ভাগনীও রইচে।'

একমূহূর্ত থমকে দাঁড়াল মতি। তারপর বললে, 'ঠাকুরের শীতল লি'যাচ্ছি মা, এখন রাগ-ঘেন্না করতে নাই।'

মালতী অবাক হয়ে তাকায়। 'তবে যে শুনলম...' একটু দ্বিধা করে তারপর সংকোচ কাটিয়ে বলে, 'পিসি, তুমি নাকি আর বার করবেনি শিবের? মাছ কিনতে গেছলে খাবে বলে?'

উত্তরে কেবল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মতি। কাঁধের ওপরকার থান কাপড়টা বিস্রস্ত হয়ে পড়ে অনেকখানি। পঞ্চান্ন বৎসরের বার্ধক্য। পাঁজরটা

পরিষ্কার দেখা যায়, গোণা যায় প্রত্যেকটি হাড়। সবেগে সেই হাড় কখানা ওঠা-নামা করে ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

মালতী মতির চেহারা আর অবস্থা দেখে অবাক হয়। এতটা সে আশংকা করেনি।

'আমার কপাল, মা, পোড়া কপাল...' কোন রকমে কথাগুলো উচ্চারণ করে মুখ ফিরিয়ে নেয় মতি। তারপর হাঁটতে শুরু করে।

অদম্য ঔৎসুক্যে অস্থির হয়ে ওঠে মালতী। সব কিছু জানবার জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে। অথচ এখন আটকানো যায় না মতিকে। তাই বলে, 'আমি ই বট গাছটার তলায় রইলম, পিসি, তুমি ফিরে এলে আমাকে বলবে...'

যে হরি চৌধুরীর কথা বলে মতিকে সাবধান করছিল মালতী, তার সম্বন্ধে ওর নিজের ভয় কম নয়। দরিদ্র, অসহায় মেয়ে হলে যা হয়, তার ওপর কুদৃষ্টি ছিল হরির। পাড়ার লোকেরা আশা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'উ হেলে সাপের লজরে পড়েছে, ব্যাঙের আর কদিন...'। কিন্তু মালতী এই আশঙ্কার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'মেয়ে মানুষ পা টিপে চলতে জানলে, এসুক দিকি কার বাপের সাধ্যি...'। আর সত্যিই এ পর্যন্ত ওকে গ্রাস করতে পারেনি হরি।

গোবিন্দ মিত্র আর তার মা মতির সঙ্গে ওদের ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। তাদের সম্বন্ধ অতি নিকট আত্মীয়ের, কিন্তু মুখ দেখাদেখি ছিল না। ধানগাছিয়া গ্রামের ছোট অথচ প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার অজয় রায়ের স্ত্রী সাবিত্রীর মামা হচ্ছে এই হরি চৌধুরী। আর সাবিত্রী তার নিজের আশ্রিতা এবং সম্পর্কীয়া বোন গায়ত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল গোবিন্দ মিত্রের। কিন্তু সে সম্বন্ধ সুখের হয়নি। গায়ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুই তার কারণ। লোকে বলে, গোবিন্দ মিত্র নাকি নিজের হাতে তার স্ত্রীর গলা টিপে মেরেছে। কারণ, কেউ বলে মেয়েটার স্বভাব-চরিত্তির খারাপ ছিল, কেউ বা বলে মেয়েটা গোবিন্দ মিত্রের গোপন রাজনীতিক কার্যকলাপের খবর পৌঁছে দিত অজয় রায়ের কাছে, সেই জন্য স্ত্রীকে হত্যা করেছে গোবিন্দ। তার পর নাকি রটনা করেছিল, সাপকাটিতে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

আসল ব্যাপারটা ছিল কতকটা এই রকম। গোবিন্দ দরিদ্রের ছেলে, কিন্তু সে যখন বি-এ পাস করে কলকাতা থেকে ফিরে এল, সাবিত্রী জেদাজেদি করে স্বামীকে বলে কয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল বোনের। বিয়ে করার পর গায়ত্রীর কুমারী-জীবন সম্বন্ধে এটা-ওটা শুনতে পায় গোবিন্দ, হরি চৌধুরীকে

জড়িয়ে। কিন্তু এ কথা সে কানে তোলে নি। 'আমি বিশ্বাস করি না ওসব কথা· ' এই বলে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল সে। স্ত্রীকে নিজে পড়াত সে, চেয়েছিল তাকে মানুষ করে তুলতে। পরিহাস করে স্ত্রীকে বলত, 'জমিদারের ঘরে শাড়ি-গয়না চিনেছ, কিন্তু দুনিয়ার আসল জিনিস চিননি, ছি-ছি...'। কিন্তু সেই গায়ত্রীই যখন ওদের কৃষক-সংগঠনের সব কথাই ভেতরে ভেতরে অজয় রায়কে চালান করে দিতে লাগল আর গোবিন্দ সে কথা জানতে পারলে, তখন দপ করে জ্বলে উঠল সে। পাশের গ্রামেই অজয় রায়ের বাড়ি, সমস্ত পথটা এক রকম টানতে টানতে নিয়ে এল ওকে, জলে-কাদায় ওদের কাপড়-চোপড়ের অবস্থা একাকার। বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে বললে, 'এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ হল। যদি কোন দিন আমাদের কুঁড়ে ঘরে তোমাকে দেখি, তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলব। এই হাত দেখে রাখ...'

সারা রাত দিদির পায়ের কাছে পড়ে ছিল গায়ত্রী, বার বার করে বলেছিল, 'উনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন না। তাঁর পায়ে ধরি যদি আমি ..'। সাবিত্রী অনেক বাধা দিয়েছিল বোনকে, কিন্তু আটকাতে পারে নি। ভোর রাত্রেই বেরিয়ে গেল সে, তখনও বৃষ্টি পড়ছে। পথে সাপকাটি হয়ে স্বামীর বাড়িতেই মারা যায় ও। সাবিত্রীরা এ কথা বিশ্বাস করে নি, গোবিন্দ যে ভয় দেখিয়েছিল সেটাকেই সত্য বলে রটিয়েছে। লোকেও তাই মনে করে।

গোবিন্দ স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সেই রাত্রেই কোথায় চলে গিয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে এই কথা শুনে বললে, 'থাক এই দুর্নাম, লোকে জেনে রাখুক · গুপ্তচরের শাস্তি এই রকমই হবে!' তার পর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এদের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।

যাই হোক, মন্দিরে ঢুকে পূজার সামগ্রী নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে বসে মতি। বসে বসে পূজো দেখে।

ভেতরে প্রচণ্ড উদ্বেগ কিন্তু বাইরে মালতীর সমস্ত চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে আসে। যেন একটি একাগ্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত চোখ মুখ ছাপিয়ে ঠাকুরের পদ-প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। এক সময় এই প্রশান্তি বাঁধ ভাঙে। মতি মন্দিরের মেঝের ওপর পড়ে চোখ দুটো ঠাকুরের দিকে তুলে ধরে। সমস্ত শরীরটা আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'হে বাবা শীতলানন্দ, আমাকে বাবা লাও তুমি। ই পাপীকে আর কেনে রেখেছ তুমি। গোবিন্দকে ভালোয় রেখ বাবা, তাকে আর আমি দেখতে চাই নি। তাকে তোমার ছিচরণে থান দাও।' কোন কথাই পরিষ্কার উচ্চারণ হয়

না, জড়িয়ে জড়িয়ে কেটে কেটে মতি বলে। চরম আত্ম-সমর্পণ যেমন করে হয়, নিজেকে আর পারিপার্শ্বিককে ভুলে যায় সে। মন্দিরে আর সব যাত্রীদের সম্বন্ধে কোন চেতনাই ওর নেই। ওর সম্বন্ধে তারা কী বলাবলি করছিল তাও শুনতে পেল না মতি।

'ছি ছি, মাগীর আবার সঙ দেখ! বেটার জন্যে দরদ একবারে উথলে উঠ্ছে। উ সব লোক-দেখানি ঢঙ...' হরি চৌধুরী বললে ভাগনীকে উদ্দেশ করে।

আরোগ্য-কামনায় মন্দিরের একটা দিকে ওরা বসেছিল। ওরাও পূজো দিতে এসেছে। আজ সাত বছর হল ওর ভাগনী অম্লশূলে ভুগছে। স্পষ্টত, হরি কী বলছিল শুনতে পেল না সাবিত্রী, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে নিজের যন্ত্রণাতেই বিহ্বল হয়ে ছিল ও। বিড়বিড় করে বললে,

'মামা, ই যাত্রা আমি আর বাঁচলমনি...'

হরি একবার কটমট করে তাকাল ভাগনীর দিকে, কিন্তু কিছু বললে না।

এক সময় মেঝে থেকে উঠে পূজারী ঠাকুরের কাছে স্নান-জল, বিল্বপত্র নেয় মতি। আজকে ওর দেবতার ব্রত শেষ হল। এক মাস নিয়ম করে রয়েছে মতি, ছেলের কল্যাণ কামনা করে। ছেলেকে একটিবার দেখবার আকাঙ্ক্ষা ওর দিনরাত্রির স্বপ্ন হয়ে আছে।

সেই ছেলের উপর অসহ্য রাগে ক্ষেপে গিয়েছিল মতি। বলেছিল, মাছ খেয়ে তার ব্রত ভঙ্গ করবে। যে ছেলের জন্যে মাকে এত অপমান সহ্য করতে হয়, তার জন্যে আবার ব্রত!

মালতী, মতির সঙ্গে ওর বাড়ি পর্যন্ত এল। ওর বাড়ি এপাড়ায় নয়, তবু কী এক সম্পর্কে মতিকে পিসি বলে ডাকে। মতিদের বাড়ি প্রায়ই আসত! কিছুদিন নানা কারণে মালতী আসতে পারেনি। গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ্রহ ওরও কম নয়, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে ও বলতে পারে না। বরঞ্চ ও বললে,

'দেখ পিসি, আমার মনে লিচ্চে গোবিন্দার (গোবিন্দদার) ই কাজ ভাল হচ্ছেনি। তুমি মা, এমন করে কষ্ট পাচ্ছ, তোমার অপমানের শেষ নাই, আর তিনি কি করছে সে-ই জানে! বলি মাকে ত আগে দেখতে হয়, তারপর অন্য কাজ...' অনেকক্ষণ চুপচাপ একসঙ্গে হাঁটবার পর এক সময় মালতী আস্তে আস্তে বলে।

সরু সরু আলপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। রোদ্দুর ওদের চারপাশে

মাঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। শীতটা কিন্তু বেশি বলে এ-রোদে শরীর গরম হচ্ছে না। মালতী পেছনে ছিল। মতির ক্লান্ত পা, আর ঝুঁকে-পড়া চেহারা দেখে ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। মালতী নিজে চিরদুঃখিনী মেয়ে। কিন্তু মতির এই কষ্ট সওয়া যায় না।

মালতী আরও বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মতি ওকে বললে, 'উ কথা আমিও আগে ভাবতম...' অসাধারণ শান্ত হয়ে এসেছে ওর কণ্ঠস্বর, ধীরে ধীরে একটি একটি করে উচ্চারণ করে মতি, 'দেখ মা, আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবতম আমি। কিন্তু ভেবে দেখ মা তার কথা। গোবিন্দ...সে কি সুখটা পেলে? অমন সনার চাঁদ ছেলে আমার, এই বয়সে না পেলে ইস্তিরি...' হঠাৎ মতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বউএর ওপর নিদারুণ ক্ষোভ সত্ত্বেও ও বলে, 'কিন্তু বৌকে আমি গাল দিইনে, মা। যেমন জন্ম তেমন তার ফল হবে ত? কিন্তু লোকে সে কথা বুঝ্‌লনি। সবাই গোবিন্দকে খুনে বলবে ই আমি সহ্য করতে পারবনি, পারবনি...'

কেঁদে ফেলল মতি। ওর গতি মন্থর হয়ে আসে। আধখোলা পিঠটা পর্যন্ত কান্নার কাঁপুনি দেখা যায়।

'না পিসি, উ কথা সবাই বলেনি। গোবিন্দাকে কেউ ত নিন্দা করেনি। সবাই ত সুখ্যাত করে। গোবিন্দা যে খারাপ করছে সে কথা কেউ বলবেনি। কিন্তু বাবু, ভাল কাজ করবি ত, মাকে ত আগে দেখবি। তা না করে ভাল কাজ করলি ত কি হল...'

মতি প্রতিবাদ করে। 'উ কথা আমার মনে লেয়নি মা। আমার সুখটাই আমি দেখছিলম এতদিন, কিন্তু তার সুখটার কথা ত মনে করিনি। বাছা যে আমার ঘর দুয়ার ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার লিচ্চয় কুন্থু ব্যাপার আছে, মা। আমরা মুখ্যু মানুষ কি বুঝব?'

মালতী কথাটা চিন্তা করছিল। বল্লে, 'সে কথা তুমি ঠিক বলেছ, পিসি। নিজের কথা চিন্তা করলেই দুঃখু বাড়ে। আমার দুঃখু, আমার কষ্ট...এই করলে দুঃখু আরও বাড়ে বটে!'

'তবে, জান মা...' এমনিতেই মতির গলা অত্যন্ত কাহিল হয়ে এসেছিল, তার ওপর ও আস্তে আস্তে বলতে শুরু করায় পেছন থেকে মালতী শুনতে পাচ্ছিল না। ও মতির পাশে এগিয়ে এল।

'সতীশকে জান, মা? তোমাদের পাড়ার মণ্ডলদের সতীশ। সে আমার বাছার মতই লুকি' আছে। ত সে দুদিন এসেছিল আমার কাছে রাত্রে।

বললম, গোবিন্দর সঙ্গে আমার একবার দেখা করি' দাও। ত উ বলে, সে হবেনি। জান ওরা কি কষ্টে আছে? কতদিন খেতে পায়, কতদিন পায় নি, রাত্রে গাছ তলায় বনের মধ্যে কেটেছে অনেক দিন·· ত সে কি সুখে আছে?' তারপর কথা আটকে যায়, যে কথাটা অনবরতই অনুভব করছে মানুষ, সে কথাটা বলে কী করে। কথায় কথায় মতির বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে মালতী। মতি বলে, 'আয়, দেখে যা, স্বচক্ষে দেখে যা, সিপাই কি করেছে দেখে যা···'

এ প্রলোভন ছাড়া যায় না। মতি না ডাকলেও মালতী নিজেই দেখে যেত। ভেতরে ঢুকে কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল মালতী। এমন বিশেষ কিছু করেছে বলে তো ওর মনে হয় না। দুটি মাত্র মাটির কুঁড়ে। একটা ঘরে হাঁড়ি-কুঁড়ি বাসনপত্র, আর একটা ঘরে ওদের মা-ছেলের শোবার জায়গা। বড় একটা পুরানো আমলের তক্তাপোশ, ঘরটার অর্ধেকের বেশি ঘিরেছে সেইটেই। এই তক্তাপোশেই গোবিন্দ থাকত।

দুটো ঘরেই ওরা খোঁজ করেছে। বাসন-কোসন বাক্সপত্র নেড়েছে মাত্র। এ-ঘরে বিছানাপত্র টেনেটুনে দেখেছে, ভাঙা টিনের তোরঙ্গটা থেকে কাপড়-গুলো বের করে দেখেছে এই যা। কেবলমাত্র একটা জিনিস নষ্ট করেছে ওরা, গোবিন্দের মাথায় দেওয়া বালিশটাকে ছিঁড়ে ভেতরটা দেখেছে।

এক এক করে সব দেখালো মতি। সব বললে। মালতী কিন্তু আশ্চর্য হল এই সময় ওর হঠাৎ পরিবর্তন দেখে। কিছুক্ষণ আগে কী না শান্ত ছিল মতি, কিন্তু এখন যেন ক্রোধে ও লাল হয়ে উঠেছে।

'আমার ই অনেক কষ্টে গড়া সংসার! তোরা সবাই মিলে তা লষ্ট করবি কেনে? আমার ছেলেটা ত ওই জন্যেই গেল, তোদের পাঁচ জনের জন্যেই ত সে পাগল হল। তা দেখ, আমার কাপড়-চুপুড়ে হাত দিবে কেনে ওরা? আমার এতে অপমান হয়নি? আমার ঘরকে কেনে এস্‌বে ওরা? তুই মা দেখুনি, দুহাতে করে দারগা আমার গোবিন্দর বালিশটা ছিঁড়ে ফেললে। বাছাকে কাছে পেলে ওরা কি রাখ্‌ত, মেরে ফেলত। তা আমি তখন আর মানুষ নাই, আমার তখন কি ইচ্ছা হচ্ছিল জান মা, ওদের ঝাঁটা মারি, ছাই দি ওদের মুখে, ওদের কোদাল দিয়ে কাটি, বঁটি দিয়ে কাটি...'

দুটি হাত শক্ত হয়ে ওঠে, বঁটি দিয়ে কাটবার মত ভঙ্গি করে মতি। সমস্ত শরীরটা ওর কাঠ হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে ও। আরো কী যেন বলতে চায়, চোখ দুটো ঘুরছে।

ভয় পেয়ে গেল মালতী। তবু সাহস করে ওর হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অবাক হল মালতী।

'ই কি পিসি, জ্বরে যে গা ভাজা-খোলা হয়েছে গো ..'

বিছানার ওপর জোর করে শুইয়ে দিল মতিকে।

তারপর একটানা দুঘণ্টা ধরে মাথায় জলঢালা, জল খাওয়ানো, পাখা করা ইত্যাদির পর জ্বর একটু কমে।

'না মা, ই তুমি ঠিক করছ নি মা। আমি যেতে পারলেই ভাল।'

'সে কি পিসি, উ কথা বোল নি। উ কথা বলতে নাই। আমি এখন চললম, জানত মাস্টর-বৌকে দেখতে হয়, তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এসব আবার। রাত্রে থাক্‌তে হয় না কি দেখব।'

মালতী এক রকম স্বাধীন মেয়ে। ওর ভাত-কাপড় ও নিজেই রোজগার করে। কারও সঙ্গে কোন দিন জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ওদের পাড়ার মাস্টার-বউ মিনতিকে আশ্চর্য রকম ভালবেসে ফেলেছে ও, তার ভালবাসাও চায় মালতী।

'তোমার মাথার কাছে জল রইল পিসি, তেষ্টা পেলে খেও।'

মতির বাড়ি থেকে মালতী যখন বেরুল তখন সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শোয়ানো ধানে ঢাকা মাঠ, কলাইশুটির বনে ফড়িং লাফাচ্ছে। অসহ্য খিদেয় ওর পেটে মোচড় দিল একটা। মালতী তাড়াতাড়ি পা চালাল। ও ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে ওর মতি পিসি, ওর প্রিয় 'গোবিন্দা'-র মার মৃত্যু হবে আর কয়েক দিনের মধ্যে, এই জ্বরেই।

তিন

সাবিত্রী প্রথম দিকে মতিকে খেয়াল করেনি, কিন্তু ওর দিকে চোখ পড়তেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

মতি শিব-মন্দির থেকে চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না, একটা মানুষ যে চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসে রয়েছে সেদিকে খেয়ালও করল না—এইটেই সবচেয়ে লাগল সাবিত্রীর। নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল ও।

মতির এই অবজ্ঞা ওকে পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও সাবিত্রীই প্রথম এই বিয়ের ব্যাপারে লালায়িত হয়েছিল, তবু প্রস্তাব শুনে মতি ছুটে এসেছিল তার কাছে। হাত দুটি ধরে বলেছিল, 'গরীবকে মেয়ে দিলে মা, চিরদিন মনে রাখব। এটা তোমাদের দয়া মা...' তা সেদিনের কথা কী ওর মনে নেই? অমন নির্লজ্জ হয় কী করে ওরা?

আর তাছাড়া দোষটা কার বেশি? সাবিত্রীর চিন্তাধারা এগোয়: 'স্বীকার করলাম আমার বোন একটা ন্যায়-অন্যায় করে ফেলেছে, তা তোমার ছেলে যে তাকে খুন করে ফেললে সেটা বুঝি দোষ হলনি? পিতিজ্ঞে করে ফেললে, মুখ দেখবেনি আমাদের! তা এই দেমাক চিরকাল থাকবে তো?' ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় সাবিত্রী মুখ খোলে, 'মামা, এ অপমান অসহ্য!'

সাবিত্রীর কপালে আর কানের পাশটিতে গালের ওপর দু-একগাছি চুল এসে পড়েছে। এত শীতেও ঘাম-ঘাম মনে হয়। ডান হাতটা হাঁটুর ওপর রাখা ছিল, আঙুলগুলো যেন কাঁপে।

হরি বলে, 'সবই দেখলম মা, কিন্তু কি আর বলব বল! ই শালা এদের বাড় বেড়েই চলেছে। কতদিন আমি বাবাজীকে বললম, তা বাবাজী শুনল নি। আমাদের কটা কথাই বা উনি শুনেন মা? বলে, অত মাথা গরম করলে কাজ চলেনি। তা আমি আর কী করব বল। তুমি যদি পার ত একবার নিজেই বোলো, মা!'

এত সব কথা বলার প্রয়োজন ছিল না, সাবিত্রী এমনিতেই ক্রুদ্ধ হয়ে আছে।

অদ্ভুত ভাবে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে সে—সে ঠোঁট বাঁকানিতে বোঝা যায় না ঠিক বিদ্রূপ না হতাশা মেশানো আছে—'হ্যাঃ, আমার দিকে উনি আবার ফিরে তাকান! মরে যাচ্ছি, মামা, মরে যাচ্ছি...আজকাল আবার কথা বলেননি! হ্যাঁ, আমাকেই সব করতে হবে, আমিই এর বিহিত করব...'

স্বামীর অনাদরে সাবিত্রী মরিয়া হয়ে আছে। তাছাড়া, অসুস্থ বলে একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সাবিত্রী। ক্রমাগত ভুগে ভুগে ওর দেহমনের জোর এতটুকু নেই।

'ওর চুল ছিঁড়ে, সর্বনাশীর বুকে লাথি মারতে পারলে...আমি মারবই...'

যেন মেঝে থেকে খানিকটা উঠতে গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে যায় সাবিত্রী। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে! ডান হাতটা বার দুই মুষ্টিবদ্ধ হয়, আবার খোলে, শেষে বদ্ধ হয়েই থাকে।

হরি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। চীৎকার করে ওঠে জল জল বলে।

সাবিত্রীর শেষের কথাগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। স্বাস্থ্য নেই বলে ওর কণ্ঠস্বর এমনিই কর্কশ হয়ে উঠেছে, তার ওপর ক্রোধে তা আরও বিকৃত। স্বভাবতই মন্দিরের ভেতরে এবং বাইরের অন্যান্য লোকেরাও আকৃষ্ট হয়। পূজারী ঠাকুরও ছুটে আসেন। একটা ছোটখাটো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। যা সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ জল আনে, কেউ বাতাস দেয়। তারপর কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে আসে।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সাবিত্রী বড়মানুষ বলে তার এই রকম শারীরিক বিপর্যয়ে প্রত্যেকেই যেন বেদনা পায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলে, 'হ্যাঁগা, কী জন্যে এমন হইছিল?' প্রথম থেকেই চেঁচাচ্ছিল ওরা, 'কেনে এমন হল গা?' আর, সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারল না বলে, কারুরই জিজ্ঞাসার শেষ হয় না, কাজেই গোলমাল বাড়তেই থাকে। 'আহা, মায়ের আমার শরীলে কিছু নাই...।'

'এত বেলা পর্যন্ত উপাস দিচ্ছে রে বাবু, এমনটি হবেনি?'

পূজারী ঠাকুর ওদের বাইরে বের করে দেন। 'বলি, বাবু, তোমাদের ত জ্ঞানগম্যি আছে। কে কোথা মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, যখন খুশি যেমন-তেমন পায়ে মন্দিরে ঢুকলেই হল? যাও যাও সব, মন্দির পবিত্র জায়গা...যাও যাও...'

এতক্ষণ পর হরি কথা বলে, পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে ওদের ধমকায়, 'বেরো বলছি, এখেন থেকে, বেরো সব...'

সাবিত্রীর মূর্ছা দেখে হরি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। এই সব মূর্ছা, কান্না-কাটি ও সইতে পারে না। কোথাও হরিবোল দিয়ে মড়া শ্মশানে নিয়ে গেলে ঘরে থেকেই ওর বুকের ভেতরটা কেমন করে। ঠিক বমি হবার আগে যেমনটি হয়, মনে হয় যেন সব কিছু গলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

আর সেই সময় বকাবকি, তক্কা-তক্কি করলে যদি বা ওর সে ঝোঁকটা কাটে। তাই ও চেঁচায়, 'ছোটলোকের বাচ্চারা, যা সব বেরিয়ে যা...'

ক্রমে ওর চোখের পিট্‌পিটুনি কমে আসে। মুখের ওপর হাসি হাসি সতেজ ভাবটা ফিরে আসে ওর।

'দেখলেন ত, দাদা-ঠাকুর, আজকাল ছোটলোক বেটাগুলার কি রকম আস্পদ্দা হইচে, ঠাকুর-দেবতা ছোট-বড় ওরা মানে কিছু ?...'

পূজারী ঠাকুর তখনও বলছিলেন, 'মন্দিরে পবিত্র হয়ে ঢুকতে হয়। যাও সব এখান থেকে তোমরা...' বলে শেষ লোকটিকে পর্যন্ত বের করে দিয়ে এলেন, 'অন্য সময় এস এখন, সন্ধ্যার সময় শীতল দেব তখন এস...'

হরির কাছে এসে বললেন, 'মন্দিরে গালাগাল দিতে নাই, বুঝলে বাবু!' পরে সাবিত্রীর কাছে এসে বসে বলেন, 'তুমি একটু বস, মা, আমি চট করে যাই, পুজোটা সেরে দিই। ঠাকুরের কাছে রাগ-ঘেন্না করেছিলে মা, তাই এমনটি হল ..'

নিজের ওপর খোঁচাটা কোনোরকমে সহ্য করেছিল হরি, কিন্তু এখন সুযোগ পেয়ে বলে, 'একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন ঠাকুর, কাকে কী বলছেন মনে রাখবেন...'

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন পূজারী ঠাকুর। প্রৌঢ়-বয়স্ক এই লোকটি বেশ একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর নাম কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে। শোনা যায় আধুনিক ইংরেজি লেখাপড়াও নাকি তিনি জানেন। বিগত কংগ্রেসী আন্দোলনের সময় এক্‌স্‌টার্নমেন্ট আদেশ পেয়ে এখানে চলে আসেন তিনি, যুক্ত হন এই মন্দিরের সঙ্গে। তার পর আর ফেরেননি।

লোকটির মেজাজও ভারি বিচিত্র, কারো তোয়াক্কা করে কথা বলেন না। মন্দিরের শুচিতার ওপর তাঁর নজর তীক্ষ্ণ, একটু আগেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। দেবতার পূজা-আরাধনার পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে চালান তিনি, আগের সঙ্গে এখনকার ব্যবস্থার কোনো মিল নেই। কিন্তু মন্দিরের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। এই সব অশিক্ষিত চাষাভুষোর তিনি

সত্য অর্থেই 'মা-বাপ'। তাদের সঙ্গে পাত পেতে খেতেও আপত্তি নেই তাঁর। লোকগুলিও বোঝে তাঁকে। তাই গলাধাক্কা খেয়ে রাগ করেনি ওরা, নিজেদের দোষের কথা ভেবে লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে যায়।

কৃষ্ণমোহন হরিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মনে আমি রেখেছি, চৌধুরীর পো। আপনারা সম্মানীয় লোক, সেটা সত্যি। কিন্তু ঠাকুর তো সবার উপরে, তাঁকে ত মান্যি করা চাই...'

সাবিত্রী রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায় হরি চৌধুরীর দিকে। পূজারী যান পূজো করতে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু আর বলে না।

সাবিত্রীর চেহারাটা ছোট্ট একটা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। শীতের বাতাস এসে ওর লাল-পেড়ে পাটের শাড়িটাকে একটু নাড়াচাড়া করে, ঠিক যেখানটা ঘাড়ের কাছে, পেছনে-ফেলা চুলের ওপর বেড় দিয়েছে ও। ডান হাতটাকে শক্ত মসৃণ মেঝের ওপর রেখেছে সাবিত্রী, সমস্ত শরীরের ভারটা যেন এই রোগা কাঠির মতো হাতটার ওপরেই রয়েছে। একটু পেছনেই ওর দেয়াল, কিন্তু সরে গিয়ে যে একটু ঠেস দেবে, তার সামর্থ্য নেই। কেবল সামনে মেঝের ওপর একটা কালো মতো দাগের ওপর আলতো করে তাকিয়ে থাকে ও।

হরি চৌধুরীও গুম খেয়ে যায়, ভাগ্নীর সেই রুষ্ট দৃষ্টির অর্থ ও বোঝে। কী আর করবে! যদিও এককালে জামাতা-বাবাজীকে টাকা ধার দিয়ে তাকে মোকদ্দমার জাল থেকে উদ্ধার করেছিল ও, তবু এখন অজয় সব দিক থেকেই তার অনেক ওপরে। অজয়ের সেরেস্তায় সে গোমস্তা, তার মাথাতেই যদিও সব কিছু চলছে বলে তার ধারণা, তবু তো সে অধীনস্থ কর্মচারী। তাছাড়া, সাবিত্রীকেও তোয়াজ না করে পারে না ও। টাকা-পয়সা এবং স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার যে দু-একটি দুর্বলতা আছে, তার জন্য এই ভাগ্নীটিকে সহায় হিসেবে না পেলে তার চলে না।

এক সময় পূজারী-ঠাকুর আসেন পূজো সেরে। স্নানজল, বিল্বপত্র, ভোগের সন্দেশ সাবিত্রীর হাতে দেন।

'ভক্তি করে খেয়ো, মা-ঠাকরুন, আরোগ্য ভগবানের হাতে। মনে আনন্দ রেখো, আনন্দের বড় জিনিস নাই। দুদিনের জন্যে এসেছি আমরা এই সংসারে, ঘৃণা, ক্রোধ করতে নাই। মানুষের রোগ হয় মনে, মন শুদ্ধ হলেই সব হবে। কোন রোগের বালাই থাকবে না...'

সাবিত্রী পূজারী ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিলে। ঘাড় নেড়ে কথাগুলো স্বীকার করে নিলে ও।

'বাবা, আমি যে যজ্ঞির কথা বলেছিলম, সেটা মনে রয়েছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, মা, তা মনে আছে বই কি। আরোগ্য-কামনা করে তুমি ঘৃতাহুতি দেবে, মা, তা মনে নাই? যে দিন ডাকবে, সেই দিনই যাব। ওগো চৌধুরীর পো, স্নানজল নাও...'

সাবিত্রীকে অনেকটা প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বললে, 'মামা, ওনাকে তো তোমার একবার বলতে হয়। তারপর একদিন বাবাঠাকুরকে ডেকে নিলেই চলবে...' কথাটাকে লুফে নিলে হরি। সাবিত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছে এ আশংকা ছিল তার মনে, তাই এই কথায় সে-ভাবটা কাটে।

'নিশ্চয়ই, মা, তা বলব বই কি। আর বাবাজী আমার কথা কি ঠিলতে পারবেন? তুমি কোন ভাবনা কোরনি, আমি সব ঠিক করে দুব।'

মন্দির থেকে ওরা যখন বেরোল, তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। প্রায় দুপুরের কাছাকাছি। দূরে একদল সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ বোঝা মাথায় বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে সার বেঁধে চলেছে। সাবিত্রী সেদিকে তাকিয়ে আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ওর সেই একটানা বিষণ্ণতা আর কাটছে না।

চার

লখীন্দররা গ্রামে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। কেঁচকাপুরের মাঠে লাঙল করতে করতে ওরা শুনেছিল, ঝাঁকরার গোবিন্দ মিত্রের বাড়িতে পুলিস তল্লাস করেছে। ঘটনাটা দুঃখের হলেও এমন কিছু নয়, কারণ প্রায়ই তো পুলিস আসে, কখনও রাত্রে, কখনও দিনের বেলায়। আর গোবিন্দ মিত্র তো বহুদিন হল আত্মগোপন করে আছে। কাজেই, মাঝে মাঝে পুলিস আসবেই, একথা সবাই জানে।

কিন্তু এমনটা যে হবে সেটা ধারণার অতীত। সমস্ত আমধেড়ে আর শ্যাওড়া এই দুটো গ্রাম তল্লাস করেছে ওরা।

গ্রামকে গ্রাম তল্লাস করা বহুদিন ওরা দেখেনি, তাই হঠাৎ এই কড়াকড়ির কোনো হদিস পায় না ওরা। কেউ সঠিক খবর দিতে পারে না। কেউ বলে, লক্ষ্মণ সাঁতরাকে ধরবার জন্যে এসেছিল, কেউ বলে চার জন নতুন লোক কোথা থেকে এসে এখানে লুকিয়ে রয়েছে, তাদেরকে ধরবার জন্যে। কেউ বলে, ভালো হয়েছে, কেউ বলে, এটা ভালো হচ্ছে না।

এ ছাড়া নানারকম অভিযোগ-অনুযোগ আছে। পুলিস-তল্লাসী সম্বন্ধে নানাজনের বিভিন্ন রকম মন্তব্য। এর মধ্যে, দুঃখের-বেদনার কাহিনী রয়েছে, হাসবার মতো কাহিনীর অভাবও নাই। কিন্তু সব চেয়ে মর্ম-বিদারক একটি ঘটনা: রামের স্ত্রীর ওপর দুজন পুলিস পাশবিক অত্যাচার করেছে।

এর বাড়া অত্যাচার নাই। অন্তত, মানুষকে একেবারে এতখানি নত করে না আর কোনো অত্যাচারই। মানুষ এতদিন পর্যন্ত যে অন্তরের সম্পদ গড়ে তুলেছে, সেটাকে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে দেওয়ার মতো ব্যাপার এটা।

বোবা-বেদনা শুধু গুমরে ওঠে, 'হ্যাঁ ?'

'তা নয় ? পুরুষ মানুষ কেউ ঘরে ছিল ? ইচ্ছামত ঘরে ঢুকে পড়ে, বাধা দিবার কেউ আছে ?'

'মেয়ে-মানুষ, দুটা পুরুষ যদি ধরে ত কি করবে বল··· ।'

'ওরও দোষ আছে বৈ কি, উ মেয়ের? নালে এত লোকের ঘরে পুলিস এল, তা সেখানে কি মেয়া-মানুষ ছিলনি? উ মেয়া গোল করতে পারলনি?' সংশয়ী কণ্ঠে কেউ বলে।

'বাবা, বল কি গো। ওদের দেখেই ত আমার ছাতির জল নাই, তা রা-কাড়ব কি করে?'

ঘটনাটা চাপা পড়ে যায় তাড়াতাড়ি। অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

'বলি, লোক খুঁজতে এসবি ত, ভাতের হাঁড়ি দেখবি কেনে? হাঁড়ির মধ্যে কি লোক লুকি' আছে?'

'মুখপোড়ারা কি আর খুঁজে বটে? শুধু গোঁপ পাকায় মিন্সেরা··'

'হাঁ গো, পিসি, ঠিক বলছ তুমি, ওকে আবার খুঁজা বলে? শুধু লাঠিতে করে ইদিক-উদিক লেড়ে দিলে।'

প্রায় সমস্ত খবর মেয়েদের মুখে শুনতে হয়। পুরুষেরা তো কেউ-ই ছিল না। যেমন ভয় পেয়েছিল ওরা, তেমনি সেই ভয় সম্বন্ধে গর্বও করে। 'দিদি, আমি ত এক কলসী জল খাই, তারপর আমার ধাত আসে। মা গো, মা...।'

পুরুষদের মধ্যেও কথা ওঠে কিছু কিছু। 'যদি বেরতম আমরা লাঠি লিয়ে, থালে শালাদের দেখি' দিতম একবার!'

লখীন্দররা চার জনে এগোয়। একটি কথা বলে না ওরা। আগে পরান, তারপর লখীন্দর, তার পেছনে অখিল, সব শেষে রাম। কেউ রামের দিকে একবার ফিরেও তাকাতে সাহস পায় না। এক সময় রাস্তার বাঁকে দল থেকে লখীন্দরকে চলে যেতে হয়। বলে, 'ভাই রাম, তোমাকে কি আর বলব ভাই। ভগমান কিছু বলার রাখেনি। ত মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। উপরে ভগমান আছে।' একটু গিয়ে ফিরে আবার বলে, 'গোরুগুলোকে একটুন আহার দি আগে, তারপর তোমার ওখেনে যাব, ভাই।'

পরানও চলে যায়। যথাসাধ্য সান্ত্বনার কথা বলে যায় সে। অখিল কিন্তু লাঙল-বলদ সমেত শ্যাওড়ায় ওর বাড়ি পর্যন্ত আসে।

এমনিতে কেউ কোথাও ছিল না কিন্তু রাম পাড়ায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর বাড়ির দিকে লোক ছুটে আসে।

'রাম, কি আর বলব ভাই...'।

'রাম রে, তোর কপাল ভেঙেছে, রাম...'।

সকলেই জোর গলায় নানারকম করে ওকে কথাটা শোনাতে চায়। রাম ওদের ভিড় ঠেলে ওর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মাটির দেয়ালওয়ালা দুখানা

ঘর, খড় দিয়ে চাল ছাওয়া। গাছের ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে ঘরের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে। তাই মাঝখানটায় উঠোনের মতো। রাম গিয়ে গরুগুলোকে খুঁটিতে বাঁধে, লাঙল-জোয়াল যথাস্থানে রাখে। এতক্ষণ কারো মুখের দিকে রাম তাকায় নি, কিন্তু এখন একবার তাকায়। মুখে বোধ হয় একটু হাসি আছে, হতবুদ্ধির হাসি। পান-খাওয়া, লাল-কালো সামনের দাঁত দুটো একটু বেরিয়ে পড়েছে। তারপর ওদের উঠোনে গিয়ে বসে পড়ে, কিছু বলে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে উঠোনে, তারপর হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে। 'কি হল, কি হল... ?' পাশাপাশি জড়ো-হওয়া লোকগুলি ছুটে আসে।

'জ্বর হইছে গো, জ্বর হইছে। কাঁপছে দেখছনি...।'

যে কৌতূহল নিয়ে লোকগুলি এসেছিল, তার কিছুই হল না দেখে ওরা নিরাশ হয়। তার পর আস্তে আস্তে ওরা সরে যায়।

অসহ্য যন্ত্রণায় রাম ছটফট করে। মাথাটা যেন ওর ছিঁড়ে পড়বে। ওর যখন চেতনা হবার মত অবস্থা হল, তখন লখীন্দর ওর পাশে বসে আছে। ওর স্ত্রী জল এনে ওর মুখে দিলে একটু।

লখীন্দর বললে, 'আজ তুমি কষ্ট পেলে খুব, ভাই। এখন একটুন কিছু খাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে ভাই। ঠাণ্ডা মাথা হল গে তমার বড়-দাদা...' বলে ও চলে গেল।

জ্বরটা ছাড়তেই উঠে বসল রাম। গোরুগুলোকে খেতে দিলে। এই প্রথম খিদের খোঁচা পেল রাম, পেটটায় মোচড় দিলে। বউ দক্ষবালা উঠোনটায় দাঁড়িয়ে আছে, মাথা আলগা, মুখটা খোলা। গোরু দুটো কেমন করে খাচ্ছে তাই দেখছিল ও। 'ভাত রেঁধেছু ?' ম্যালেরিয়া জ্বরে ওরা ভাত বন্ধ করে না সাধারণত। খেটে খাওয়ায় সবই চলে। রামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বউটা। মনে হয়, কখনও যেন কোনো কথা বলেনি ও। শোনে ও নি। আজন্ম বোবা ও। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে ভাত এনে দেয়, জামবাটিতে করে।

রাম কোন দিকে তাকায় না, এক নিঃশ্বাসে শেষ করে। এত খিদে পেয়েছিল ওর যে কোনো কিছু চিন্তা করার অবসর ওর ছিল না। অবিশ্যি, কেমন একঘেয়ে তীব্র এই খিদে, খাবার সঙ্গে পাঁচটা কথাবার্তা, একটু যত্ন-আত্তি—সব মিলে যে আনন্দ দেয়, সেটা নেই। আঁচাবার পর কি করবে রাম ভেবে পেল না। একটা কিছু কাজ করতে পারলে ওর একটু শান্তি হতো। কিন্তু কিছু নেই, এমন কি

চিন্তাও নেই যেন। এতখানি শুষে নিয়েছে ওকে। জ্বর থেকে উঠে ভাত খাওয়াতে শরীরটা অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

'দুটি ভাত দিবি, গা ? অ বউ, বড় বউ ?'

রামের সৎমা পাশের বাড়ি থেকে আসে। প্রায় পঙ্গু, অসুখে-বিসুখে কম বয়সেই চোখ-কানের ক্ষমতা হারিয়েছে। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ড্যাবা-ড্যাবা ঘোলাটে চোখ থেকে পিচুটি কাটে। দু-মাস আগেকার কাচা ত্যানা একটা কোমরে বেড়-দেওয়া। 'দুটি ভাত দে, দক্ষবউ...আমাদের রান্না হয়নি...'

ওর ছেলের আর বউয়ের দিনরাত ঝগড়া, কান্নাকাটি, বুড়িকে কোনো দিন খেতে দেয়, কোনো দিন দেয় না। বউ প্রায় সব সময়ই চেঁচিয়ে পাড়া মাতায়, কাঁদে, অভিসম্পাত করে।

দক্ষ-বউ দুটি ভাত এনে দেয়, খেঁকিয়ে বলে, 'নিজের বউকে মাগতে পারনি ? তা পরের খেতে তোমার লজ্জা করেনি গা ?'

এমন কি রামের কানেও কথাটা ঠেকে। পারল ওকথা বলতে দক্ষবালা ? তার সৎমাকে অমন কথা বলতে পারল ? আর তাছাড়া আজই ওর এই অবস্থা হয়েছে ? পর মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে, আশ্চর্য খুঁতখুঁতে তার বউ, একটা কুটো এদিক-ওদিক হয় না।

মানুষ এতো ছোট হয় কেন ?

'নিজের বউ যদি মানুষ হত মা, থালে কি আমার ই অবস্থা ? কপাল মা, কপাল...'

বুড়ি আশ্চর্য লোভের সঙ্গে চিবোচ্ছে ভাতগুলো। ক্ষুধা-মেটানোর আরাম এত বিশ্রী কেন ? ওপরের ঠোঁটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চোখগুলো পিটপিট করছে কেবলই।

রাম চুপ করে বসে থাকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে, মনে হয় ও যেন এখনি মরে যাবে। মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

এক সময় রাম আস্তে আস্তে উঠে আসে। বউটা বাঁশের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে মুখে ওর কিছুই নেই। ও কি আজন্ম বোবা ? কিন্তু এই বিকেলেও তো সৎমাকে অমন ঝাঁকরেছে!

'এই শালী, অমন হাঁ করে আছু কেনে, মুখে রা নাই ?' ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল রাম। এক রকম লাফিয়ে ওর কাছে গিয়ে পেঁছাল ও, চুলে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল ও, 'শালী, মরে গেছু না কি ? যখন সিপাইকে 'অমুক' করেছিলি, তখন তোর 'অমুকে' জোর ছিল...'

'আঁক্' করে একটা শব্দ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল দক্ষবালা, এই টান সহ্য করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। ছেঁড়া, ময়লা শাড়িটা বুকের থেকে পায়ের থেকে সরে গেছে। শীতে রুখু চুলের রাশিতে মুখ ঢাকা, তারই ফাঁক দিয়ে শুকনো চোখ দুটি কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এইটের জন্যই যেন এতক্ষণ কাঠ হয়ে ছিল ও, ওর স্বামী এখনই ওকে খুন করে ফেলবে। 'আঁ-আঁ-আঁ...' ওর দেহটা এঁকে-বেঁকে রামের পায়ের কাছে এগিয়ে এল মাটির ওপর দিয়ে। ধরবার মতো ক্ষমতা ছিল না ওর, কিন্তু স্বামীর পায়ের কাছে জড়াজড়ি করতে লাগল। 'মার নি...মা-আঁ-আঁ...' মৃত্যুকালীন শ্লেষ্মা এসে ওর গলা আটকে দিয়েছে যেন।

কী হতে কী হয়ে গেল। প্রায় উলঙ্গ ঐ দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রক্ত ছলাৎ করে উঠল রামের বুকে। দেখতে দেখতে ওর চোখে পশুর হিংস্র দৃষ্টির জায়গায় আর একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল, সেটাও পশুর দৃষ্টি, যে দৃষ্টি দিয়ে সিপাহী দুটো দেখেছিল ওকে। 'ইস্ ..' লোভে চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটো। সরে যাওয়া শাড়িটা টেনে ওর বুকের ওপর ঢাকা দিতে চাইলে রাম, কিন্তু হঠাৎ টেনে ফেলে দিলে। যে ঘটনা আগেই ঘটে গেছে তারই যেন পুনরাবৃত্তি করছিল ও। 'এই শালী, চুপ ..' অস্ফুটে গর্জন করে উঠল রাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘন হয়নি, সেইখানেই দেহটার ওপর পড়ল ও। ডাগর-ডোগর যোবতী মাগীটা বউ তার!

পাঁচ

মাঠে কাজ করতে গিয়েছিল লখীন্দর। আজও কেঁচকাপুরেই গিয়েছিল। সেদিন অখিলের জমিতে বদ্‌লা দেবার দিন ছিল, কিন্তু আজ অন্য জনের কাজে গেছে সে, তার জন্যে মজুরি আছে।

অতি সহজে গ্রহণ করেছে রাম তার স্ত্রীকে। এই জন্যে তৃপ্তি পাচ্ছে না পাড়ার অন্যান্য লোক।

'শালা বউটার গায়ে একটা হাতও তুলেনি, অন্য কেউ হলে খিঁচে ফেলত...'

রোগা মতো একজন বললে। মুখে তার বসন্তের দাগ, পান-দোক্তার কষে একটা পুরু স্তর পড়েছে তার দাঁতের ওপর।

'কি করবে বল, বউটার কি দোষ? বউটার যদি দোষ নাই, থালে তাকে মেরে কি হবে...তবে মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেল...'

বেঁটে কাটখোট্টা ধরনের একজন লোক বললে, 'উসব নষ্ট-ফষ্ট আমি বুঝিনি বাবু, আজকাল উসব নাই। একটা মাগকে বাদ দিয়ে আর একটা মাগ ঘরে আনবে, এমন বাপের বেটা আজকাল কজন আছে। শালা, উজন্যে বিয়াই হয়নি কত জনের। আজকালকার বাজারে কার কপয়সার জোর আছে! ই ছাড়া, কুন ঘরে মেয়াছেলের দুন্নাম নাই বল, কে বুকে হাত দিয়ে বলবে তার ভিটায় পাপ ঢুকেনি?'

লখীন্দর কথাটা শুনেছে। কথাটা সত্যি বলে মানে সে। পাপ ঢুকেছে প্রত্যেকটি ঘরে, কোনো ঘরটি বাদ নেই। মা-মাসি-বোন, স্ত্রী-কন্যা, কে কার কথা শোনে। কিন্তু পুরুষদের পাপের সীমা নাই। তারা মদ খায়, মিথ্যা কথা বলে, পর-স্ত্রী আর বার-নারী না গেছে এমন লোক হয় ত মিলবেই না। সমস্ত আমধেড়ে গ্রামটা, এটাতো শুধু মজুর-চাষীদের গ্রাম, এর পাশাপাশি গ্রামও তাই, বিশেষ করে দক্ষিণে। আড়াই হাজার তিন হাজার লোকের বাস, তা এরা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।

সেদিন রামের বাড়িতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল লখীন্দর। লোকটা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর পাড়ার লোকেরা তাই দেখছে হাঁ-করে। ছেলে-ছোকরা নেই এমন নয়, কিন্তু যারা বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ তারাও একটু জল পর্যন্ত এগিয়ে দেয়নি। আর, হয়তো, দরকার হতে পারে কোনো কিছু করার, তাই, অত বড় একটা প্রলোভন ছেড়েও পালিয়ে গিয়েছে। মেয়ে-সংক্রান্ত এই ব্যাপার, গ্রামের লোকের কাছে এটা কত বড় প্রলোভন, সে তো লখীন্দর জানে। সে লোভ পর্যন্ত ওরা যখন ছেড়ে চলে যায়, কোনো কিছু করার ভয়ে, তখন মানুষ কতখানি ছোট হয়েছে।

একান্ন বছর বয়েস হয়েছে লখীন্দরের। কোনো দিন এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। নিজের সুখে-দুঃখে এক রকম করে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও কারো অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে, শ্মশানযাত্রার সময় ডাক পড়লে না বলে-নি। বলেছে, 'পরস্পর দেখতে হবে বৈ কি বিপদে-আপদে। কার দুঃখু-কষ্ট নাই বল?'

কিন্তু গেল যুদ্ধের পর থেকে মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে। অভাব-অনটন কোন্ কালে না ছিল, কিন্তু মানুষ আগের মতো আর নাই। আজকাল মানুষের মাথার ঠিক নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব নাই।

লখীন্দর ঠিক বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু ওর বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে। আগে এমনটি হত না। ও আজকাল আর মড়া-পোড়াতে যায় না, ডাক এলে বলে, 'শরীরটা ভাল নাই বাবু!' নয়তো ওর বড় ছেলে সুধীরকে পাঠিয়ে দেয়। প্রথমটা ভীষণ আপত্তি করবে সুধীর, চেঁচিয়ে দুপা আছড়ে সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে তুলবে, তারপর আস্তে আস্তে চলে যাবে। লখীন্দর অনেক সময় বলেছে, 'ওরে, যা যা, মিত্যু হল মাহা শান্তি, সেটা দেখে আয়। শ্মশান মাহা পবিত্ত জায়গা...।' কিন্তু আজকাল মরা-মানুষের মুখেও শান্তি দেখা যায় না, দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই মরে আজকাল মানুষ। ও জানত মৃত্যুতে যন্ত্রণার 'নিবিত্তি' হয়, কিন্তু এখন বুঝতে পারে মৃত্যুতেও যন্ত্রণার শেষ নাই। তাই বীভৎস দেখতে হয় মরা-মানুষের মুখ। ভয় পায় না ও, কিন্তু কেমন আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করে লখীন্দর। মানুষ তাহলে সে যা ভাবত তা নয়।

সন্ধ্যে বেলা কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে ওপরে যায় লখীন্দর, সোজা দোতলায়। এ অঞ্চলে তারই ঘর দোতলা। মাটির চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘর বানানো এ-অঞ্চলের একটা বৈশিষ্ট্য। লখীন্দর ওপরের তলাতে গিয়ে রামায়ণখানা খুলে বসে।

ওপর থেকে ডাক দেয়, 'ওরে টুকি আয়, বই শুনবি আয়, অধীরকেও নিয়ে আয় রে...'

বড় ছেলে সুধীর কোথায় যেন বেরোচ্ছিল। সে হাঁকাহাকি শুরু করে দিলে, 'ওরে টুকি, যা, পুঁথি শুনগে যা। পুণ্যি হবে। অধীরেটা আবার ঘুমি' পড়েছে। এই হতভাগা, ঘুমাচ্ছু কেনে, উঠ। সন্ধ্যে বেলা আবার ঘুমায়...'

ওই এক ছেলে, একদিনও ওকে পুঁথি শোনাতে পারেনি লখীন্দর। যেদিন জোর করে বসিয়েছে, সেদিন দু' লাইন শুনবার পরই উঠে গিয়েছে ও। টুকি কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে। বছর বারো বয়সের মেয়ে, কিন্তু কী আগ্রহ নিয়ে শুনবে ও পুঁথি। প্রত্যেকটি ঘটনা ওর মুখস্থ, আশ্চর্য ওর স্মৃতি-শক্তি। লখীন্দর অনেকবার ভেবেছে, মেয়েটাকে একটু লেখা-পড়া শেখাবে, কিন্তু সুধীর হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'বিবি হবে মেয়ে, ভাল ভাল!'

আর বছর নয়েকের ছেলে অধীরকে পাঠশালায় দেওয়া হয়েছে, সুবল মাস্টারের পাঠশালায়। এই সুবলই হচ্ছে মালতীর সখী মিনতির স্বামী।

ভাই-বোনে এসে বসে, দুদিকে দুজন। টুকি ডান-দিকে, আর অধীর একেবারে বাঁ হাঁটুর ধারে। হাঁটুতে ওর বুক ঠেকেছে, আর মাটির ওপর রাখা লখীন্দরের বাঁ-হাতটা ধরেছে অধীর। লখীন্দর সুর করে করে পড়ছে, আর অধীর তাই দেখছে কেবলই। ও কেবল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুবিধের জন্যে, এক সময় কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে অধীর। লখীন্দরের চিবুকটা ওঠা-নামা করে পড়ার তালে তালে। কখনও কখনও কোনো একটা শব্দ বুঝতে না পেরে ঝুঁকে পড়ে, তখন লখীন্দরের বুকের চুল লাগে অধীরের মুখের ওপর।

রামের বনবাস পড়ছিল লখীন্দর। এই পালাটা সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে লখীন্দরের। রামের কথা নয়, দশরথের কি দুঃখ, কি বেদনা। বৃদ্ধ শেষকালটায় একেবারে চুপ করে ছিলেন, মূর্ছা ভাঙেনি তাঁর। আর, তাঁর নিজের লোভের জন্যই তো ঘটনা ঘটেছিল, কাকেই বা দোষ দিতে পারতেন তিনি?

হঠাৎ লখীন্দরের সুর ছাপিয়ে পাড়া থেকে গান ভেসে আসে একটা। তারপরেই একটা শীষ টানার শব্দ।

লখীন্দর পড়া বন্ধ করে। টকীর গান গাইছে পাড়ার ছোকরারা। ভালো-বাসার লোক বুক ভেঙে দিয়েছে, তার জন্য কাঁদুনির অন্ত নাই। এ জীবন আর রাখা যায় কী করে। এ গান অনেকবার শুনেছে লখীন্দর। এই ধরনের

আরো অনেক গান। ছেলেরা এই টকী দেখার জন্যে পাগল! কোনো রকমে হাতে যদি পয়সা জুটল কয়েক আনার, তো ওরা ছুট্‌ল চন্দ্রকোণায়। বিকেল বেলা, পান চিবোতে চিবোতে, গেঞ্জি গায়ে কারো, কারো হাফসার্ট, পাঞ্জাবি অধিকাংশের মুখেই বিড়ি, নয় সিগারেট। কী আনন্দ পায় ওরা, তার জন্যে এত হাল্‌কা হয়ে গেছে ওরা!

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

সেদিন সুবাসী মেছুনীও এই কথা বলেছিল। 'লখীন্দ, তুমি বাবু ঠিক বলেছ, চন্দখানায় যদি মাছ চালান না দিই গাঁয়ের লোকরা দুটা খেয়ে বাঁচে। কিন্তু বাবু পয়সা হয়নি। ই ছাড়া চাল হইচে মেছুনীদের। তারা টোকী দেখবে, বাস-তেল মাখবে চুলে...দুটা গয়না পরবে। সেই মেছুনীর গল্প জান ত, বাবু, এক ভদ্দনোক দু'আঙুলে দুটা আংটি পরে জিজ্ঞাসছিল, কত করে দাম গো, কত করে দাম? তা সেই মেছুনীর ছিল ছ-ভরি সোনার অনন্ত, তা উ বললে, কনুইটা ভদ্দনোকের নাকের কাছে লেড়ে লেড়ে, দশ আনা সের গো, দশ আনা সের। ত আমরা হলম সেই মেছুনী।' বলে সুবাসী হেসেছিল।

অধীরটা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে মাথা রেখে। লখীন্দর আস্তে নামিয়ে দিলে। টুকিও ঢুলতে শুরু করেছিল। লখীন্দর বললে, 'লে, ঘুমা।'

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বসে রইল লখীন্দর। ওর ঘরটা সব চেয়ে উঁচু বলে, প্রায় সমস্ত গ্রামটা দেখা যায়। এ বাড়ি তৈরি করেছে লখীন্দরের বাবা, তার সঙ্গে খেটেছে লখীন্দর। দেয়াল দেওয়া থেকে ছাওয়া অবধি নিজেদের পরিশ্রম করা। মজুর লাগিয়েছিল খুব কম। আর দোতলায় এখানে বসে থাকতে খুবই আনন্দ পায় লখীন্দর। এখানে বসে সমস্ত গ্রামটাকে দেখা যায়।

সমস্ত গ্রামটা ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলা উঠবে সবাই ধড়মড় করে। এখানকার অধিকাংশই মজুর। ওরা সব চলে যাবে, দূর দূর গ্রামে মুনিষ খাটতে—ঝুড়ি কোদাল হাতে, কারো হাতে লাঠি, লাঙল-বাড়ি, হেলে-বলদ তাড়িয়ে নিয়ে যাবে কেউ। সেই সন্ধ্যে হয় হয় ফিরে আসবে। মাঝখানে একবার ছুটি। তা এদের মধ্যে আনন্দটা কোথায়? তাহলে তারা 'টোকী' দেখতে যাবে না কেন?

হঠাৎ লখীন্দরের মনে পড়ে ওর দুটি ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের কথা! ওরাও যদি এমন হয়?

দেশলাই দিয়ে আলোটা আবার জ্বালাল লখীন্দর। অধীরের মুখখানা আশ্চর্য নরম, টুকির মুখখানা কেমন বিষণ্ন মনে হয়।

ধুলোয় সারা গা-হাত ভরা। একটা ময়লা প্যান্ট পরে আছে অধীর আর টুকি পরেছে একটা ছোট শাড়ি। সব কিছু সত্ত্বেও তবু খুবই সবল ওদের দেহ। লখীন্দর অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ও আশ্বস্ত হয়।

ওর মনে পড়ে দশরথের কথা। না, দশরথের মৃত্যু কষ্টের মধ্য দিয়ে হয়নি। তাঁর সমস্ত লোভের উপরে রামচন্দ্র ছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যে তিনি বনে গিয়েছিলেন। এমন সরল আর খাঁটি মানুষ কি আর হতে পারে? এমন সম্ভাবনা দেখতে পেলে মরেও আনন্দ। কোথায় সেই সত্য!

লখীন্দর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছয়

তার পরের দিন রাত্রে সুধীর আর লখীন্দর খেতে বসেছিল। কথায় কথায় গ্রামের তল্লাসীর প্রসঙ্গ ওঠে। সুধীর বিরক্ত হয় লখীন্দরের ওপর, 'উসব লিয়ে তুমি কেনে মাথা ঘামাচ্ছ? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান কেনে, বাবু। কার কি হল-গেল সে দিকে না ছুটে নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল হয়।'

বছর-তেইশ বয়েস হবে সুধীরের। আশ্চর্য শক্ত গড়ন ওর, তবু মুখখানা সুন্দর, ওর মায়ের মতো কোমল। তাই কেমন মায়া হয় ওর দিকে তাকালে। লখীন্দর জোর করে কিছু বলতে পারে না।

'তাই বলে তুমি পাড়া-পিতিবাসীর দুঃখ-কষ্ট দেখবেনি রে বাবু? এক জনের দুঃখ-কষ্ট হলে আর একজনকে দেখতে হবে বৈ কি।'

'ওই, ওই...' সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে সুধীর, 'ওই জন্যেই তোমার ঘুম হচ্ছে-নি। পরের ভাবনা ভাবতে গেলে নিজের ভাবনা ছাড়তে হয়...'

লখীন্দর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়। অমন জ্ঞান-বৃদ্ধের মতো জোর করে কথা বলে কী করে! কোন কিছুর সম্বন্ধে অত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করে কী করে। কথা যেন ওর কোথায়ও আটকায় না। কিন্তু লখীন্দরের তা হয় না, কিছুতেই ও নিঃসংশয় হয়ে একটা কথা বলতে পারবে না জোর দিয়ে। আর লখীন্দরের সঙ্গে কথা বলার সময় সুধীরই উপদেশ দেবে। এতে বিরক্ত হবে অথচ প্রত্যেকটা কথাই শান্তভাবে বলবে লখীন্দর। আপাতত সেটা ভীরুতা বলেই মনে হয়।

'তোমার গে ধর, আমরা ঘরে ছিলমনি, ত ওরা এসে যে ঘর-দুয়ার উলটি-পালটি দেখবে, তার কি বলবে তুমি!'

সুধীর তখন সেই মাত্র এক গ্রাস ভাত তুলেছে মুখে, বাঁ-হাতটা মাটির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। লখীন্দর একবার বাঁকা করে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর আবার বললে, 'যদি তুমি বল, পুলিসের দরকার, ওরা এসবে বৈকি, ত বিনা দোষে লাথ মারবে কেনে? মানুষের ত সম্মান বলে জিনিস

আছে। তোমাকে বলি বাবু, আমার ত বয়স হল, পুলিসের অনেক অনেক তল্লাসী আমি দেখেছি। পঞ্চাশ সালে একবার তল্লাসী হইছিল ই গাঁয়ে, আমার ঘরেও হইছিল। সে কথা ত তোমার মনে থাকার কথা। এমন কি হইছিল? তোমার মায়ের বার হবার দেরী হইছিল, তা ওকে কি বলেছিল, সে তুমি ভুলে যাও নি? মেয়া-মানুষের একটা সম্মান আছে ত!'

সুধীর তখনও চুপ করে খাচ্ছে। লখীন্দর মনে করলে, বুঝিবা তার কথাটা ওর মনে ধরেছে। তাই ও আশান্বিত হয়ে বললে, 'ওরা আবার ভাব দেখায় কি রকম জান, যেমন আমাদিকে কত কিপা করছে...তা ই তুমি সহ্য কর কি করে?'

এক গ্লাস জল শেষ করল সুধীর। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ে বললে, 'উ সব আমি বুঝিনি, বাবু। পুলিসের দরকার থাকবে ত ওরা এসবে। আমাদের ঘরে এসে যা দরকার তাদের, তা দেখবে বৈ কি। আমি এই বুঝি...'

পাশে একটু দূরে অধীর ঘুমোচ্ছিল, সুধীরের চেঁচানোতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে সে, কাঁচা ঘুম ভেঙেছে বলে কাঁদতে থাকে। রান্নাঘর থেকে সুধীরের মা চেঁচায়, 'বলি, অমন চিল্লিমিল্লি করছ কেনে, আমার ছেলে উঠে পড়ল!'

লখীন্দর বিব্রত হয়। 'আঃ, সুধীর, অত চেঁচাও কেনে, লোকে শুনে কি বলবে...'

সুধীর নিজেও একটু অপ্রতিভ বোধ করছিল, কিন্তু লোকে কি বলবে—এ কথার উল্লেখে ও আরো গলা বাড়িয়ে দিলে।

'আমি চিল্লাব, একশবার চিল্লাব। কুন শালা কি বলবে আমাকে?'

লখীন্দর চুপ করে থাকে।

লখীন্দর ভেবে পায় না, কেমন করে ওকে বোঝাবে। আজকালকার মানুষ হয়েছে এই। অসভ্য হলে অন্যে কেউ কিছু যদি নাই বলে, তাহলেও সেটা কি তোদের লজ্জা নয়। বাবার কাছে 'শালা' কথাটা উচ্চারণ করতে নেই, একথা কতবার লখীন্দর শিখিয়েছে ওকে, কিন্তু কিছুতেই ও শিখবে না। নিজের কষ্ট নয়, ছেলেটার জন্যে বেদনা বোধ করে লখীন্দর।

আলোটা নিবিয়ে দোতলার ঘরটিতে শুতে যাচ্ছিল লখীন্দর, এমন সময় সুধীর শুতে এল। পাশাপাশি দুটো বিছানা, তেলাইয়ের ওপর কাঁথা বিছানো। তার ওপর শুয়ে, আর একটা কাঁথা টেনে দিল সুধীর। ওদের একটা মাত্র লেপ, সে লেপটা এখন লখীন্দর গায়ে দেয়। একবার লখীন্দর ওটা সুধীরকে দিয়েছিল, তা সুধীর বলেছিল, 'বাবা, তুমি বুড়া মানুষ, ইটা তুমি গায়ে দিবেনি, আর আমি

গায়ে দুব? বলে, আমার কোঁছার খুঁট গায়ে দিলে শীতের বাবা পালাবে।'

'তা এমনটি কেন হয় না সুধীর সব সময়?'

সুধীর প্রথমে সমস্ত শরীর মুখ চাপা দিয়ে দিলে। তারপর কিছুক্ষণ ধরে উসখুস করতে লাগল। তারপর বিছানার ওপর উঠে বসল।

'কি রে, কিছু বলবি?' আদর করে ডাকবার সময় লখীন্দর সুধীরকে তুই বলে।

'বাবা, পুলিস যে লোকগুলাকে ধরবে বলে এসেছিল, তা যদি এমন না করে থালে ধরবে কি করে? যারা পালি' গেছে, কখন যে তারা গাঁয়ে এসবে, কোথা থাকবে, সে ত পুলিস জানবেনি, ত সমস্ত গাঁটা ঘিরে দেখতে হবে বৈ কি। তখন দু-একটা অপমান যদি হয় ত হবে, তাতে তোমার আমার গায়ে মাখলে চলবে কি করে...'

সুধীর তাহলে কথাটা ভেবে দেখেছে! হ্যাঁ, দেখতেই হবে, ভেবে দেখবে না কেন, একদিন না একদিন ভাবতেই হবে। লখীন্দর উৎসাহিত হয়।

'দেখ সুধীর, আমি ত সেটি বলছিনি যে পুলিস ঘরে এসবেনি। কিন্তু যদি লোকজনকে অপমান করে, তাদিকে হীনছিন করে, তাহলে পুলিসকেই লোকে শত্তুর ভাববে। এই যে লোকগুলাকে ধরবে বলে ওরা ঘুরে বেডাচ্ছে, ত তাদের মধ্যে ভাল লোক নাই সে কথা ত লয়। লোকে লিচ্চয় ওই লোকগুলাকে ভালবাসে, তাই। তা নালে ওরাই ধরি' দিত। তা লোককে বুঝিয়ে দিতে হয়, বলতে হয় যে, ই কাজটা যে তোমরা করছ, তা ভাল হচ্ছেনি...'

'ফ্‌ফ্‌উস্‌...' অদ্ভুত একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে সুধীর। 'তাই ত করছে এরা! তুমি বললে, লোক নিশ্চয় ভালবাসে ওই ফেরারী লোকগুলাকে। ভালবাসে না ছাই। জান, অন্তত জন পঞ্চাশ লোক পুলিসের সঙ্গে ছিল তাদিকে সাহায্য করবে বলে! তারা ই গাঁয়েরই লোক। থালেই বল, তুমি কার কথা বলবে?'

ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছে সুধীর। কিন্তু এমন করে ভাবে কেন ও? লখীন্দর ভাবছিল, এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা আর কি আছে। নিজের নাক কাটলে গর্ব করার নেই কিছু।

'গাঁয়ের লোকের কথা আর বলনি। ওদের আবার মান-অফমান...' সুধীর বলে চলল, 'এই রাম দিগারের কথা ধর। বেটা বউটাকে লিয়ে ঘর-কন্না করছে। গল্পটা শুন একবার...কত বড় অফমান উ মেয়াটার, আর রামের,

তা তর সইলনি, গলগল করে গিলল তার রাঁধা ভাত...এদের আবার ছাত্তির জোর আছে...'

এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। একথা জানে লখীন্দর। কিন্তু ওদের হীনতা কি বেদনার জিনিস নয়? কত ছোট হলে তবে রাম এ অপমান বোধ করতেই পারে না। তাছাড়া মেয়েটার কি গতি হত, তাকে তাড়ালে। কী যে হত সে তো লখীন্দর জানে। কিন্তু এসব ব্যাপারে সুধীরের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, সে সম্পূর্ণ অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করবে।

'দূর-দূর, ওদের কথা আবার ভাবে মানুষ...নিজে ঠিক থাক, বাবা, থালেই আনন্দ পাবে। বলে, নিজের লাগি পুছ বাত, থালে খাবে দুধ ভাত...'

কাঁথাটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে সুধীর। যেদিকে লখীন্দর, তার বিপরীত দিকে পাশ ফিরে শোয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে লখীন্দর। তারপর বলে, 'দেখ সুধীর, তুমি যা বলছ তা সত্যি। সবাই ত আর সমান মানুষ লয়, বাবা। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান। তা মানুষকে ছোট মনে করতে নাই, মানুষকে নীচ বলতে নাই, থালে মানুষ ছোট হবে, নীচ হবে। মানুষের যদি তুমি ভাল না করতে পার, ত তাকে ঠাট্টা-পরিহাস করনি। মানুষ সব ভগমান। তোমার বাপের এই কথা মনে কর।'

কি বলতে হবে, ঠিক বুঝতে না পেরে বাবার দোহাই দিয়ে বলে লখীন্দর। ছেলেটার জন্যে তার ব্যথার অন্ত নাই। কিন্তু কেউ যদি না বোঝে তাহলে সে কি করবে। তার যথাসাধ্য সে বলেছে এই মাত্র। সুধীর কিন্তু তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধীরকে এই নিয়ে আর কিছু বলেনি লখীন্দর, কিন্তু কেবলই কথাটা তার মনে ফিরে ফিরে আসে। সে কেবলই চেষ্টা করে যাতে এই সব চিন্তা তার না আসে। কিন্তু রামের কথা, তার নিজের ছেলের কথা কেবল মনে হয়, আর সেই সঙ্গে সমস্ত গাঁয়ের কথা, তার বাইরে লোকজনের কথা মনে হয়। আর মনের অস্বস্তি ক্রমাগত বেড়ে চলে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সে ঝাঁকরার শিব-মন্দিরে গিয়ে হাজির হয়। ঠাকুরকে প্রণাম করা তার উদ্দেশ্য, কিন্তু পূজারী ঠাকুরের কাছে দুটো কথা শোনারও ইচ্ছে আছে। এই লোকটির কথা তাকে অদ্ভুত সান্ত্বনা দেয়। পূজারী ঠাকুর রামায়ণের ব্যাখ্যা করে তাকে শোনান। রামকৃষ্ণদেবের কথা বলেন, বিবেকানন্দের কথা, গান্ধীজীর কথা। বলেন, 'আমাদের দেশ ঠাকুর-দেবতার

দেশ। দেবতাকে আমরা ভালবাসিনে, তাই আমাদের এই অবস্থা আজকাল। দেবতাকে ভালবাসলে মানুষ নিজেই দেবতা হয়ে উঠবে।'

কত জ্ঞানের কথা যে উনি বলেন, তা লখীন্দর ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু অনেক কথা যেন তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন 'গীতায় ভগবান কি বলেছেন, জানো লখীন্দর, নিজেকে না ভুললে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না। আর অপরের সেবার দ্বারাই সেই অহং-ভাব নষ্ট হয়। তাই মানুষের সেবাই ধর্ম। বিবেকানন্দ বলেছেন, নরনারায়ণের সেবা...'।

একথা শুনে লখীন্দর বলেছিল, 'হ্যাঁ, উ কথা আমার মনে লেয়। লরলারায়ণের সেবাই ভাল...আর, দেখেন বাবাঠাকুর, লোকের উবগার করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার মতন আর কিছু নাই।'

মন্দিরে পৌঁছে প্রণাম করে এক পাশে বসে রইল লখীন্দর। তখন মন্ত্র পড়ে পূজো করছেন ভট্টাচার্য ঠাকুর।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

এত সুন্দর করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন উনি! লখীন্দর কিছু বোঝে না, কিন্তু কেমন এক সুর গিয়ে তার বুকে লাগে, তার মন উচ্চ-ভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে। কি জানি কেন, তার দেখা ঘর-দুয়ার, মাঠ-ঘাট সব উৎসবের দিনের আনন্দে ভরা মনে হয়। লখীন্দর সে সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে।

পূজো শেষ করে নিত্যকার কাজ করেন ভট্টাচার্য ঠাকুর। যারা এসেছিল পূজো দেখতে, তাদেরকে ঠাকুরের প্রসাদ দেন, প্রত্যেককে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। যথাসাধ্য সাহায্য করেন তিনি। দরকার হলে, সারা রাত্রি গিয়ে বসে থাকেন পীড়িতের পাশে, যান শ্মশানযাত্রায়।

পূজারী ঠাকুরকে এই জন্যই এত ভাল লাগে সবারই। লখীন্দরের ইচ্ছে হয় প্রত্যেক দিনই ওই ঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে আসতে পারে না। তাছাড়া, অমন এক জ্ঞানী লোকের কাছে রোজ আসতে বিব্রত বোধ করে লখীন্দর। কারণ, এলেই তো সে নানা রকম প্রশ্ন করবে, আর তার সেই প্রশ্নের জন্য ওঁকে কষ্ট পেতে হবে, সেটা চায় না লখীন্দর।

পূজারী ঠাকুরের কাজ শেষ হয়। কার বাড়িতে যেন ধানের মরাই ধ্বসে গেছে, গত রাত্রের বৃষ্টিতে। বেচারী লোক পাচ্ছে না সেগুলো গোছ করার। তাছাড়া রাখবেই বা কোথায়? ওর নিজের ঘর তো ফুটো, যে রকম আকাশের অবস্থা, তাতে আবার যে বৃষ্টি হবে না, সে কথা কে বলতে পারে। পাশের

বাড়ির একজনের মরাইটা খালি আছে, তো সেইখানেই রাখতে বললেন পূজারী ঠাকুর। 'চলো হে, আমি যাচ্ছি, তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেব। কত মণই বা ধান? পনেরো? তা বেশ, আর একজনকে ডাক, তুমি তো আছ, আর আমি...। এই তিন জনেই যথেষ্ট!'

লখীন্দরকে বললেন, 'কি লখীন্দর, তোমার পাড়ার খবর সব ভাল?'

লখীন্দর একটু হাসে, 'দাদাঠাকুর, আপনার কাছে এলম, দুটা জ্ঞানের কথা শুনব বলে। তা আপুনি ত কোথা যাবেন, তবে আজকে থাক...'

'সে কি কথা! জান ত ভাই, কথা নিয়েই ব্রাহ্মণের কারবার...ব্রাহ্মণ তো জ্ঞান আহরণ করবে, আর সেকথা অন্যকে জানাবে...আমি না বলতে পারি? তুমি একটু বস, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি। তুমি তো জান, ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েই আমি রাত কাটাই। তা খেতে খেতে কথা বলা যাবে...'।

লখীন্দর কৃতার্থ হল।

পূজারী ঠাকুর এলে পরে বললে, 'ঠাকুর, ইটা আমি বুঝতে পারছিনি... মানুষ ছোট বলে কি তার অপমান করতে হবে?'

'কেন একথা বলছ?'

'এই যে পুলিস-তল্লাসী হল, তার কথা বলছি দাদাঠাকুর। পুলিস গাঁয়ের লোকের বড় অসম্মান করেছে। গোপী দিগারকে জানেন আপুনি, তা অমন বুড়া মানুষ। হাঁপানি রোগ, ঘরের কোণ থেকে লড়তে পারেনি। বলেছিল, আমার কাছে কিছু নাই-টাই বাবু, আমার অসুখ, আমি লড়তে পারবনি, তা আমাকে পেত্যয় কর। তা ওকে দুজন পুলিস ঘাড় ধরে বার করে দিল। আর...আপনার কাছে লজ্জা নাই, দাদাঠাকুর...ত রামের ইস্তিরির কী অবস্থা করলে? ইটা কি ধম্মে সইবে? তা আমার ছেলা বলে কি জানেন, বলে ছোট লোক, ত ওদের এই ফলই ভাল। তা ঠাকুর, কে ছোট-লোক কে বড়-লোক তা আমি বুঝব কি করে। মানুষের বাইরটাই কি সব। তাছাড়া, ছোটকে কি অপমান করতে আছে?'

বেশ কিছুক্ষণ প্রশান্তমুখে লখীন্দরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভট্টাচার্য ঠাকুর। তারপর বললেন, 'তোমার হৃদয় খুব বড়, লখীন্দর। এমন কথা তো কেউ বলে না। তুমি ঠিকই বলেছ লখীন্দর, মানুষ ছোট হয়ে গেছে, আর এই পুলিস, চৌকিদার, সরকার-সুবেদার এরা মানুষকে ছোট করে দিচ্ছে, তাকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না। কিন্তু তুমি যে বললে, জোর দেখালে, দু' ঘা মারলে,

তাতে মানুষ ছোট হল, তা নয়, মানুষ ছোট হচ্ছে অন্য দিক দিয়ে। শীরষে গ্রামের সিংহ মহাশয়কে জান, লখীন্দর? সেবার তিনি ডোমপাড়ায় একটা ভোজ দিলেন, আর গাজনের খরচটা দিলেন...তাতেই সব সমস্যা জল হয়ে গেল, অত বড় বিদ্রোহটা, তা থেমে গেল। তারপর ধর, এই সেবারের ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট। তা আমরা বললাম, ওরে, তোরা নিজেরা দাঁড়া, তা টাকা পেয়ে ছেড়ে দিলে...বিক্রি করে দিলে ভোট! জানো লখীন্দর, মানুষ আজকাল লোভী হয়েছে...আর লোভ হলে মানুষ হয় পরনির্ভর, নিজের ওপর আর আস্থা থাকে না। তখন শুধু ভিক্ষে করে মানুষ, আজ ইস্কুল দাও, কাল জলের কল দাও, পরশু রাস্তা মেরামত করে দাও...এতে কে ছোট হয়, মানুষ নিজেই ছোট হচ্ছে...'

বিনীত, মনোযোগী ছাত্রের মত শুনছে লখীন্দর। কখনও ওর মুখে হাসি ফুটে উঠছে অল্প একটু, কখনো অর্ধোচ্চারণ করছে, 'হ্যাঁ, ঠিক...,' কখনও বা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করছে। কোনোখানে না বুঝতে পারলে সতর্ক হয়ে উঠছে ওর চোখ-মুখ, ইন্দ্রিয়গুলি।

'দাদাঠাকুর, এ আপুনি ঠিক বলেছেন। মানুষ আজকাল এই লোভেই মরে গেছে। শুধু নিজের কথা ভাবে ওরা, কারো কথা শুনতে চায়নি, অন্যে মরে গেলেও ফিরে দেখবেনি...' লখীন্দরের চোখের সামনে হয়তো তখন ওর ছেলে সুধীরের মুখ ভাসছে, হয়তো বা সেদিন রামের বাড়িতে কৌতূহলের বশে যারা এসেছিল, তাদের কিছু করবার ভয়ে পালানোর কথা মনে পড়েছে। হয়তো অন্যান্য কত জিনিস তার মনে ভিড় করে আসছে, কে জানে।

ঠাকুরমশাই বললেন, 'ঠিক তাই, লখীন্দর। মানুষ স্বার্থপর হয়েছে বলেই সে মিথ্যাবাদী হয়েছে। সেবারে শ্যামগঞ্জের দক্ষিণপাড়ার ভাঙা বাঁধটা সারাবার জন্যে আমি বললাম, এপাড়ার সবাই তোমরা এস বিকেলে একবার করে লাগলে এক হপ্তায় ঠিক হয়ে যাবে। বললে, দাদাঠাকুর এই পুন্নিমেটা যাক, তারপর আমরা সবাই আছি। তা প্রতিপদ বাদ দিয়ে দ্বিতীয়ার দিন ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে আমি গেলাম, একজন জনপ্রাণী নেই, ডেকে হেঁকে জন তিনেক বেরোল। তা মনে কোরো না লখীন্দর, মিথ্যে শুধু এদিক দিয়ে ঢুকেছে। তুমি একজন কৃষককে দেখ, নিজের ক্ষমতার বড়াই করতে ছাড়বে না। বলবে, আমি এটা পারি ওটা পারি, দরকার হলে বাড়িতে অভ্যাগতের জন্যে একদিনে পঁচিশ টাকার খাওয়া খরচ করবে ধার করে, মামলা করে ফতুর হবে। তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়াবে। আজকাল তো আর তাও নাই, যে দু পয়সা

আনে, তাতে তো সংসার চলে না...তা এ হচ্ছে মিথ্যার চূড়ান্ত। যেখানে তোমার ক্ষমতা নেই, সেখানে ক্ষমতা দেখাতে যাওয়া!'

অনেকক্ষণ একদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল লখীন্দর। মুখ দেখে বোঝা যায় না, ওর ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া চলছে। এক সময় কিন্তু ও আস্তে আস্তে বলে, 'দাদাঠাকুর, ইসব কথা শুনলে পরানটায় কষ্ট হয়!'

'ঠিক বলেছ, লখীন্দর। মানুষের দৈন্য দেখলে প্রাণে কষ্ট হয়। তবে তোমায় বলে রাখি ভাই, এই বেদনা থেকেই দেখো এই কষ্টের লাঘব হবে। ভাল না বাসলে মানুষকে মানুষ করা যায় না, এই কথা মনে রেখো...'

লখীন্দর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর বলে, 'কিন্তু কেনে এমনটা হল বলেন দেখি, ঠাকুর। কেনে এমনটা হল...'

ভট্টাচার্য ঠাকুর লখীন্দরের মুখের দিকে তাকালেন, এমন প্রশ্ন তো চাষীদের মুখ থেকে বেরোবার কথা নয়। লখীন্দর নিচু দিকে চোখ করে চেয়ে আছে, প্রশ্নের জবাবটা সে যেন শুধু তাঁর কাছ থেকে শুনতে চায় না, নিজের অন্তরের মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে চায়।

ভট্টাচার্য বলেন, 'ইংরেজের জন্য এমন হয়েছে লখীন্দর, ইংরেজ রাজত্বের জন্যে।'

লখীন্দর মুখ তুলে দাদাঠাকুরের দিকে তাকাল, একটি বুদ্ধিমান ছাত্রের জিজ্ঞাসায় ভরা ওর চোখ।

ভট্টাচার্য এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, এত কথা তো লখীন্দরের বুঝবার নয়। কিন্তু লখীন্দরের তীব্র কৌতূহল তাঁর দ্বিধা কাটায়।

'ইংরেজ আমাদের দেশে কল এনেছে, কাপড়ের কল, চিনির কল·· এই কলেই মানুষ তৈরী হচ্ছে আজকাল। সব কলের পুতুল। মানুষ যেদিন হাতের তৈরী জিনিস ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রের উপর নির্ভর করলে সেদিন থেকেই তার দাসত্ব।'

'কিন্তু দাদাঠাকুর, ইংরাজ ত চলে গেছে। তার ত রাজত্বি আর নাই।'

'তার বিষ আছে, ভাই। সব মানুষ আজ গাঁ ছেড়ে শহরে যেতে চায়। তারা যাত্রা-গান শুনবে না, টকী দেখবে। তারা পায়ে হাঁটবে না, রেলে চড়বে, তারা তাঁত ছেড়েছে কলের কাপড় পরবে বলে। তা ইংরেজ সব দিয়েওছে। চাষী মানুষ আজ পয়সা চিনেছে। আর এই পয়সার লোভ সব জায়গায় ছড়িয়ে

পড়েছে। তাই পয়সার জন্যে ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি বসায়। এই যে বড় বড় যুদ্ধ হয়ে গেল, তা শুধু ওই পয়সার লোভে।'

'হ্যাঁ?' এত কথা তলিয়ে বুঝবার নয় লখীন্দরের। অতদূর বুদ্ধিও পৌঁছোয় না। শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

'এর থেকে রক্ষা পাবার একটিমাত্র পথ আছে। মানুষকে স্বাবলম্বী হতে হবে, আর সত্য কথা বলতে হবে।'

লখীন্দর তেমনি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কথাগুলো যেন গিলছে ও।

ভট্টাচার্য বুঝতে পারেন না লখীন্দর কি ভাবে কথাগুলো নিচ্ছে। কতখানি বুঝতে পারছে ও। কিন্তু কথাটা যখন একবার উঠেছে, তখন শেষ করতেই হবে। তাই বলেন, 'এই যে তুমি পুলিসের দম্ভের কথা বললে, তা এ তো অপমান নয়, যদি তোমরা হাসিমুখে তা সহ্য করতে পারো। তেমন ক্ষমতা চাই। অত্যাচারীকে তো অত্যাচার দিয়ে ঠেকানো যায় না। শিবকে নীলকণ্ঠ বলে কেন জানো লখীন্দর? শিব নিজের লোভ থেকে যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে সহ্য করেছিলেন। তা এর চেয়ে সত্য আর মহৎ কী আছে। অপমানকে হজম করেই মানুষ বড় হবে, তাতে অপমানের শেষ হবে লখীন্দর। অপমান না থাকলে অপমান যারা করে তারাও থাকবে না, যারা অপমান পায় তারাও থাকবে না।'

ধীরে ধীরে লখীন্দরের মুখের টান-হওয়া ভাবটা খানিকটে ঢিলে হয়ে আসে। ও বলে, 'আমার একটা কথা মনে পড়ছে, দাদাঠাকুর। বাবা আমার ছিল মাটির মানুষ...পাঁচজনের পাঁচটা ভাল কাজ করত, তা তাকে ভালোবাসত শীরষের সিংমশায়রা। কিন্তু বলত, তোদিকে আমি ইটা দিলম, সেটা দিলম, তা, বাবা কিছুই বলতনি। আমাদের কাছে কিন্তু বলত বাবা, কে কাকে দেয় বাবা, যিনি দিবার মালিক, তিনি দিবেন...তা একদিন বাবাকে লাথি মারল বাবু, কি একটা হইছিল। বাবুদের শত্তুর ছিল রায়েরা, তেনারা বললে, তুই মামলা কর, মান-লষ্টের মামলা। বাবা বললে, আমার মান আমার কাছে। ত অনেক লোক অনেক কথা বললে, তা বাবা শুনলেনি। শেষে বাবু নিজে একদিন বাবাকে ডেকে বললে, আমার দোষ হইছে, কিছু মনে লিসনি। তা বাবার জিত হল...'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য ঠাকুরের খাওয়া হয়ে এসেছিল। উনি তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিলেন। বললেন, 'চল লখীন্দর, আমাকেও তো অনেকটা তোমাদের ওদিকে যেতে হবে, এক সঙ্গেই যাই...'

রাস্তায় নামতে বাইরের বাতাস লেগে মাথাটা হাল্কা মনে হয় লখীন্দরের। আগে আগে লণ্ঠন নিয়ে ভট্টাচার্য ঠাকুর চলেছেন। সেই আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে লখীন্দর। বৃষ্টিতে অল্প একটু ভিজে গেছে মাটির কাঁচা পথ। সে পথের দুপাশে অন্ধকার। মাঠ পেরিয়ে দূরে বনের মধ্যে দু-একটা আলো দেখা যায়। গ্রামের আলো।

কিছুক্ষণ পরে ওদের পূর্বপ্রসঙ্গ ফিরে আসে। এবারে পুলিস যাদের খোঁজে এসেছিল, আবার তাদের কথা ওঠে।

'জানো লখীন্দর, সেদিন ধানগাছিয়ার অজয়বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন মন্দিরে। সঙ্গে তার মামা হরি চৌধুরী ছিল। তা ওরা গোবিন্দ মিত্তিরদের খুনে বললে। ওরা সব হতভাগ্য জীব...সব সময়ে ভয়ে ভয়ে আছে...' ঠাকুর মশায় হেসে ফেললেন হো হো করে, 'হরি চৌধুরী বলে, রাস্তা-ঘাটে বেরোতে ভয় হয় ওদের। তা ওদের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অথচ ওদেরকেই লোকে ভয় করে।'

লখীন্দর বললে, 'হ্যাঁ? গোবিন্দ মিত্তিরকে খালে ওরা খুনে বললে? গোবিন্দ ছোকরা কিন্তু ভাল।'

ভট্টাচার্যের শেষের কথাগুলো তাহলে শোনেনি লখীন্দর। গোবিন্দর কথাটাই ওকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। দাদাঠাকুর তাই বলেন, 'হ্যাঁ, তাইত বললে। আমি অবশ্য জানি না কথাটা সত্যি কি না। সত্যি হতে পারে, বা হরি চৌধুরীদের অপবাদও হতে পারে। কিন্তু গোবিন্দ যদি সত্যিই হত্যা করে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ছোট কাজ আর নাই। মানুষ কতখানি দুর্বল হলে যে অন্যকে খুন করে তা তুমি জান না ভাই। মানুষ নিজেকে অবিশ্বাস না করলে কাকেও খুন করতে পারে না। গোবিন্দ তার স্ত্রীকে হত্যা করে থাকলে নিজের অযোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছে।'

গোবিন্দকে ভালবাসত লখীন্দর। বহু কাল আগে গোবিন্দ যখন ছোট ছিল, তখন তাকে দেখেছিল সে। তার মুখটা সে এখন ঠিক মনে করতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দ শহরে পড়তে গিয়েছিল, তার উন্নতি হয়েছে একথা সে শুনেছিল। একথা শুনে আনন্দ পেত সে। তাই দাদাঠাকুরের এই কথা কোথায় তাকে কষ্ট দিল। গোবিন্দ যে খুন করেছে একথা বিশ্বাস করত না সে। ও ধীরে ধীরে বললে, 'দাদাঠাকুর, গোবিন্দরা কি বলে না বলে, কুনু দিন আমি শুনিনি। কিন্তু গোবিন্দকে লোকে ভালবাসে। নিশ্চয় খালে সে এমন কিছু করে, যাতে

লোকে ভালবাসে। কিন্তু আমি শুনেছি, ওর ইস্ত্রি এমন এক কাজ করেছিল যে, তাতে গোবিন্দ আর তার দলের অন্য লোক ধরা পড়ত। তা এটা কি তার উচিত হইচে...'

'লখীন্দর, আমি স্বীকার করলাম তার স্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ করেছিল, যদিও আমি জানি না তার স্ত্রী কি করেছিল। কিন্তু মানুষ ভুল করবেই, সেটা তার বুদ্ধির দোষ। কিন্তু তার হৃদয় বদলাতে হবে। মানুষকে খুন করা সোজা, কিন্তু, তাকে বদলানো বড় কঠিন!'

ভট্টাচার্য গতি মন্থর করেন, ইতিমধ্যে লখীন্দর কিছুটা এগিয়ে আসে। তারপর ওরা পাশাপাশি চলতে থাকে। উনি বলেন, 'হয়তো গোবিন্দরা ধরা পড়ত, তার জেল হত, হয়তো আরও কষ্টকর কিছু হত। কিন্তু তাতে পরিণামে ভালই হত। মানুষকে অবিশ্বাস করার পাপ থেকে রক্ষা পেত গোবিন্দ, আর শুধু গোবিন্দ কেন, গোবিন্দর হাতে যত লোক আছে সবাই!'

লখীন্দর চুপ করে থাকে, কিছুই বলতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একথা সত্যি কি না।

ভট্টাচার্য বলে চলেন, 'তাছাড়া জান লখীন্দর, কোনো রকম খুন-জখম আমি পছন্দ করি না। যে কোন কারণেই হোক, খুন করতে নেই। বাঁচতে দিয়েই তবে বাঁচা যায়, আর যদি খুন-জখম করা হয়, তাহলে সে খুন ঘরেই ফিরে আসে। এই নিয়ে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গেল, তাতে যারা হারল তারাও গেল, যারা জিতল তারাও গেল...'

এসব অভিজ্ঞতা নেই লখীন্দরের। ও বলতে পারে না কিছুই। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'দাদাঠাকুর, এসব কথা আমি কবেও শুনিনি, আমি বুঝতেও পারছিনি ঠিক মতন। ভেবে দেখবখন, যদি একটুন বুঝতে পারি!'

সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারল না লখীন্দর।

এত কথা একসঙ্গে চিন্তা করার অভ্যাস ওর নয়, তাই মনে হতে থাকে মাথার শিরাগুলো হয়তো ছিঁড়ে যাবে। গরম, দপদপ করছে শিরাগুলো। পাশেই সুধীর ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাস উঠছে-পড়ছে তালে তালে। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে ও, লখীন্দর ওকে না জাগিয়ে উঠে জল খেল। কিন্তু কিছুতেই ওর ঘুম আসে না। 'হুঁ? ঠিক ত, না, ই হবে কি করে ··' বার বারই নিজের মনে ওর এই ভঙ্গিগুলো ফিরে ফিরে আসে।

মানুষ কি অতখানি হতে পারবে, কাকে কি বলবে তুমি! না, অমন

করে চিন্তা করতে পারে না লখীন্দর। রামকে মনে হয় অনেক দূরের মানুষ, সবাই মনে হয় সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। তারপর একসময় ওর চোখের কাছে অতি ফাঁকা মনে হয়! যতদূর দৃষ্টি চলে।··

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ফেলল লখীন্দর। অতি পরিচিত জগৎ তার সামনে। পুব দিকটার মাঠে শীতের রোদ্দুর শিশিরের ওপর পড়ে ঝলমল করছে। লখীন্দর গোয়ালে গিয়ে গোরুগুলোকে খুলল।

মনে হয়, কালকের ঘটনাটা কিছুই নয়। এমনই বা কি!

সাত

গ্রামে পুলিসের তল্লাসী ব্যাপারটা যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, তা ক্রমশ থিতিয়ে আসে। এই রকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই হয়। প্রত্যেকবারই খুব জোর উত্তেজনা হয় প্রথমটা।

গল্পগুজব আলাপ-আলোচনা সব জায়গায় চলতে থাকে। তারপর যেইকে সেই। অবশ্য, যেবারে ওরা একটু বেশি আহত হয়, বা তল্লাসীর অভিনবত্ব থাকে, সেবারে আলোড়নটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কিন্তু এই ঘটনাটা নিয়ে লখীন্দরের ওপর একটা ঝড় বয়ে গেল। তার সমগ্র অস্তিত্বটা এমনভাবে নাড়া খেল যে, ব্যাপারটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। এক সময় এমন হল যে, যেমন করে হোক সে তার সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়াটা ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চাইলে।

অনেকবারই তো পুলিস-তল্লাসী বা হানা এ-অঞ্চলে হয়ে গেছে, কম-বেশি লখীন্দর নাড়াও খেয়েছে। সাধারণত, তাদের মতো লোকেরা যে-রকম আলোচনা করে থাকে, সেও ঠিক সেই রকম করে সবার সঙ্গে যোগ দিত: পুলিসের দোষ না গ্রামবাসীর দোষ, যারা পালিয়ে বেড়ায় তারাই এর জন্যে দায়ী, না তারাই হচ্ছে সাধারণ এবং গরাবের মা-বাপ? তারাই তো প্রাণ দিয়ে দেশকে বাঁচায়—ইত্যাদি নানা ধরনের আলোচনা।

কিন্তু এবারের জিজ্ঞাসা এসব ছাড়িয়ে অনেকখানি তলিয়েছে। মানুষ অপমানিত হচ্ছে বা কেন, অপমান করছেই বা কেন।

এমনিতেই তার মস্তিষ্ক থই পাচ্ছিল না, তার ওপর শিবের পূজারী কৃষ্ণমোহন (ওদের কিষ্টমহন ঠাকুর) তার মাথার মধ্যে জোর করে ঢুকিয়েছেন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। সেগুলো যেন অদৃশ্য ছুরির মতো তার মগজে বিঁধে রয়েছে। তার বেদনা ভীষণ। কোনরকম করে এই ছুরিগুলো বের করে ফেলতে পারলে, তার ব্যথা চলে যাবে। লখীন্দর জানে ঘায়ের ব্যথা সময় হলেই চলে যায়। তাই মাথা থেকে কোন-রকম করে সেই ছুরিগুলো যাতে

সরে যায়, লখীন্দর তাই সময়ের অপেক্ষা করে নিজের কাজে মন দিলে। নিজের চিরকালের চাষবাসের কাজ।

কিন্তু একটা কথা ওর মাথা থেকে কিছুতেই গেল না। এর কি প্রতিকার নেই? গোবিন্দ মিত্র এবং তার সম্বন্ধে দাদাঠাকুরের উক্তি বার বার করে তার মনে আসে। গোবিন্দ মিত্র কি খুনে?

গোবিন্দ মিত্র সম্বন্ধে এখানকার লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নেই। গোবিন্দ মিত্র বলতে তারা অজ্ঞান। গত বছর যে খুব বড় একটা খেতমজুর আন্দোলন হয়ে গেল, সেই আন্দোলনের সময় ছিল ও, সেই আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আর সেই সময় থেকেই পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লখীন্দর দেখেছে তাকে দূর থেকে। তখন দেখবার খুব আগ্রহ হয়নি। এখনও যে আগ্রহ বেড়েছে তা নয়। কিন্তু গোবিন্দ মিত্র খুনে, একথা যেন কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না লখীন্দর। আবার সেটাকে নাকচ করার যুক্তিও তার নেই। হবেও বা, মানুষের কখন কি পরিবর্তন হয় কে বলতে পারে।

সেদিন বিকেলে লখীন্দর তার ভাঙা জোয়ালটা মেরামত করবার জন্যে বাঁশঝাড় থেকে একটা মজবুত মুঠি বাঁশ কাটছিল। সুধীর তাকে সাহায্য করবে বলে একটা কাটারি নিয়ে এল।

'দেখ বাবু, সুধীর...' লখীন্দর হঠাৎ শুরু করে, 'কাজের তুলি্য আর আনন্দ নাই।'

সুধীর চোখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিকটে জিজ্ঞাসু খানিকটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। লখীন্দর সেদিকে না লক্ষ্য করে বললে, 'বাপ-ঠাকুদ্দা যা দি'গেছে, সেটি লিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইটা যদি তুমি না করতে পার, থালে অনেক কষ্ট পেতে হয়।'

সুধীর অমন করে তাকাবার ভঙ্গি পেল কোথায়? বাপ-মা বলে ওর একটু সম্ভ্রম নেই?

কিন্তু সে বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ত সেই কথাই বলি। নিজের চরকায় তেল দাও, আর কুস্থ ভাবনা ভাবতে হবেনি। কিন্তু তুমিত সে কথা শুনবেনি...' বলতে বলতে ওর চোখ আবার অবিশ্বাসে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

লখীন্দর সেদিকে লক্ষ্যই করল না। ওর মুখে একটি সুখের হাসি ফুটে ওঠে। ও নিজের কথাগুলোকে যেন নিজেই চিবোচ্ছে। সুধীর তার কথাগুলো

স্বীকার করল বটে, কিন্তু সে কথাগুলো ঐ অর্থে বলেনি। তার কথা সুধীরের বুঝবার নয়!

তার পরদিন ওর এক প্রতিবেশী ভাগ-চাষীর আলু-চাষের ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ দিতে গেল ও। এ অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীন লোক লখীন্দর, চাষ-বাস সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর বলেই সবাই জানে। প্রতিবেশীটি এই প্রথম আলু চাষ করবে, তাই লখীন্দরকে ডেকেছে। লখীন্দর একটু তদারক করে দেবে জমিটা ঠিক তৈরী হচ্ছে কি না।

'কত খোল দিচ্ছ বল দিকিন, মহীন্দ?' লখীন্দর হুঁকোটা ডান হাতের তেলোয় ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। ছোট্ট একখানা হাত পাঁচেক ধুতি আঁট-সাট করে পরা, গামছাটা কাঁধের ওপর।

'ল'মণ দিচ্ছি, বাবু।'

'সেকি, মহীন্দ, সাত পুয়া জমিতে ল' মণ খোল দিচ্ছ কি! বলে সার দিবি ত ফসল লিবি। তা তোমার মুনিবকে বল না কেনে...'

সেই অত ছোট করে পরা কাপড়টাকে আরো খানিকটে ওপর দিকে টেনে গুটিয়ে নিল লখীন্দর। তারপর আলের ওপর বসল। 'লাও, তামুক লাও...'

'হ্যাঁঃ, দাদা, উ কথা আর বল নি...' একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল মহেন্দ্র, তার সঙ্গে হতাশাও মেশানো আছে। 'মুনিব দিবে বেশি সার? ত ঐ দিতেই কেঁপে গেল ওর বুকটা!' বলে সে জমিতে নামল কোদালটা নিয়ে। 'ই সাত পুয়া জমি লিয়ে বড় ভাবনায় পড়লম, দাদা। আলু চাষের ব্যাপার, তা তুমিই বল। বুকটা আমার দুরদুর করছে। ত ভেবে দেখ, মাগ-ছেলে বেটা-বউ...এই চার-পাঁচ মাস জমিতে পড়ে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে মুনিষ লাগাতেই হবে, তুমিই বল। মানুষের দেহ, আজ ভাল ত কাল খারাপ, দেহ যন্তর, এর একটা কবজা খারাপ হল ত কলটাই আর চললনি। কিন্তু তোমার গে, চাষের ব্যাপার···সে কথা ত···আর শুনবে নি। তার উপর আলু চাষ...আজ যদি জিয়ানি দিবার দিন, ত আজকেই দিতে হবে। আলু ধরাবার যদি দুদিন দেরী হল ত চাষ গেল। ত তুমিই বল, আমাদের সবই এই আলু চাষ লিয়ে থাকা···যদি ঠিক ফলাতে না পারি, ত মরে যাব, খেতে পাবনি···'

হয়তো ঠিক মত পেরে উঠবে না, হয়তো চাষের তাক বয়ে যাবে, এই ভয়ে মহেন্দ্র প্রায় কেঁপে ওঠে। চষা-মাটির ওপর বসে কোদালের বাঁটটা ঠিক করছিল সে, হঠাৎ উঠে বলে, 'ত মুনিব সেটা ভাবেনি। বলে, ঐ সার দিলম,

ওই ঢের। আবার বলে, আলু যেমন লষ্ট না হয়। বলি, আমি কি চাষী লয়, যে আমাকে উ সব কথা বলা? ত আমার ভাবনাটা বুঝি কম? ই শালা মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি। বলি, তোমার লয় পাঁচটা আয় আছে, ইটা গেলে উটা থাকবে, আমার আর কি আছে, শুনি?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মহেন্দ্র, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সব সওয়া যায়, কিন্তু ওরা বেশি হীনছিন করে, সেটা সইতে পারিনি। আমাকে দিলে জমি, ত স্বীকার যাই যে আমি দুটা পয়সা লাভ পাব, খেয়ে বাঁচব, কিন্তু বাবু তোমার কি লাভ হবেনি? তুমি কি এই লিয়ে বেঁচে থাকবেনি? ত আমি হীনছিন করার লোক হলম কিসে, তুমিই বল, দাদা'

বলতে হয় না। লখীন্দর জানে, চাষীর ওপর দরদ কারো নেই। যদি লাভ হল তো হল, নইলে সে চাষীর দিকে ফিরে তাকাবে না কেউ। জমি হল মা-লক্ষ্মী, তার সেবা করতে হবে। দু-এক বছর মা মন বিড়ে-কষে দেখেন, সেই পরীক্ষায় যদি কেউ টেকে তো মা মুখ তুলে চান। তা চাষীই বল, আর মুনিবই বল—সবাই সেই মায়ের সেবক। সে কথা আর কে শোনে! লখীন্দর বলে, 'চাষীকে হীনছিন করলে চাষেরই খেতি হয়, মহীন্দ। ই কথা খুব সত্য।'

ওরা দুজনেই চুপচাপ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহেন্দ্র। যেন ওর ভেতরকার একটা বেদনার কথা সজোরে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

মহেন্দ্র বলে, 'তোমাকে ডাকলম দাদা, আমার জমিটায় কি রকম কি জোল বাগাতে হবে, লালা কাটতে হবে একটু দেখি' দাও। এত বড় জমি, এর আগে এত আলু লাগাইনি কখন, তা তুমি একটু দেখ। বড় উবগার হয় থালে...'

লখীন্দর কাজ করতে করতে কথা বলে। তার কাজ বেশি কিছু নেই, শুধু একটা পরিকল্পনা ঠিক করে দেওয়া। চিন্তাও করতে হয় ওকে। বেশি রকম চিন্তিত হলে লখীন্দর হুঁকোটা মুখের সামনে না রেখে ঝুলিয়ে ফেলে। সেই লাঙল-দেয়া মাটির ওপর তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার হুঁকোটা টানতে শুরু করে।

'জান মহীন্দ, আজকাল মানুষ খাটবেনি জমিতে। এই যে তুমি লাঙল দিয়েছ জমিতে, তা আগে কোদাল দিয়ে কেটে জমি করতম আমরা। সেই মাটিকে ভাঙতম, তারপর চাষ দিতম লাঙল দিয়ে। মাটিতে যদি গত্ত বেশি হয়, ত আলু লাফি' উঠবে!'

'পড়তা কই, দাদা...' মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'এই যে তুমি কোদাল দিয়ে মাটি করার কথা বললে, তা ওতে মেহনত কি খরচাটা কি রকম দেখ!'

লখীন্দর বলে, 'মাটিকে ভালবাসতে হয়। ই হল তোমার গে বিয়া করার মতন। বউ দুটা মুখ ঝামটা দিল কি না দিল, ত-তাকে তুমি ফেলে রাখবে ?'

মহেন্দ্র বলে, 'বউ হল লিজের, আর জমি হল পরের। আমরা তবু না হয় ভাগচাষী, কিন্তু মজুর চাষী যারা, তারা ত জমির বাপের ধার ধারেনি...' খানিকটা ঝাঁজ ওর গলায়। বেশ খানিকটা বিরক্তি মেশানো আছে তাতে।

'ই তুমি মনের কথা বলেছ...'লখীন্দর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, দম নেয় একটু, 'ইটা ঠিক কথা। এই যে দেখ মজুররা কাজ বন্ধ করল, ধম্মঘট করল...ওই যে গো গত বছর যেবারে গোবিন্দ মিত্তির ফেরার হল... ত উটা আমি সম্পূন্ন ভালবাসিনি। জমিতে চাষ করবি, ত কম পয়সা বলে কাজ করবিনি ? তোর যদি লিজের জমি হত, ত তুই কি করতিস ? জমি আগে না পয়সা আগে ? তবে ওদের দাবিও লেয্য। তা সেটাও আমি খারাপ বলতে পারবনি...' কথাটা গোলমেলে হয়ে গেল, সেটা লখীন্দর নিজেই বুঝতে পারে। তাই বলে, 'ব্যাপার কি জান মহীন্দ, তালে-গোলে সবাই যে যার কোলে ঝোল টানছে ত জমির কিছু হচ্ছেনি। লক্ষ্মীর উন্নতি হচ্ছেনি...দেশে অমঙ্গল হচ্ছে।'

এরপরে আর কথা এগোয় না। লখীন্দর কাজ বুঝিয়ে দেয়, আর মহেন্দ্র শোনে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে আসে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

কাজ শেষ করে লখীন্দর বলে, 'আজ খুব আনন্দ পেলম ভাই তোমার এখেনে কাজ করে। তুমি হয়ত বলবে, ইটা বাজে কথা। কেন না, মজুরি ত পেলমনি, কুন্থু আমার লাভও নাই। তা সে কথা সত্য লয়, আনন্দ পেলম।'

'হবে হয় ত। তা রাগ কোরনি দাদা, তোমার ঘরে ধান আছে তোমার ই কথা সাজে। আমরা উসব পারবনি। পরের উবগার করা তোমাদেরই ভাল।'

একটা তিক্ততা ওর সারা চোখে-মুখে। লখীন্দর দেখে অবাক হয়ে যায়, আহত হয়। প্রথমটা ও কিছু বলতে পারে না, কিন্তু সত্যিই আনন্দ পেয়েছিল বলে বললে, 'ই কথা তোমার সত্যি লয়, ভাই, ই তুমি বুঝতে পারনি ..' কি করে যে বোঝাবে, সেটাও প্রথমটা ভেবে পায় না লখীন্দর। পরে বলে, 'তোমার ছেলে আছে, মহীন্দ ?'

লখীন্দরকে কেমন চিন্তিত মনে হয়। হয়তো, ওর মনে তখন সুধীর-অধীরের মুখ ফুটে উঠেছে। 'যার ছেলে-পুলে নাই তার কিছু নাই। পুত্ত

নরক থেকে উদ্ধার করে। পুত্তের মুখ দেখে স্বগ্‌গ-সুখ হয়। সেই ছেলের জন্ম তোমার বুক ঢেলে দিয়ে মানুষ করতে হয়। ছেলে বেঁচে থাকলে তুমিও বেঁচে থাকলে। ছেলে ত তোমারই অংশ। আমার কুলগুরু বলেছিল, বলে, বাবা লখীন্দ, তুমি ই পিথিমীটাকে তোমার পুত্ত মনে করবে। পুত্তের মত তাকে তোমার সব দিয়ে যাবে...সব চেয়ে বেশি দিবে তোমার বিদ্যা। তুমি যদি ভাল চাষ জান ত সেই চাষ শিখি' দি' যাবে তোমার লোককে...পথম তোমার পুত্ত পাবে সেই বিদ্যা, তারা পাবার পর অন্যকে দিতে পার। ই গুরুর বচন।'

বেশ স্বচ্ছন্দে বলে যাচ্ছে লখীন্দর। গ্রামের বৃদ্ধ লোকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক লোকদের সামনে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিজের তুচ্ছতম অভিজ্ঞতার কাহিনী পর্যন্ত বলবেই। লখীন্দর মাঝে মাঝে এমনই বকতে শুরু করে। 'তা আগে ই কথাটা বুঝতমনি। এখন ভাবছি এমন আনন্দ আর নাই।'

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকায়। একবার লখীন্দরের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে করে দেখে, তারপর 'হবে হয়তো' এই ভাব নিয়ে নিজের কাজে মন দেয়। সংক্ষেপে বলে, 'হুঁ...'

'বড় ছেলেকে আমি দিয়েছি আমার বিদ্যা। তা ওর মত লাঙলে-লোক এখেনে আর নাই। ঘরের দেয়াল তুলতে উ আমার ওস্তাদ, ভাই। আর অমন চাল ছাইতে আমিও পারিনি। ত ছোটটিকে সেদিন শিখাচ্ছিলম লাঙল ধরা, ত বড় হেসে উড়ি' দিলে। বললে, আর কেনে, আমাকে ত মুখ্যু করে রেখেছ, ত উটাকে একটু লিখাপড়া শিখাও। আর উ যে ছেলে তোমার, উ আবার লাঙল ধরবে!'

তারপর আপন মনেই বলে, 'মুখ্যু করে রাখিনি, ভাই। ওকে যা দি' গেলম, ত উ জানবেনি, ভগমান জানবে।' হঠাৎ যেন কোন কিছু মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে বলে, 'জান মহীন্দ, আমার দুটি ছেলে দু-রকম। বড়টির ভক্তি-ছেদ্দা নাই, উ আমার যে শেষ পর্যন্ত কি করবে ভাবতে পারছিনি। আর ছোটটির মত শান্ত তুমি দেখনি, লেখাপড়ায় অর মত পাঠশালে ছেলে নাই, তা উ কোদাল ধরতে কষ্ট পাবে। উ বোধায় কোদাল ধরতে পারবেনি...'

তার পরের দিন লখীন্দর নিজের জমিতে চাষ শেষ করে বাড়ি ফেরার মতলব করছে, এমন সময় খবর পেল, মনু দিগারের জমিতে ধান তোলা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে গেছে, আরও হবে। টুকি আর অধীর জল-

খাবার নিয়ে এসেছিল, তাদের হাতে লাঙল-জোয়াল আর গোরু দুটোকে দিয়ে চলে গেল লখীন্দর।

কিছুক্ষণ আগে ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছিল, চাষীর কষ্ট হলে কেমন করে চাষের কষ্ট হয়। কেন না, ওরা দেরী করে জল-খাবার নিয়ে এসেছিল, তাতেই এই কথা ওঠে। 'বলি শুন, মা টুকি, অধীর, তুমিও শুন ..চাষীকে কষ্ট দিতে নাই, খালে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়। সে অনেক দিনের কথা। লক্ষ্মণ দাস জমি চষতে গিছল, দণ্ডীপুরের মাঠে। জষ্টি মাস, মাঠে কেউ কোথাও নাই। তেষ্টায় ওর ছাতি ফেটে যায়...'

টুকি আগ্রহে সরে আসে, লখীন্দর কিছু মুড়ি-গুড়-মাখা ওদের খাইয়ে দেয়, 'তা উ পথের দিকে চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। শেষকালে দূরে ওর বউ মাথায় কলসী করে জল আনছে দেখতে পেলে ..তা জল দেখে ওর পেরানটা আরো আকুলি-বিকুলি করে...ত উ ছুটতে আরম্ভ করে ওর বউএর দিকে, কি না, এগি' গিয়ে জলটা খাবে। তা ওর বউ ভাবল, বুঝি দেরী হয়েছে বলে লাঙল-বাড়ি দিয়ে মারতে এসছে। মাথার কলসী আর খাবার ফেলে রেখে ভয়ে দে ছুট। ত উ চাষী কাছে এসে তেষ্টায় সেই ভিজে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে...জষ্টি মাসের মাঠ, সে কি জল আর তখন আছে...ত উ মরে গেল। ছাতি ফেটে মরে গেল।'

টুকি আর অধীর খাওয়া বন্ধ করেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

'তিন বছর সে মাঠে আর ধান হলনি। চাষীর অপমিত্যু হইছে, সে পাপ সবাইকে লাগল। পথে যদি কেউ জল চায়, মা, ত তাকে দিও।'

এই গল্প বলে খাওয়া শেষ করে উঠছে লখীন্দর, এমন সময় খবর এল।

'হ্যাঁ ?' লখীন্দর বলে।

'তুমি ত জানতে লখীন্দদাদা, মনুর বাবার ছিল ভাগের জমি উটা। ত দুবছর চাষের গতিক ছিল খারাপ। মনু ভাল ফসল ফলাতে পারেনি। তাতে জমিদার নিজে লাঙল দিতে আরম্ভ করেছিল গত আষাঢ় মাসে। ত আমরা সবাই মিলে সে জমিদারের লাঙল হটি' দিয়েছিলম। আমরা মনুর হয়ে দিয়েছিলম চাষ, ধান বুনে দিয়েছিলম, কিছুটি ওরা বলেনি। ত এখন মাঠ থিকে ধান তুলে লিতে চায় ওরা, সব ধান !'

'সেটা কি আর হয় রে, বাবু। চল চল।' লখীন্দর বললে।

আট

বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। উত্তর দিক থেকে সাঁ সাঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে মানুষের শরীরের চামড়া কুঁচকে দেয়। মনে হয় যেন হাত-পা জড়িয়ে আসে। পায়ের নিচে মাটি ভীষণ শক্ত, পায়ের তেলো দুর্বল হয়ে পড়ে বলে মাটিগুলোই কাঁটার মতো পায়ে বেঁধে।

লখীন্দর ওসব কিছু খেয়াল করে না, তার দৃষ্টি শ্যামগঞ্জের ওই বড় মাঠটার মাঝখানে। লখীন্দর দেখল, তারই মতো চারদিক থেকে আরো মেয়ে-পুরুষ ছুটে আসছে। আলের ওপর দিয়ে, ধান-কেটে ফেলা জমির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে কেউ কেউ। সমস্ত ধান তোলা হয়নি, কোথাও বা কাটা ধান আঁটি বাঁধা হতে বাকি আছে। সামনে দূরে ওই যেখানে লোক জড় হয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে সেদিকেও চোখ রাখতে হয়, আবার যাতে ধানের শীষে পা পড়ে ধান না ঝরে যায় সেদিকেও খেয়াল করতে হয়। ফলে যারা ছুটছে তাদের ছোটার ভঙ্গি প্রায় হাস্যকর হয়ে ওঠে।

লখীন্দর কেমন এক উত্তেজনা বোধ করে। ওর বুকের ভেতরটায় যে ঠিক কি করে ও বুঝতে পারে না। বোধ হয়, ওর পেট থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন জ্বালাজ্বালা করে, বুকটা ভীষণ দুরদুর করে। ওখানে পৌঁছে দলের মধ্যে মিশে গেল লখীন্দর।

ছোট ছোট পাঁচ-ছয়টা দল তৈরী হয়েছে। এ-দলেও নেই ও-দলেও নেই এ রকম লোকও রয়েছে। মাঝামাঝি ছড়িয়ে রয়েছে তারা।

কেউ ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কালো-কালো চিমসে-যাওয়া শরীর। হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে সমস্ত শরীর সাড়া দেয়। ওতে ওদের সংকল্পের একাগ্রতা বাড়ে।

কেউ ভীষণ চিন্তিতভাবে হুঁকোটাতে ক্রমাগত টান লাগিয়ে চলেছে। আর পার্শ্ববর্তী কেউ শুনুক বা না শুনুক মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলছে। কেউ বা নিশ্চিন্ত মনে মুড়ি চিবিয়ে চলেছে, লক্ষ্য করছে সবাইকে।

এদের মধ্যে একজন গঙ্গার ধারে চটকলে মজুরি করেছিল কিছুদিন।

তখন সে কিছু কিছু হিন্দী শিখেছিল। সে খুব জোর গলায় চেঁচাচ্ছে, 'কুছ্ পরোয়া নেই। বিলকুল সব মার ডাল দেঙ্গে। সব শালা লোক হাম দেখ লিয়া, তো পগার পার করেঙ্গা, সব শালাকো··· ।'

ওর কথা শুনছে না কেউ, যদিও সবার গলার ওপরে ওর গলা পৌঁছচ্ছে। ওর বাঁ হাতে একটা মূলো, ডান হাতে করে কোঁচড় থেকে মুড়ি বের করে মুখে দিচ্ছে, আর মূলো কামড়াচ্ছে। তারপর সেই মূলো গালে চেঁচাচ্ছে, 'হামারা জমি...জান দেঙ্গে ইসকে লিয়ে...'

কম-বেশি সবারই বক্তব্য প্রায় এক। ওর কথায় কেউ হাসে না। ওকে ওই ভাবে চেঁচাতে দিয়েই প্রত্যেকে কথা বলে।

'ধান কি ছেড়ে দুব ? ই শালা কি মগের মুলুক পেইছে নাকি··· ।'

'তা জমিদার, তার ইচ্ছায় কাজ ··' আর একজন বলে, 'তার সঙ্গে লড়তে হবে মনে থাকে যেন। তাছাড়া ই ধানগেছের অজয়বাবু আর হরি কায়েত লয়, শীরষের বড় জমিদার, সিং বাবুদের সঙ্গে বিবাদ...'

'এস্থ না, শালা, কুন শালা এসবে। ওরা ত এসেছিল, ত টিকতে পারলনি কেনে, গোভাগাড় করে পাঠি' দুবনি !'

আর একদলে আলোচনা চলছিল :

'লাঠালাঠি যে একটা হবে, সে ত বুঝাই যায়।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত-অনচিত, সেটা ভাব।'

'অত ভাবলে চলবেনি, খুড়া। আমরা ঢিলটি খেলে পাটকেলটি ফিরি দুব।'

তিনজন প্রবীণ গোছের লোক দুটো আলের মোড়ে বসেছে। প্রায় মুখোমুখি গোল হয়ে বসেছে ওরা।

'ধর তোমার গে যদি একটা খুন-জখমি হয়েই যায়, আর ই যে হবে সে ত জানা কথা ! ধর, জমিদার কি ছেড়ে দিবে নাকি, ত সেটা কি লেয্য হবে ?'

'ধম্ম-অধম্ম নাই ? তা বলে মনু দিগার এত কষ্ট করে চাষ-বাস করল, এ চাষ করতে কত দেনা হইছে তার সে খবরটা লাও...ধরগে এক বন্দে দশ বিঘা জমি...ই কি যা তা ব্যাপার, লোকটার সব্বনাশ হয়ে যাবে যে...'

'থালেই বল...ভাবলেনি চাইলেনি আর অমনি এসে ধান তুলে লি' যাবে এর একটা বিচার-আচার নাই ? আমরা কি তোমারগে ঘাস খেয়ে পেট ভরাই ?'

লখীন্দর ওখানে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হইচে বল দিকি।'

পাশাপাশি দু-তিনজন লোক জড় হয়ে আসে : 'তুমিই বল লখীন্দদাদা, ইটা কি সহ্য করা যায় ?'

'বলি আমরা ত মানুষ। লেয্য-অলেয্য একটা আছে। আজ আমার ঘাড় ভাঙবে, কাল তোমার, তা ইটা কি আমরা মুখ বুজে মেনে লুব? তা লুবনি!'

'আমরা হাজার হোক মানুষ ত।'

কথাটা লখীন্দরের কানে ঢুকতেই ওর বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। অনেকবার সে কথাটা চিন্তা করেছে, কিন্তু ঠিক ভেবে শেষ করতে পারেনি। সে আস্তে আস্তে বলে. 'তা একটা কিছু ঠিক করতে হবে ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইটা তুমি ঠিক বলেছ লখীন্দ। তা তুমি কি বল।'

'ধান আমরা দুবনি। তাতে যা হয় হউ।'

'ঠিক। ইটা তুমি ঠিক বলেছ। ইটা আমাদের মনে লেয়। এই, শুন গো তোমরা...' লখীন্দর এসেছে একথা এর কান ওর কান করে প্রায় সবাই শুনেছিল। কেউ বা আগ্রহবোধ করল প্রথম, কেউ বা করল না। কিন্তু এদের মধ্যে কে যখন বললে, 'শুন গো তোমরা, লখীন্দদাদা কি বলে শুন...' তখন একটু একটু করে সবাই ঘন হয়ে আসে। প্রত্যেকেই কথা বলছে, প্রত্যেকই জানতে চাইছে। লখীন্দরের কাছাকাছি লোকগুলি মাথা নেড়ে চিৎকার করছে, 'হ্যাঁ, ইটা ঠিক, ইটা ঠিক।' কিন্তু যারা দূরে রয়েছে তারা শুনতে পায় না। তারা জানতে চায়, চিৎকার করে প্রশ্ন করে। ফলে গোলমাল আরও বেড়ে ওঠে।

এই সময় সেই হিন্দী-জানা লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই, চুপ রহো।'

সবাই এক সঙ্গে চুপ করে, কিছুক্ষণ মাঝখানে সবাই তাকিয়ে থাকে। কে যেন বলে, 'লখীন্দদাদা কি বলছে শুন...'

'কি বলছ, বল...'

'হ্যাঁ, লখীন্দ পরাচীন (প্রাচীন) লোক, ত উনি বলুন...'

'ঠিক, পাকা-মাথার যুক্তি লিয়া ভাল...'

আবার গোলমাল বাড়ে। আবার সেই হিন্দী-জানা লোকটি চিৎকার করে ওদের থামায়। ইতিমধ্যে সে লখীন্দরের পাশেই এসে হাজির হয়েছে।

'আমরা ধান দুবনি।' লখীন্দর এই সুযোগে বলে। ওরা কিছুক্ষণ লখীন্দরের মুখের দিকে তাকায়। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ও কি বলছে। 'আমরা ধান দুবনি। ত মনু দিগারের খামারে আমরা ধান তুলব।'

'ব্যস, ইসকে বাদ কুছ বাত ভি নেই...'

সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে যে এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর হতে পারে না। সবাই সমর্থন করে আর লখীন্দরের প্রশংসা করে।

কিন্তু একজন যুবক গোছের কৃষক হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, 'আমার একটা কথা আছে শুন। আমার একটা কথা আছে।'

'কি বল, তোমার কি কথা...'

'তুমি আবার কি ফ্যাকড়া দিবে...'

লখীন্দর ওদের থামায়। বলে, 'না না, সবাইয়ের কিছু-না-কিছু বলা উচিত! এক মাথায় কাজ হয়নি। রতন, তুমি বল...'

রতন সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আমাদের লেতা (নেতা) কই? আমরা যে এই কাজটা করব তা এর ভালমন্দ আছে, বিপদ-আপদ আছে, আমাদের মাথায় কি আর উসব খেলে...'

'কথাটা লেয্য বটে···' একজন বলে।

যে উৎসাহের ভাবটা সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা যেন মনে হয় ঝিমিয়ে এসেছে। প্রত্যেকেই কথাটা ভেবে দেখে।

লখীন্দর বলে, 'বিপদ-আপদকে ত ভয় করলে চলবেনি। আমার হচ্ছে এই কথা, বাবু। আমরা চাষা-ভূষা মানুষ, ধান না হলে আমাদের চলবেনি, ত আমাদের ধান চাই। ধান আমরা তুলবই...'

রতন আবার বলে, 'ধর, জমিদারের লোক এসবে, একটা মারামারি লাঠালাঠি হবে, তখন?'

লখীন্দর চিন্তিতভাবে কথা বলছে। মাথার সামনের চুলগুলো ওর কিছু পেকেছে, কিছু কাঁচা। কাঁধের ওপর গামছাটা ঝোলানো। লখীন্দর ভাবছে, কেমন করে ও বৃদ্ধ মোড়লদের মত কথা বলবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে, রাগ করলে চলবে না, একটা ছুট কথা কি বেফাঁস কথা যাতে না বেরোয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

'আমার হল এই কথা। ধান যদি আমরা তুলি, থালে অনেক রকম আপদ-বিপদ এসবে, সেটা ঠিক। সেটা আমাদিকে মাথা পেতে লিতে হবে। কিন্তু ইটা আপনারা পাঁচজন ভেবে দেখ যে, পেটে যদি ভাত থাকে থালে সব হয়। যদি বল মামলা-মকদ্দমা, ত খামারে ধান আছে, ভয় করিনি। যদি বল লাঠালাঠি, ত খামারে ধান আছে, ভয় করিনি। ইটা আমরা বলতে পারব। ধানের তুল্য চাষীর বল নাই। ত সে ধান আমরা ছাড়বনি...'

সমস্ত জনতার সব দিক থেকে একটা সমর্থনের ধ্বনি ওঠে, তারপর আবার ওরা চুপ করে শোনে। 'রতন, তুমি যে লেতার কথা বললে, ত লেতার কাজ লেতারা করবে। আমাদের কাজ আমরা করব। আমরা ধান ত তুল্‌ল লি,

পয়ে বুদ্ধি দিবে লেতারা। এই ত গোবিন্দ মিত্তির আছে, ত দরকার হলে ওনারা আমাদের 'মাথা' দিবে বই কি।'

গোবিন্দ মিত্তির নামটা উচ্চারণ করবার সময় ওর গলাটা কেঁপে যায়। হয়তো তখন ভট্টাচার্য ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে, এই নামটা উচ্চারণ করেও ভাবে ঠিক করেছে কিনা। কিন্তু পরে আবার বলে, 'ওনারা সব এই কাজই করেন। তা ঐ রকম যদি একটা কুন্থ ঘটনা ঘটে যায়, থালে তেনারা এসবে বৈকি। তখন যদি তেনাদের কথা আমাদিকে ভাল লাগে ত শুনব, না হলে শুনবনি।' শেষ কালের কথাটা বলে লখীন্দর কতকটা শান্তি পায়, শেষ পর্যন্ত শোনা-না-শোনা যে তাদের ওপরেই আছে, এ কথা বলতে পেরে তার ভাল লাগে।

'থালে আমরা ধান তুলা আরম্ভ করি, কি বল। পাঁচজনে বল।'

কথা থেকে ওরা কাজের মধ্যে গিয়ে পড়ে। জমিতে ধানের আঁটিগুলো পড়েছিল। নিচের দিকে তাকিয়ে ওরা কাজের একটা প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করে। কেউ কেউ বা উত্তেজনার সময় ধানের আঁটির ওপরেই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে নমস্কার করে। 'আহা, মা লক্ষ্মী।'

ধান তোলা শুরু হয়। আঁটিগুলো এক জায়গায় গোছ করে বোঝা বাঁধা হয়, তারপর মাথায় ওঠে। 'মনু দিগারের খামারে লিয়ে যাও।'

লখীন্দরই প্রথম ধানের বোঝা মাথায় করে। সবাইয়ের চোখে তার সম্মান আজ খুব বেশি। তার কথা পাঁচজনে গ্রহণ করেছে, এই আনন্দে সে অস্থির। আজ সে সবার পা ধুইয়ে জল খেতে পারে। কারণ, আনন্দে লোকের মাথা গুলিয়ে যেতে পারে, অহংকার হতে পারে, তখন নিজেকে সবার অধম ভাবতে হয়।

কিছুক্ষণ ধান বইবার পর, সবাই ওকে নিবৃত্ত করে। 'লখীন্দদাদা, তোমাকে ধান বইতে হবেনি, তুমি বরঞ্চ আমাদিকে বলে দাও কি করতে হবে। তুমি একটু দেখাশুনা কর।'

'না, না, ই আমি ঠিক করছি...সবাই মিলে না লাগলে ত হবেনি। তা ছাড়া ই ধান বওয়ার কাজ ত তেমন কঠিন লয়, সবাই ইটা পারবে।'

'তুমি কি খেপেছ, লখীন্দদাদা। দেখ দিকি, কত লোকের হাতে কাজ নাই...থাম তুমি।'

অগত্যা লখীন্দর তাই করে। দশ বিঘা জমির ওপর কতক জনকে পুবে, কতককে পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে আবার কারা গাদা করবে, কারা বাঁধবে, সব ঘুরে ঘুরে নির্দেশ দেয়। সবাই তার কথা যতই শোনে, সে ততই

গম্ভীর হয়ে ওঠে, ততই সতর্ক হয়। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ সে বেশি সচেতন হয়ে ওঠে।

ঠিকমতো কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছে। কেউ আর কাজ-ছাড়া নেই। আলপথ দিয়ে ধানের বোঝা মাথায় কৃষকেরা চলেছে গ্রামের দিকে। এমন সময় জমিদারের দল এল।

সর্বপ্রথম দলটাকে দেখতে পায় সেই হিন্দী-জানা লোকটি। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই, শালারা আ গিয়া। শালা যে যার কাজ করতা হ্যায়, তো লাঠি কই? এই আও।' ও কয়েকজন ছোকরাকে নিয়ে গাঁয়ে চলে যায় লাঠি আনতে। আলের ওপর দিয়ে সজোরে ছুটে চলে ওরা।

কৃষকেরা প্রায় সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সবাই প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না। কিন্তু লখীন্দর চেঁচিয়ে বলে, 'ধান ছাড়বনি আমরা কেউ, ধান তুলে লি' চল।'

লখীন্দর প্রথম থেকে এটা আশংকা করেছিল। জমিদারের লোকজনকে একবার যখন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা যে এ অপমান হজম করবে না, সেটা জানা কথা। তাছাড়া এই জমিটার স্বত্ব বড় গোলমেলে। শীরষের সিংবাবুদের দখলে জমিটা থাকলেও, অজয় রায় এবং আরো অন্যদের সঙ্গে ওটার স্বত্ব নিয়ে কী সব জটিলতা আছে। ওদের পক্ষে আইন করা ঠিক সুবিধের হত না। সেক্ষেত্রে কিছু লাঠিয়াল আসাই স্বাভাবিক।

'কাজ আমরা ছাড়বনি...'

দলটা যত কাছে আসে, লখীন্দর ততই ঘুরে ঘুরে বলে, 'পুরুষের বাচ্চার ভয় নাই। আমরা গাঁয়ে যাচ্ছি ধান রাখতে, আবার ফিরে এসব, বউএর আঁচল ধরে কোণে লুকাবনি!'

জন পনেরো লেঠেল নিয়ে হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা এসেছে। ওরা প্রথমে এসে থমকে দাঁড়াল।

প্রায় প্রত্যেকের কানে কানে বলে চলেছে লখীন্দর, 'যতক্ষণ আমরা এক সঙ্গে আছি, কারো বুকের পাটা নাই এগাবার। যতক্ষণ আমরা...'

'শালারা', 'বেউশ্যার বাচ্চারা', 'বেজন্মা সব'—গর্জন ওঠে, গুমরে ওঠে এরা।

লখীন্দর হেঁকে বলে, 'চুপ কর ভাই, কাজ করে যাও। মুখ খারাপ করনি...'

দুজন লেঠেল এই সময় এগিয়ে এল। সবেমাত্র একজন চাষী মাথায় ধান তুলেছে, এমন সময় ওরা লাঠি দিয়ে বোঝাটা ঠেলে ফেলে দিলে। আগে ধানের

বোঝাটা পড়ে, তারপরে চাষীটা ঠিকরে পড়ে তার ওপরে। লোকটা গোঁ-গোঁ করতে থাকে, তার ঘাড়টা মুচড়ে গিয়েছে।

যে চাষীটি বোঝাটা তার মাথায় তুলে দিয়েছিল, সে ঘটনাটা দেখে ক্ষেপে যায়। চট করে সে একজনের লাঠিটা ধরে ফেলে, কিন্তু ছিনিয়ে নিতে পারে না। এই অবসরে দ্বিতীয় লেঠেলটা তার ওপর ঘা মারে একটা। তার কাঁধের ওপর। হৈ হৈ করে ছুটে আসে আরো কয়েকজন কৃষক।

ইতিমধ্যে সেই হিন্দী-জানা লোকটি এবং তার দলবল লাঠি-ঠেঙা নিয়ে ছুটে আসে। মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিল, রীতিমত বেধে যায় তারপর।

লখীন্দর প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো লাঠালাঠি হবে না, এই তার ধারণা ছিল, কিন্তু যখন শুরু হয়েই গেল, তখন ও থামাবার চেষ্টা করে। ও ভিড় ঠেলে সেই হিন্দুস্থানীটার কাছে এগিয়ে যায়। 'সর্দার, তোমার বাবুকে বলগে এটা ভাল হবেনি, এর একটা মীমাংসা ত আছে। মিটমাট আছে। তুমি ফিরে যাও।'

লখীন্দর সর্দারজীর উত্তর শুনতে পায়নি। তার আগেই একটা লাঠির ঘা লেগে ও অজ্ঞান হয়ে যায়।

চেতনা পেয়েই ও দেখে কার যেন বাড়িতে ও শুয়ে আছে। পাশের ছেলে-টিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল। শ্যামগঞ্জে ঢুকবার মুখে এক জেলের বাড়িতে শোয়ানো হয়েছে ওকে। দূর্বা ঘাস ছিঁচে তাই দিয়ে মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

'ধানের কি হল, ধান?'

'সে আর তোমাকে ভাবতে হবেনি। ধান ঠিক বওয়া হচ্ছে।'

ঠিকই ত। ঠিক রাস্তার ধারেই শোয়ানো হয়েছিল ওকে। সার বেঁধে ধান নিয়ে আসছে কৃষকেরা। তার মধ্যে মেয়েরাও যোগ দিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছের ডালগুলো আলোয় লাল দেখায়। সেই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে লখীন্দর। ওর ভালো লাগে।

কী অদ্ভুত মিষ্টি শব্দ ওই ধানশীষের। চলার তালে তালে নড়ে নড়ে এক আশ্চর্য শব্দ হয়, লখীন্দর কান পেতে শোনে।

ধান আসছে, ধান আসছে।

ধান আসছে সার বেঁধে। ধান গাঁয়ে ঢুকছে।

লখীন্দর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়

গোবিন্দ মিত্রের মা মারা গেল। ওর অসুখটা দুদিনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দুদিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, তৃতীয় দিন সম্পূর্ণভাবে চেতনা ফিরে আসে। সারাদিন ও সমানে মালতীর সঙ্গে কথা বলেছে। সেদিনেই ওর জীবনের যা আশা সেটা পূর্ণ হতে পেরেছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা গোবিন্দ এসে ওর সঙ্গে দেখা করেছে, সারা রাত অল্প-বিস্তর কথা বলেছে, তারপর শেষ রাত্রে মারা যাবার পর লোকজন ডেকে পুড়িয়ে আবার উধাও হয়েছে।

ছেলের হাতে মুখাগ্নি পাওয়া, সেটা সম্ভব হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

প্রথম দিন অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত মালতীকে বলেছে মতি : 'দেখ মা, আমার জন্যে এত কষ্ট করবি কেনে, মা। আমার কুনু আক্ষেপ নাই। গোবিন্দ ঠিক একবার এসবে, তুই দেখবি। আর যদি সে নাও এসে, থালে আমার কুনু রাগ নাই। সে আমার সুখে থাক।'

তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরে আসবার পর মালতীর মনে হল, মতি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে একটা বালিশ ঠেস দিয়ে বসাল ওকে। সকাল বেলা সাবু তৈরি করে খাওয়াল, পাড়া থেকে দুধ এনে দিল একটু।

'যদি গোবিন্দ নাই এসে, ত পাড়া-পিতিবাসীকে ডেকে চিতায় দেউ যেন।' একটু থেমে মতি আবার বললে, 'মরবার সময় তুই যে এই করলি আমার, ত তোকে আশীব্বাদ করলম, মা। আশীব্বাদ করলম তুই সুখী হবি।'

মালতী বুঝতে পারেনি, তাই। নইলে মতির মৃত্যুর লক্ষণ প্রায় সবই দেখা দিয়েছিল। ওর মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত প্রশান্ত। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নিগ্ধতা অত্যন্ত পরিষ্কার করে চোখে পড়ে। কেবল মাত্র, বাক্‌শক্তিই ওর সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল।

'আমাদের বাঁচা আর কিসের জন্যে। ছেলেকে সুখী দেখতে পেলে তার বাড়া আনন্দ মায়ের কি আছে। ত আমার মনটা কি বলছে জানু, মালতী, যে উ গোবিন্দ আমার সুখী হবে। তুই দেখবি, দেখবি তুই।'

বিকেলের দিকে মালতীকে বলল মতি, 'মা মালতী, তুই ডেকে আন, ডেকে আন পাড়া-পিতিবাসীকে। বকুলের মাকে ডাকবি, শ্যামের জেঠাকে ডাকবি ·· মরবার সময় লোক দেখে মরতে হয়। ত শুন আমার দিদিমায়ের কথা। তার ছোট ছেলা ছিল বীরভুঁইয়ে। ই দিকে মর-মর হইছে বুড়ি, কিন্তু ছোট ছেলাকে দেখবে। বলে, সব ছেলাকে দেখলম, ওকে না দেখলে আমার পাপ কাটবেনি, আর উ ছেলাও সুখী হবেনি। ত সে ছেলাকে দেখে তবেই বুড়ি মরল...'

এই রকম অজস্র আদেশ-উপদেশ করে গল্প শুনিয়ে মালতীকে অস্থির করে তুলল মতি। তারপর যখন গোবিন্দ এল সন্ধ্যের পর, তখন ও একটু হাসল। হাসির ভঙ্গি করল মাত্র। হাসলে যেমন করে ঠোঁট প্রসারিত হয়, চিবুকটা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, সেই রকম হল শুধু। কিন্তু হাসি তো শুধু প্রত্যঙ্গ-বিক্ষেপ নয়, যা দরকার ছিল সেই প্রাণই ছিল না তাতে। গোবিন্দ দেখেই বুঝেছিল।

গোবিন্দ আসতে আর কিছুই করতে পারল না মতি, শুধু ঐ প্রাণহীন হাসি ছাড়া। বললে, 'কাছে মাথাটা লিয়ে আয়, গোবিন্দ।' মাথাটাতে কোন রকমে ডান হাতটা তুলে বললে, 'তুই এসবি আমি জানতম গোবিন্দ, আমি জানতম। তুই আমার সোনার ছেলা...তুই এলি বলে কত আনন্দ যে আমি পেলাম। আমি সুখে মরব গোবিন্দ···'

কিছুক্ষণ পরে আবার বললে, 'লোকে তোকে নিন্দা করে। তোর মত ছেলার আবার নিন্দা! ত আমার কাছে কথা দে, গোবিন্দ, তুই আবার বিয়া করবি। এবরে ভাল দেখে বিয়া করবি। গরীবের ঘরের মেয়া লিবি, গোবিন্দ, বড়-লোকের দিকে চাইবিনি...' ছেলে যখন প্রতিশ্রুতি দিল আবার বিয়ে করবার, তখন ও চুপ করে গেল। ঠোঁট দুটি হাসির মত করে ছড়িয়ে রইল বাকি সময়টা।

তারপর, শেষ রাত্রের দিকে মারা গেল ও।

পাড়ার লোকেরা এই মৃত্যু নিয়ে নানা রকম আলোচনা করলে।

'বুড়িটা মরে গেল, আহা! কত কষ্টই না পেলে মরবার সময়।' একজন স্ত্রীলোক বলে, 'বেটাটাই বা কি রকম, দেখ। ওর জন্যেই ত বুড়িটা মরল। বুড়ি আশা করে বসেছিল, বেটা পাস করে এসে দুধে-ভাতে খাওয়াবে, বেটা জজ হবে, মেজিস্টার হবে, আর উ হবে রাজার মা, তা বেটা পাঁশ পাছুড়ে দিলে মুখে...'

'তোর বেটার লেকুচি করেছে,...' বললে আর একজন বুড়ি।

'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার অমন পাস-করা বেটার মুখে···' বলে তৃতীয় জন আলোচনাটা শেষ করে।

এই আলোচনাটাই চলছিল অন্যত্র, কয়েকজন বুড়োর মধ্যে। একজন তামাক টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'গোবিন্দকে ত দেখলম ছেলেবেলা থেকে, বুদ্ধিমান ছেলে। ওর মা ঘুঁটে গুড়াত, ধান ভানত, ত সেই করে পাঠশালে দিল ওকে। তা সেইখেনে বিত্তি পেয়ে গোবিন্দ গেল চন্দখানায় পড়তে। তারপর আর ওর খবর রাখতমনি। এক রকম ভুলেই গেছলম ওর কথা। ত ওর মাকে দেখতম ধান ভানছে, জ্বালন ভাঙছে। মধ্যে মধ্যে দেখতম চিঠি পড়াতে যেত শ্যামের কাছে। ত বুড়ির খুব আশা ছিল, বেটাকে লিয়ে ঘরকন্না করবে, ত ওর এই দশা, কোথা রইল বেটা...আর কোথা রইলি তুই...'

'হাঃ, সবই ভগমানের ইচ্ছা, তারই লীলা খেলা সব...আমরা অধম জীব, আমরা কি বুঝব···'

আর একজন ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কোমরের দাদ চুলকোচ্ছিল। সে বললে, 'ই-টা কিন্তু আশ্চর্য, বুড়িটা এক দিনের জন্যেও ছেলাটাকে গাল দেয়নি। ছেলাটার কাছ থেকে সে কি পেলে, না সুখ, না চারটি ভাত...তা আমাদের ঘর-সংসারে এমনটা যদি হত, ছুরি-কাটারি চলত। আমার বড় ছেলাটার কথাই ধর, বাছা আমার অকালে প্রাণটা দিলে, সে কপাল আমার, কপাল···' বুড়ো সত্যিই বাঁ হাত দিয়ে কপালে দুটো ঘা দিলে, গলার স্বর তার ভারী হয়ে এসেছে, 'বাছা দুদিন জ্বর থেকে উঠেছে, ত তখন বের্ষেকাল, জল পড়ছে হেথা একবার হোথা একবার...ঘরে আমি ভুগছি, ত ওকে জোর করে পাঠালম মজুর খাটতে। সেই যে জ্বর লিয়ে ফিরে এল, ত দুদিনে নিমুনা হয়ে আর উঠলনি।' বুড়ো চোখের জল মুছল।

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না, তার পর আবার পুরনো প্রসঙ্গ ফিরে এল। 'খালেই বল, গোবিন্দর মা যে কুনু দিন তার ছেলাকে একটা গাল পর্যন্ত দিলনি, তা উ কি ভেবেছিল···'

'অমনটি না হলে কি অমন ছেলা হয় '

'ই তুমি ঠিক কথা বলেছ, ভাই। গোবিন্দর মত ছেলের মুখ দেখে লাখ কষ্ট সহ্য করা যায়। যে অমন ছেলার মুখ দেখে মরতে পেরেছে, তার আবার কষ্ট কি। এই দেখ না, এই আট-দশখানা গাঁয়ে গোবিন্দর শত্তুর কে আছে।

বলি, সারা দিন সারা রাত তো সে ঘরে ছিল, পুলিস খবর পেইছে তার ? কেউ রা কাড়েনি। এমনই ছেলা !'

'এ কথা তুমি ঠিক বলেছ। গোবিন্দ ধন্যি ছেলা, গোবিন্দর মা ভাগ্যিমানী মেয়েমানুষ।'

গোবিন্দ মিত্রের মায়ের মৃত্যু নিয়ে নানা জনে নানা রকম করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। গোবিন্দ এ অঞ্চলের কৃষক-আন্দোলনের কর্মী। তাই এ নিয়ে আলোচনা। গোবিন্দর প্রভাব অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র হয়েছে, এবং এই প্রসঙ্গে রাজনীতি, কৃষক আন্দোলনের কথাও উঠেছে। গোবিন্দর মায়ের স্বার্থত্যাগ সবাইকেই বিস্মিত করেছে। এই অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ এতদিন কারো চোখে পড়েনি, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা সবারই চোখে পড়ল। সবাই প্রশংসা করল।

এই প্রশংসা সহজভাবে নিতে পারেনি এমনও ছিল কেউ কেউ। সাবিত্রীর স্বামী ধানগাছিয়ার অজয় রায় তার মধ্যে অন্যতম। গোবিন্দর নামোচ্চারণ নানা কারণে তাঁর কাছে অসহ্য।

গোবিন্দ তাঁর আত্মীয়, তাঁর সম্পর্কীয় ভায়রা-ভাই। এই সম্পর্কও মধুর হয়নি।

অবশ্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক কারো সঙ্গে মধুর হল বা না হল সে নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। তাঁর সম্মান ধরে টান দিয়েছিল গোবিন্দ। গোবিন্দ তাঁর চাষীদের ক্ষেপিয়েছে, তাঁর জমিতে মজুরি করে এমন লোকদের নাচিয়েছে। যদিও কোনবারই তেমন কিছু করতে পারেনি সে, তবু এসব ব্যাপার চাপা-আগুনের মতোই, কোথায় কখন জ্বলে উঠবে ঠিক নেই।

আর সেটা গোবিন্দের দ্বারাই হবে তা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

একবার তাঁর স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, তোমার বোনাইটি একটি ধনুর্ধর। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি লোক তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। অথচ তার না আছে চাল, না আছে চুলো। শুধু বুলি শিখেছেন কতকগুলি : জোতদার ঠেঙাও, জমিদার খতম করো...' ঠেঙাও আর খতম কর কথা দুটোর ওপর অদ্ভুতভাবে মোচড় দেন অজয়, গলার স্বরটাকে টেনে টেনে অস্বাভাবিক করেন, 'তা ওই শুনেই কেঁচোর দল কিলবিল করে ওঠে, অবিশ্যি একটা পায়ের খেঁতলানি সয় না, তবুও...' অজয় দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে খানিকটে করুণা-মিশ্রিত সুরে বলেন, 'অথচ মজা দেখো, ওই কেঁচোগুলোই ঠ্যাঙানি খাবে, সর্বস্বান্ত হবে, তবু গোবিন্দুর বোল ছাড়বে না...'

সেই গোবিন্দ বলতে গেলে দুদিন বাড়িতে ছিল। এই দুদিনের মধ্যে কত কি করা যেতে পারত। কিন্তু পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়নি।

হরি চৌধুরীকে ডেকে ধমকায় অজয়, 'কই, তোমার লোকজন কই। এক রাত্রি একদিন বাড়িতে ছিল গোবিন্দ, তার মধ্যে তোমার কোনো লোকই খবর দিতে পারল না একটা!'

হরি সম্পর্কে তাঁর মামাশ্বশুর। কিন্তু কখনো তিনি মাতুল সম্বোধন করে ডাকতেন না। কথা বলবার দরকার হলে সোজাসুজি কথাটাই পাড়তেন, সম্বোধন করার দরকার হত না। অথচ হরি সব সময়ই তাঁকে 'আপনি' বলে কথা বলত।

সে বললে, 'না হাঁক-ডাক করে ভালই হয়েছে, বাবাজী। ওই লোকদিকে যদি ডাকতম ত হয়ত বলত, একটা লোক মরে যাচ্ছে, ই সময়টা কি উ সব করা ভাল? ধম্ম-অধম্ম নাই! তার চেয়ে এ রকম কত সময় আসবে, বাবা, একটু সবুর করা ভাল। . মাছ না হয় জাল থেকে পালিয়েছে, তাই বলে পুকুর ছেড়ে যাবে কি করে।'

একটা ভোঁতা গোলগাল হাসি হরির মুখে ছেয়ে থাকে। এমনিতে অজয়ের সঙ্গে ওর কথা বলার সাহস নেই। অজয়ও প্রায় অন্য দিকে তাকিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু কথা একবার শুরু হলে আস্তে আস্তে ওর সাহস আসতে থাকে, তারপর এক সময় বরঞ্চ অজয়কে নরম ভঙ্গিতে কথাবার্তা চালাতে হয়।

'তোমার লোকজনের এই রকম ধম্মাধম্মের জ্ঞান থাকলেই হয়েছে আর কি...' অজয় কেমন একটা তাচ্ছিল্য আর হতাশার ভাব দেখান। আর ব্যাপারটা সত্যি বলে খানিকটে বিব্রত বোধ করেন, 'দরকারের সময় যাদের পাওয়া যায় না, সে সব লোক বাতিল করতে হবে...' কাটছাঁট সোজা কথায় ব্যাপারটা শেষ করাই তাঁর ইচ্ছে, যত কম কথা বলে মামাশ্বশুরকে বিদেয় দেওয়া যায়, সেটা তাঁর লক্ষ্য।

হরি আরও নরম ভঙ্গিতে কথা বলে, অবশ্যি কথাগুলো সরল বলে তার জোর আরও বেশি। শেষ পর্যন্ত যাতে নিজের যুক্তি পরামর্শ কাজে লাগে, সেটাই ওর উদ্দেশ্য।

সে বলে, 'আমি বলি, বাবাজী, এমন ভাবে ব্যবস্থাটা করুন যাতে সব কুলই বজায় হয়। এই ধরুন গে, আমাদের দীনুর কথা, ও লোক তো আমাদের বাঁধা গোলাম। তা কেনে এমনটি হল? না উ আমাদের প্রজা, ওর বাস্তটা

বাঁধা আমাদের কাছে, তার উপর মাঝে-সাঝে অনুগ্রহ পায়, দুটো ভোজ পায়। এর চেয়ে আর বাঁধবার উপায় কী আছে? ত মানুষকে এই রকম করে বাঁধতে হয়, আস্তে আস্তে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিতে হয়, বাইরে থেকে মনে হবে উ ঠিক আছে, কিন্তু আসলে ফোঁপরা সব ফোঁপরা...'

দুটো হাতের আঙুল দিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে হরি চৌধুরী। অজয়ের চোখ দুটো পিটপিট করে। যতটা খাড়া থাকবে বলে প্রথমটা ঠিক করে-ছিলেন, অতটা থাকা যায় না। এই সব ব্যাপারে অসাধারণ বুদ্ধি হরির। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মানুষকে এমন জড়িয়ে ফেলবে যে খোলা শক্ত। আর এই রকম কাজ করতে ও ওস্তাদ। কিন্তু যদিও উনি বুঝতে পারেন না গোবিন্দকে ভেতর থেকে ফোঁপরা করবেন কি করে, তবু হরির থেকে রেহাই পাবার জন্যে বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তা তুমি একটু দেখো ব্যাপারটা।'

এর বেশি কথা আর আসে না, বলতেও চান না অজয়। যত তাড়াতাড়ি লোকটাকে কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকান অজয়। গ্রাম পেরিয়ে মাঠের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। সবুজ মাঠ, তার একদিকে সার বেঁধে তালবন। এক ঝাঁক চিল পাক খাচ্ছে আকাশে।

ছেলেবেলায় গ্রামকে তাঁর মনে হতো শান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতো। এখন তার মধ্যে প্রাণের সাড়া দেখতে পান। সে-প্রাণ এমনি বোঝা যায় না, তার গতি কুটিল, দুর্ধর্ষ, তার ভেতর চক্রান্ত আছে, যুদ্ধ আছে, আবার চমৎকার সব সম্ভাবনাও আছে।

নতুন এক কর্তব্যের তাগিদ অনুভব করেন। ঠিক তাও নয়, দায়িত্বও বটে। এই গ্রামের জীবনে নতুন যুগের সম্ভাবনা এসে গেছে। অজয়ের মনে হয়, তিনিই সেই যুগকে চিনবেন ভাল করে, তার ওপর প্রভুত্ব করবেন। কিন্তু বড়ো শক্ত সেই কাজ।

সে পথের বাধা হচ্ছে গোবিন্দ। আর তাঁর নিজের সহায় হচ্ছে হরি। এরা দুজনেই তাঁর আত্মীয়, তবু দুজনকেই ঘৃণা করতে হয় তাঁর।

কথাটা ভেবে হাসেন অজয়। যে-পথে তিনি চলেছেন, সে-পথে তিনি একা। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে পাওয়া যাবে না, ওরা শুধু পথের মাঝখানকার জিনিস। দুদিন বাদে কোনো দরকার থাকবে না। কিন্তু তবু

মাঝে মাঝে তাঁর জীবন দুর্বিবহ হয়ে ওঠে। আর ঠিক গোবিন্দ আর হরিকে নিয়েই তাঁর মর্ম-যন্ত্রণা।

তাঁর জীবনে হরি এসেছিল টাকার থলি নিয়ে। কী কুক্ষণেই এসেছিল! ও এখন ফেঁপে ফুলে গিয়েছে। ওকে সাহায্য করেছেন তিনি, কিন্তু জড়িয়ে পড়েছেন, হরিকে ছাড়া তাঁর চলবেই না। এসব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন, কিন্তু মাঝে মাঝে গায়ত্রীর জন্য তাঁর বুকটা কোথায় যেন ব্যথা ব্যথা করে। গায়ত্রীকে কুমারী অবস্থায় নষ্ট করেছিল হরি। সেদিন খুন করতে চেয়েছিলেন তিনি হরিকে, কিন্তু পারেননি। আশ্চর্য লোক হরি, বাইরে কত মেয়েকে যে ও টেনেছে তার সংখ্যা নেই। কিন্তু তাই বলে নিজের ভাগনীর সম্পর্কীয় বোনকে...ছিঃ। কিন্তু গায়ত্রীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর নিজের দোষই হয়ত বেশি। গায়ত্রীকে না জেনে বিয়ে করেছিল গোবিন্দ, কিন্তু ক্ষমা করেছিল তাকে। ওরা হয়তো সুখেই ছিল, কিন্তু নিজের কাজে তাকে লাগিয়েছিলেন, গোবিন্দর রাজনীতিক গতিবিধির গুপ্ত খবর দিতে। পারল না মেয়েটা। গোবিন্দ তাকে খুন করে ফেলল।

অজয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

দশ

অজয় চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দোতলার কোণের দিকে এই ঘরটা তাঁর খুব প্রিয়, আর পূর্বদিকের এই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে তিনি ভালবাসেন। এটাই তাঁর শোবার ঘর।

বাড়ির একটা চাকরানী এসে খবর দিলে, 'মা একবার ডাকছে আপনাকে। আপনি এসে একবার শুনে যাও...' মেয়েটার বয়েস হয়েছে, বোধহয় প্রৌঢ়াই হবে। চাকরানীগিরি করে কাটিয়েছে অনেক দিন, তবু অত ছোট অজয়কে দেখে সে ঘোমটা টেনে দাঁড়াবে। বাঁ-দিকে মুখটা বাঁকানো, কোনরকমে জবুথবু হয়ে উচ্চারণ করলে কথাটা।

অজয় বলতে গেলেন, 'কেন, এ ঘরটা ত সদর-মহল নয়, এখানে তো তিনিই আস্‌তে পারেন', কিন্তু বললেন না। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে এটাতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি, কিন্তু ঝি-চাকরের সামনে রাগ দেখানো তাঁর অভ্যাস নয়, তাই সামলে বলেন, 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

জানালাটা দিয়ে আর একবার বাইরে তাকিয়ে নেন তিনি। তাঁর ভাল লাগে ওই মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তাকালেই তাঁর মন যেন বলে ওঠে, এসব আমার, এসব আমার। ম্যাট্রিক পাস করার পর, দু-চার মাসের জন্যে কলেজ করতে গিয়েছিলেন তিনি কলকাতায়। পুজোর সময় ফিরে এসে আর যাননি। বাবাকে বলেছিলেন, 'ও আমার দ্বারায় হবে না, আমি গাঁয়ের ছেলে, চাষই দেখব।' সেই থেকে গ্রামে আছেন, সমস্ত জমি রেখেছেন নিজের হাতে, নতুন জমি কিনেছেন, কিন্তু প্রজা বসাননি। সেই জমি নিজে চাষ করান, হয় ভাগে, নয়তো মজুর লাগিয়ে। নিজেই দেখা-শোনা করেন সব কিছু। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অজয়।

দোতলারই আর একটা ঘরে সাবিত্রী ছিল। উত্তর দিকের দেয়ালটাতে দুদিকে দুটো জানালা, তার মাঝখানে তক্তপোষের ওপর কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে সাবিত্রী, দেয়ালে ঠেস দিয়ে। অজয় ওর সামনে এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে চৌকিটা টেনে নিয়ে বসলেন।

সাবিত্রী ডান দিকে মাথাটা একটু বাঁকিয়ে বললে, 'সামনে এসে বসনা একটু, ঘুরে বসতে কষ্ট হবে আমার।'

অজয় কোন কথা বললেন না, আস্তে আস্তে চৌকিটাকে আবার সরিয়ে এনে বসলেন।

'বিছানায় একটু উঠে বোসো না, আমার ব্যথাটা আজ বেড়েছে, জ্বরও হয়েছে একটু...' অজয় বুঝলেন না, অসুখ বাড়া আর বিছানায় উঠে বসার সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে, তবু বিছানায় উঠে একটা কোণের দিকে চুপ করে অপেক্ষা করে রইলেন।

সাবিত্রী জানে, মরে গেলেও অজয় দুটো ভালো-মন্দ কথা আগে জিজ্ঞেস করবে না, তাই ও নিজেই বলে, 'কেমন আছ তুমি?'

অজয়ের দুটো ঠোঁটে অত্যন্ত ধারালো একটা হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু সেটা চেপে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন অজয়।

সাবিত্রী বলে, 'অমন করে চেয়ো না, ওটি আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না, একটুও না ..' সাবিত্রী ফোঁপাতে শুরু করে।

অজয় জানেন, এটা হচ্ছে ওর ভূমিকা। একটা কোনো কিছু ওর বক্তব্য আছে, সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ চুপ করে থাকতে হবে। তারপর কোনো একটা মতামত দিলেই হবে। আশ্চর্য স্বার্থপর মেয়েটা, নিজের কথা ছাড়া কারো কথাই ও চিন্তা করবে না। আর নিজের দুঃখকেই যারা সব চেয়ে বড় করে দেখে, তাদের কি বলা যেতে পারে। তাই তিনি চুপ করে থাকেন।

'একদিন তুমি আমাকে যখন বিয়ে করেছিলে, তখন বলেছিলে, আমি লক্ষ্মী, আমার জন্যেই তোমার অত উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এখন আমার এই অসুখ, আমি এতটুকু কিছু মুখে তুলতে পারিনে, তো তুমি একবার জিজ্ঞেসও কর না, কেমন আছি। কপাল আমার, কপাল...'

আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছল সাবিত্রী, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, আমি জানি, এখন তোমার কোন কাজেই লাগব না আমি, তবু মানুষের দয়ামায়া বলে তো আছে। লোকে কুকুর-বেড়ালেরও একটা তদারক করে। তো আমি কি কুকুর-বেড়ালেরও অধম!' একটা দুরন্ত কান্নার বেগ কোনো রকমে দমন করে সাবিত্রী। তারপর বলতে শুরু করে, 'মামা বলছিল...'

অজয় থামান ওকে। 'তোমার নিজের কথা বল। আবার মামার কথা কেন?'

অভিমানে ফুলে ওঠে সাবিত্রী। ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'কেন বলব না, সবার কথা বলব। সবাইকে তুমি আমার মত ঘেন্না কর। সবাইকে ঠিক নয়, যতক্ষণ লোক তোমার কাজে লাগে, ততক্ষণই তুমি তাকে আদর কর, তারপর পায়ে ঠেলে ফেলে দাও।'

'সেটা সত্যি।'

'সত্যি? লজ্জা করে না তোমার ওকথা বলতে? একদিন মামাকে আমি আনিয়েছিলুম বলে বেঁচে গেছলে। তখন আমাদের দুজনেরই দাম ছিল। মামার টাকার জোরেই না তোমার সেই মকদ্দমাটা মিটল। তারপর তুমি যে এত জমি করেছ সে কার জন্যে? মহাজনি করেই মামা তো চাষীদের তোমার পায়ে এনে ফেলে, ঋণের দায়ে সে চাষী পথ খুঁজে পায় না। তারপর তুমি জমিটা গ্রাস কর। বল, বল দিকিন, সত্যি কিনা?'

'তোমার শরীর আরো খারাপ হবে, তুমি চুপ কর একটু। রাগ করলে, উত্তেজিত হলে তুমি ভেঙে পড়বে।'

সাবিত্রী হাঁপিয়ে উঠেছিল। চোখগুলো বড়-বড় হয়েছিল বলে তাই আরো শাদা দেখাচ্ছিল। অজয় ওকে শুইয়ে দিয়ে চোখে-মুখে জল দিলেন একটু। কিছুক্ষণ নিঃঝুম হয়ে পড়ে রইল সাবিত্রী, তারপর খানিকটে সামলে নিলে।

অজয় বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। এইবার থেকে তোমাদের সাহায্য আর নেব না, নিজেই দাঁড়াতে চেষ্টা করব। অন্যের সাহায্যের ঝামেলা অনেক, নিজেকে ছোট হতে হয় অনেকখানি...'

সাবিত্রী চোখ বুজে ছিল। চোখ বুজেই হাত নেড়ে থামাল ওঁকে। অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললে, 'অতি নিষ্ঠুর মানুষ তুমি। তোমাকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়। কাজ ছাড়া কিছু জান না, তোমার কাজের জন্যে যে কাউকে তুমি মেরে ফেলতে পার। আমার অমন বোন গায়ত্রী, তার কে অমন সর্বনাশটি করলে? সে তোমার জন্যেই তো মারা গেল। ছিঃ ছিঃ। লোকে বলে, মেয়েটার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছল তাই মেরেছে। কিন্তু সে-কথা তো সত্যি নয়। গোবিন্দ সে কথা জানবার পরেও তাকে কিছু বলেনি। নিজে তাকে লেখা-পড়া শিখাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু তোমার জন্যেই বাছা আমার প্রাণটা হারাল, শুধু তোমার জন্যে!'

কথাটার মধ্যে সত্য ছিল বলে অজয় এতবড় অপমানটা সহ্য করে নিলেন।

আস্তে আস্তে বললেন তাঁর কথাটা, নিজে যেন চিন্তা করতে করতে বলছেন, 'তোমার বোনের জন্যে আমারও কষ্ট হয়। কেবল তাকেই আমি কিছু দিতে পারিনি, তার কাছ থেকে নিয়েছি শুধু, সেইটেই আমার লাগে !'

ওরা দুজনেই এরপর চুপ করে থাকে। তারপর অজয় বলেন, 'কিন্তু তোমার আসল কথাটা কী বল দেখি, কী জন্যে ডেকেছিলে।'

সাবিত্রী উঠে বসল। তারপর স্বামীর পায়ে ধরে বললে, 'ওগো, আমাকে একটু ভালো করে দাও না। আমি আর কিছুই চাইনে। তোমার ঘরের দাসী-বাঁদী করে রেখো না হয়, কিন্তু আমাকে ভালো করে দাও।'

'কিন্তু অমন করে বেঁচে তোমার কী হবে। বাঁচাটাই কী সব। দাসী-বাঁদী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো!' অবিশ্বাসী, চিবানো স্বরে বললেন অজয়।

সাবিত্রী এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপর বললে, 'তবে শোন, তুমি আমার দিকে আর ফিরে চাও না, সে শুধু আমার এই অসুখ বলে। আমি মেয়েমানুষ, আমার স্বাস্থ্য নাই, আমার রূপ নষ্ট হয়ে গেছে, কী করে আমি তোমায় ধরে রাখব? তোমার এত সম্পদ, কিন্তু আমার কোন কিছু নাই, কিছু না...'

অজয় বিস্মিত হয় সাবিত্রীর কথা শুনে। কিন্তু তবুও বলে, 'কেন, এত সব আমার আছে, সেগুলো কী তোমার নয়?'

'না, না, কিছুই না, কিছুই আমার নয়। সব তোমার, তুমি যেদিন আমার হাতের মধ্যে থাকবে, সেদিন আমার সব...'

'তাই বলো, নিজের কথাটা বলো। কী ভীষণ নীচ তুমি !'

'হ্যাঁ, তাই...আমি নীচ, আমি স্বার্থপর, তবু আমাকে ভালো করে দাও, তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমাকে ভালো করে দাও।'

অজয়ের একবার মনে হয়, পায়ের কাছে তালগোল পাকানো ওই কঙ্কালটাকে লাথি মেরে চলে যান। তাঁর স্ত্রী যে এত কাঙাল, তা তিনি এর আগে ভাবতেই পারেননি। কিন্তু অত নীচকে কি করে শাস্তি দেবেন তিনি। তাই বলেন, 'বল কি করতে হবে। তোমার জন্যে করিনি এমন কিছুই তো নাই। সাত বছর ধরে ডাক্তার-কবিরাজ দেখানোর তো ত্রুটি হয়নি। কলকাতাতেও তো তোমাকে রেখেছিলাম দুবছর...'

'আমি একটি মঙ্গল-যজ্ঞ করতে চাই। বাঁকরার শিব-মন্দিরের পূজারী ঠাকুরকে দিয়ে সেই যজ্ঞ করাব।'

কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের নামে ছলাৎ করে মাথায় রক্ত ওঠে অজয়ের। এই

লোকটাকে দেখতে পারেন না তিনি। তবু অবিচলিত থেকে তিনি বলেন, 'যজ্ঞ তুমি কোরো, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কৃষ্ণ ভটচাজকে দিয়ে নয়, অন্য যে কোনো বামুনকে দিয়ে কোরো, তাহলেই চলবে। জানো তো ঐ ভটচাজের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই।'

'তুমি শুধু তোমার কথাই ভাবছ। আমার কথা একটুও নয়, একটুও নয়।'

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে ধীরে সুস্থে আচরণ করেন অজয়। আস্তে আস্তে তিনি পাটা সরিয়ে নিলেন, তারপর তক্তপোশ থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ইতিমধ্যে শ্যামগঞ্জের ধান তোলার ঘটনাটা ঘটে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী। কী যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। সেদিন বিকেলে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এমন সময় হরি এসে সেই পুরোনো কথা পাড়লে। সাবিত্রার মঙ্গল-যজ্ঞের কথা। প্রথমটা অত্যন্ত চটে গেলেও পরে তাঁর মাথায় একটা পরিকল্পনা আসে, তাই তিনি রাজী হয়ে যান।...

হরি অজয়ের মনের অশান্তির খবর রাখত না। শ্যামগঞ্জের ব্যাপারটা তার কাছে সাধারণ ঘটনা। তাই সে এসে বললে, 'সাবিত্রী যদি একটা কিছু করতেই চায় ত তার এই ইচ্ছাটা আর অপূরণ থাকে কেনে। আমি বলি বাবাজী, তার জন্যে তো সব কিছুই করলেন, তো এটা আর বাকী রেখে লাভ নাই।'

ওদের সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অজয়। অথচ কিছু বলতেও পারছিলেন না! মামা-ভাগনীতে মিলে ওরা জল্পনা-কল্পনা করবে, তারপর সেটা কাজে পরিণত করবার বেলায় ডাক পড়বে তাঁর। এ দায়িত্ব আশ্চর্য লাগে তাঁর কাছে। তিনি জানেন, যে-কাজ ভালো লাগে সে-কাজের জন্যে কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু তার বাইরে সব বোঝা। কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না এই বোঝা, যদি কোনো কিছু বলো, তাহলে সমস্ত সমাজ তোমায় চেপে ধরবে। তোমার কাজ শুদ্ধ পণ্ড করবে। আশ্চর্য।

ধীরভাবে বলেন অজয়, 'কিন্তু আমি তো বলেছি, অন্য যেকোন ব্রাহ্মণ দিয়েই তো সে-কাজটা চলে...'

'আপনি ভুল বুঝছেন, বাবাজী...' হাসিতে মোলায়েম হয়ে পড়ে হরি 'যার যেরকম বিশ্বাস। মা সাবিত্রীর ইচ্ছে কিষ্ট ঠাকুরকে দিয়ে পূজাটা করাবে, আপনি আমি কা বলব তার। তাছাড়া উনি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ...'

এযুক্তি অজয় বোঝেন না। যজ্ঞ করলে যদি কোনো ফল থাকে তাহলে যে

কেউ করুক না কেন, তার ফল হবেই। তাছাড়া, ঐ একজনই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আছে, আর নেই ?

'আপনি কেনে ভাবছেন বাবাজী, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি শুধু একবার আমার মায়ের দিকে মুখ তুলে চান...বাছা কি কষ্ট পাচ্ছে, আহা! আপনার নিজের একটা মান-সম্মানের কথা আছে জানি। ত আমার কথাই ধরুন, ঐ বামুন আমায় অপমান করেছিল সেদিন মন্দিরে। কিন্তু কি করব, মায়ের জন্য আমার তাও ভুলতে হচ্ছে!'

দুর্বল জায়গা দেখে ঘা দেবে হরি। এতদিন ও তাই করে এসেছে। অজয়ের অনেক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তাঁর ওপর খানিকটে দখল নিয়েছে হরি। আর ওকে বাড়তে দেওয়া যায় না।

'এই সংসার অতি কঠিন ঠাঁই, বাবাজী। এখানে অনেক কিছু সহ্য-সামাই করে লিতে হয়। তবেই চলে।'

অজয়ের মনে হঠাৎ একটা কথা আসে। তাই চটে ওঠার বদলে তিনি রাজী হয়ে যান। 'বেশ তাই হবে। একবার তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।'

মনে মনে তিনি বলেন, 'ওই কৃষ্ণ ভটচাজকে দিয়েই শ্যামগঞ্জের ব্যাপারটা হাত করব।' আর এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পান যে হরির ওপরেও তিনি টেক্কা দিতে পারবেন। ব্যবহার করতেও পারবেন কৃষ্ণমোহনকে।

কৃষ্ণমোহন এ-অঞ্চলের লোক নন। বিয়াল্লিশের কংগ্রেসী-আন্দোলনের সময় এখানে এসেছিলেন। ভদ্রলোক শিক্ষিত, কিন্তু অদ্ভুত বিনয়ী, তৃণাদপি ক্ষুদ্র লোককেও নিজের থেকে সম্মানিত মনে করতে হবে, এই তাঁর ধারণা।

এই অঞ্চলে এসেই তিনি চাষীদের ক্ষেপিয়েছিলেন শীরসার জমিদারের বিরুদ্ধে। ব্যাগার দেবে না তারা। তা সে-নিয়ে অজয়ের কিছু করার ছিল না, ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর স্বার্থ-সংশ্লিষ্টও নয়। তবু সাবধান হতে হয়েছিল তাঁকে কারণ আগুন যে ঘরেই লাগুক সে আগুন তো আর জাতের বিচার করে না। কিন্তু সে কথা নয়, ঐ লোকটি একদিন এসেছিল তাঁর কাছে মন্দির-সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে। ক্ষীরপাই আর চন্দ্রকোণার মধ্যে বহু প্রাচীন আমলের অজস্র ভাঙা মন্দির পড়ে রয়েছে, সেগুলোকে সংস্কার করে, জনসাধারণের সুবিধে করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি।

'এ সব মন্দির-দেবালয় তো সব আপনাদের পূর্বপুরুষদেরই কীর্তি।' তাঁরা

আনন্দ কাকে বলে তা জানতেন, তাই সেই আনন্দকে সবার করে দিয়েছিলেন। আনন্দ কখনো তো একলার হতে পারে না, আপনি এই কাজে লাগুন। সমস্ত কাজটা করে উঠবার ক্ষমতা হয় তো একজনের নেই, কিন্তু দেখাদেখি অনেকেই কাজে নামতে পারেন। শীরসার বাবুরা আছেন, সরকার আছেন। আপনিই তার পথ দেখান...'

অজয় প্রথমটা কিছু বললেন না, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুদিন আগেও তো শীরসার জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়েছেন, তো তাদেরই দুয়োরে হাত পাততে লজ্জা হবে না?'

কোনো রকম অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিয়েছিলেন ভট্টাচার্য, 'বিরুদ্ধে কেন বলছেন। ব্যাগার দেওয়া যেমন অন্যায়, নেওয়াও তেমনি। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছিলুম, অন্যায়কারীকে বাঁচাবার জন্যে। সেটা মেনে নিলে ওঁরা ভালোই করতেন। এই দেখুন, আপনার কাছে এলাম মন্দিরের ব্যাপার নিয়ে, তা সমস্ত লোক যদি এর থেকে আনন্দ পায়, তার চেয়ে আনন্দ কি আপনার হতে পারে?'

'তা লোকে যদি আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে আনন্দ পায়, আমাকেও তাই পেতে হবে?'

'নিশ্চয়ই। সে আনন্দ একদিন পরিশুদ্ধ হবেই হবে, শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হয়।'

'থাক। কোনো রকম অপেক্ষা করার প্রয়োজন আমার নেই। ওই পরিশুদ্ধ আনন্দেরও নয়।'

ভট্টাচার্যের মুখে যে হাসিটা ছিল আল্‌তো ভাবে লেগে, সে হাসিটা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়, সারা মুখে ঢেকে ফেলে। ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না।' একটু থেমে ছোট্ট একটু চিন্তা করেন, তারপর বলেন, 'কিন্তু বুঝতে আপনাকে হবেই। নইলে কাজ হবে না। তাই যতক্ষণ না বোঝেন ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তাড়িয়ে না দিলে যাব না।'

এ কি রকম ধরনের ব্যাপার? এতখানি অবজ্ঞার সামনে এ হাসি আসে কোথা থেকে? যেন সে হাসি আঘাত করতে চায়, অবজ্ঞা করতে চায়! তাছাড়া, কেমন ধরনের লোক ঐ ভট্টাচার্য, এতটুকু পৌরুষ নেই ওর।

'হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলাম। যদি এমনি না যান, তো লোক দিয়ে খেদাব।'

'বেশ, আমি এখন গেলাম। কিন্তু আপনার ভুল একদিন বুঝতেই হবে, ততদিন অপেক্ষা করে থাকব।'

হেসেছিলেন অজয়। অট্টহাস্য ছুঁড়ে মেরেছিলেন লোকটার ওপর, তার এই কথা চাপা দিয়েছিলেন।

সেই কৃষ্ণমোহনকে আজ নতুন করে চিনতে হচ্ছে। তার সঙ্গে আজ নতুন করে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তার প্রয়োজন এসেছে এটাই হবে সব চেয়ে বড় কথা, তার বেশি নেই।

সমস্ত যাগযজ্ঞের আয়োজনের পেছনে অজয়ের দৃষ্টি রইল সজাগ। সুযোগ বুঝে বললেন, 'দেখুন, শ্যামগঞ্জের ওই ধান-তোলার ব্যাপারটার একটা সুরাহা আপনাকে করতেই হবে। ওরা আপনার অনুগত লোক...'

'আমি ঘটনার কথা চিন্তা করেছি। কৃষকেরা বল-প্রয়োগ করেছে, এটা তাদের অন্যায়। একশো বার। কিন্তু তাদের যা দাবি সেটা তো ন্যায্য...'

'ঠিক তাই। আমিও তাই বলি। মনু দিগার ভাগচাষের অধিকারই তো চেয়েছিল, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না...'

কৃষ্ণমোহন কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গেলেন থেমে। সংশয়িত স্বরে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি চান যে চাষীদের আমি ক্ষেপাই?'

'ঠিক ধরেছেন ..' অজয় তৎক্ষণাৎ বলেন। 'আপনি হয় তো ভাবছেন, মাছের উপর বকের দরদ কেন। কারণ আছে। শীরসের বাবুরা এমন করে চাষীদের ওপর জুলুম করছেন যে সমস্ত জমিদার জাতটার ওপরই লোকের অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এতে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই ক্ষতি, যারা ন্যায় পথে জমিদারী চালাতে চায়। আপনি জানেন আমি কারও উপর অন্যায় জুলুম করি না...আমি হলে মনু দিগারের অধিকার এখনই স্বীকার করে নিতাম...'

কৃষ্ণমোহন বলেন, 'আপনার কথা খুবই ভালো। জমিদাররা যদি মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন, তাহলে অনেক কল্যাণ হয় দেশের। চাষীদের কথা বলছেন? আপনি বলছেন ভালোই, তবু একটা বল পাওয়া গেল। কিন্তু আপনারা কেউ পক্ষেই আসুন আর বিপক্ষেই যান, চাষীদের আমি অন্যায় সহ্য করতে বলতে পারব না...'

একটুখানি থামলেন কৃষ্ণমোহন, তারপর হেসে বললেন, 'অবশ্য তারাও অন্যায় করলে তাদের বিরুদ্ধেও আমাকে যেতে হবে, ভগবান যদি আমাকে সে শক্তি দেন। আসলে কী জানেন, মানুষের শত্রু হচ্ছে মানুষ নয়,

লোভ...সে লোভ আপনাদের ছাড়তে হবে, ওদেরও—। তবেই মানুষের কল্যাণ হবে...' বলে উঠে গিয়েছিলেন তিনি।

অজয় হাসলেন একটু। ভাবলেন, একসঙ্গে অনেকগুলো দিক সামলেছেন তিনি!

এদিকে শীরসার জমিদারবাবুকে তিনি লিখলেন, যথাবিহিত শিরোনামা, সম্বোধন ইত্যাদির পর '...জানেন তো, জমিটার স্বত্ব নিয়ে অনেক গোলমাল আছে। গোলমালটা কেবল আপনার আমার মধ্যে নয়, আরও শরিক আছে, বাইরের ফ্যাকড়া আছে নানা রকম। এসব আপনার অজানা নয়। শেষ পর্যন্ত ওটা আমাদের দুজনেরই হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া চাষীদের মতি-গতি ভালো নয়, প্রমাণটা হাতে হাতে পাওয়া গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে উপযুক্ত দাম দিচ্ছি, আপনি আমার স্বত্ব স্বীকার করে নিন। আপনি এটুকু স্বীকার করে নিলেই বাকীটা আমি সামলাব।'

ঠিক দুদিন বাদে জবাব এল :

'...তুমি অল্প-বয়স্ক, বিশেষ বোঝ না। আইনের জট কেমন করে ছাড়াতে হয় সে আমি বিলক্ষণ জানি। মনে রেখো, যে জন্যে তুমি জমিটার দখল চাচ্ছ, সেটা আমারও লক্ষ্য হতে পারে। জমির কদর আজকাল অতি বেশি রকম, ভায়া।'

অজয় থ' বনে যান। ডান-হাতটা ক্রমশ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

এগারো

আমধেড়ে গ্রামে মালতীদের পাশেই সুবল মাস্টারের বাড়ি। সুবল মাস্টারের স্ত্রী মিনতির সঙ্গে মালতীর সম্বন্ধ আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ওরা দুজনে সখী। পাড়া-প্রতিবেশী হিসেবে আগে যাতায়াত ছিল, কথাবার্তা চলত, মিনতির কাজকর্মে সাহায্য করত মালতী। কিন্তু এখন সে রোজ রাত্রে মিনতির কাছেই থাকে। মিনতি এতে খুব খুশি হয়েছে কিন্তু মালতীর দিক থেকে এর প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। হরি চৌধুরী আর তার দলের লোকেরা যখন থেকে তার কুঁড়ের চারদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল, তখন আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করে নিয়েছিল মালতী।

কিন্তু সে ব্যবস্থাও একদিন বানচাল হবার উপক্রম হল। এক রাত্রিতে সুবল তখন খেয়েদেয়ে শুতে গেছে, রান্নাঘরে মালতী মিনতিকে বললে, 'বউ, তোমাদের ঘরে আমার যে বাস উঠল...'

'কেন, কী হয়েছে, আমাদের কিছু দোষ হয়েছে না কি...'

'আমার কপালের দোষ, বউ ·' একটু ইতস্তত করে বললে, 'তোমাদের কানে কথাটা এসেনি? লোকে বলছে আমি সুবলদার সঙ্গে আছি...'

ফিক করে হেসে ফেলল মিনতি, কিন্তু পরক্ষণেই ওর রোগা মুখের ওপর চোখ দুটো দপ করে উঠল।

'কে বলছে কে, তার জিবটা বটিতে করে কেটে দেব না!'

বিচিত্রভাবে হাসল মালতী, 'ওইটি পারবেনি, বউ, কার মুখ বন্ধ করতে যাবে...'

'আমার মাথার দিব্যি, ঠাকুরঝি, তুমি ওসব কথায় কান দিও না। দেখি কার কত বুকের পাটা ·'

না, মালতী কান দেয় না। কিন্তু ওদের দুর্নামের ভয়েই একথা বলছিল ও। মিনতির দৃঢ়তায় ও আশ্বস্ত হয়।

এই মিনতি মেয়েটিও অদ্ভুত, লোকে বলে একটু বাতিক আছে। এখনও সে

নিঃসন্তানা, ওর নাকি কী অসুখ আছে, ছেলে-পিলে হবে না। গুনগুন করে গান গাওয়ার অভ্যেস, যখন-তখন গান গেয়েই চলেছে। রাস্তার ধারেই ঘর বলে পাড়ার ছোট-বড়, উলঙ্গ-রুক্ষ ছেলেমেয়েরা কিলবিল করে ছুটে আসবে, তার গান শোনার জন্যে। বড়দেরও কখনও কখনও হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে, রাস্তার ওপর। মিনতির গা জ্বলে যায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। একদিন এক কাঠি-পানা বারো-তেরো বছরের মেয়ে এসে বলেই ছুটে পালিয়ে গেছল : 'দেশে-গাঁয়ে ই সব বিবিপনা চলবেনি ··'। তৎক্ষণাৎ মারতে ছুটেছিল মিনতি ওকে, কিন্তু সে মেয়ে তখন নাগালের বাইরে। রাগ শান্ত হতে ও বুঝতে পেরেছিল, এ নিশ্চয়ই বড়দের শেখানো। কিন্তু ও ভেবে পায় না, গান গাওয়া বিবিপনা হয় কি করে। বড়রা শুধু তার পেছনেই নয়, তার স্বামী সুবলকেও উত্যক্ত করে তোলে। একদিন সুবলের পাঠশালায় একটা ধেড়ে ছেলেকে দিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছিল, 'বলিস তো তোর ম্যাস্টরকে, এক কড়ায় সতেরটা আম পাওয়া গেলে একটা আমের দাম কত ?'

শুনে মিনতি থ' বনে গিয়েছিল : ওরা এত নীচ কেন ? কেন ওরা গায়ে এসে পড়বে, তারা তো কারও সাতে-পাঁচে থাকে না !

হাওড়ার এক ধনী আত্মীয়ের গৃহে বিধবা মার কাছে লালিত হয়েছিল মিনতি। বিয়ে হবার পর স্বামীকে এখানে ওখানে ঘুরিয়েছে সে, নিজেও ঘুরেছে। কোনো জায়গায় সে শান্তি পায়নি। দরিদ্রের পেশা এবং জীবনের মধ্যে অপরিহার্য গ্লানি তাকে পীড়া দিয়েছে, তার হাত ছাড়াতে পারেনি। সুবল শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'তোমার এই বাতিক ছাড় দিকি...,' নিজের গ্রামে পাঠশালা খুলে বলেছে, 'এই আমার শেষ গতি, এখান থেকে আর নড়ছিনি...'। স্বামীকে বুঝতে পারে মিনতি, কিন্তু তার মানসিক ক্লান্তি কিছুতেই দূর হয় না। প্রায়ই বলে, 'আমি পারিনে আর এ নোংরামি সহ্য করতে।'

এদিকে মালতীর জীবনে জোয়ার আসে। এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে। যখন সেটা এল তখন একদিকে যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল সে, নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল এই অসম্ভব কল্পনার জন্যে, তেমনি একটা অবুঝ আনন্দে ওর দেহপ্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

মতিপিসির মৃত্যুতে একদিকে যেমন বেদনা পেয়েছিল মালতী, তেমনি সেই মৃত্যুকে উপলক্ষ করে গোবিন্দকে নতুন চোখে দেখতে পেলে। গোবিন্দ বার বার করে তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে অসুখের সময় মার কাছে আগাগোড়া থাকবার জন্য। তার সেই আবেগ ভরা কণ্ঠস্বর যেন তার কানে এখনো বাজছে,

'আমার জন্যে অনেকেই অনেক কিছু করেছে, কিন্তু তুমি যা করলে তার তুলনা হয় না। এটা তুমি না করলে আমাকে মহা অপরাধের ভাগী হতে হত…'। গোবিন্দর জন্যেই সে রাত্রিতে লোকজন ডাকা হয়নি, পাছে ওর আসার খবর ছড়িয়ে পড়ে। সারা রাত মালতী আর গোবিন্দ একই সঙ্গে রোগীর শুশ্রূষা করেছে। কেমন করে শোয়াতে হবে, কখন ওষুধ দিতে হবে, আর কি করা দরকার—মালতীর মনে হচ্ছিল একই কাজের মধ্যে গোবিন্দকে আর ওকে ঠেলে দিয়েছিল যেন কেউ। এক সময়ে মতিপিসি যখন গোবিন্দর কাছে বিয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিচ্ছিল, তখন সমস্ত উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও কোথায় লজ্জা বোধ করছিল ও, তার কারণটা এখন বুঝতে পারে।

গোবিন্দ চলে যাবার পর ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে ও, কিন্তু প্রচণ্ড জোরে না না করে উঠেছে। তাও কি আবার হয় না কি? ওরা কত বড়, কত রকম ওদের কাজ! মাকেই যে দেখতে পারল না, সে আবার এই সব…বাকিটা সে আর ভাবে না, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু এড়াতে পারে না নিজের অবুঝ আবেগটা। 'আচ্ছা ওরা এমন কি কাজ করে, এই লুকি' থেকে থেকে? যার জন্যে ওদের বুকে দয়া-মায়া নাই…' অন্য দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখতে চায় মালতী। গ্রামের এই সব পুলিস-তল্লাসী, মনু দিগারের খামারে ধান তোলা, লখীন্দর এবং অন্যান্য কৃষকদের আহত হওয়া। এগুলোকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে ও। 'আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি উসব কাজ করতে পারেনি?' ওর একটা অদ্ভুত ইচ্ছে হয়, গোবিন্দরা কী কাজ করে তার ধরন-ধারণটা একবার দেখে।

সতীশ মণ্ডল ওদেরই গ্রামের ছেলে, প্রায় একই বয়সী, তার সঙ্গে দেখা হয় কখনো-সখনো, অতি অল্পক্ষণের জন্যে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা কথা তার কাছ থেকে জেনে নিতে চায় সে। সোজাসুজি নয়, এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে, স্ত্রী-সুলভ ধারালো পরিহাসে জ্বালিয়ে। ঠাট্টা করে সতীশকে ও বলে, 'গোবিন্দর চেলা,' কখনো বলে, 'ছোট পালানীবাবু'! সতীশ বলে, 'কি ব্যাপার, আমাদিকে ধরিয়ে দিবার মতলব না কি? কিন্তু জানিস ত গোবিন্দদার নামে কি দুর্নাম আছে, গুপ্তচর হলেই ' তারপর দুহাতে গলা টেপার ভঙ্গি করে দেখায়।

চমকে ওঠে মালতী—গায়ত্রীর সঙ্গে তাকে এক করে বলছে যে সতীশ! কাঁপা কাঁপা গলায় কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, তোমাদের বড় পালানীবাবুকে বল ত আমাকে মারতে পারে কি না। আমি বেঁচে যাই থালে…'

মিনতির স্ত্রীলোকের দৃষ্টিতে এসব এড়ায় না, কিন্তু কিছুই ঠিক করে বুঝতেও পারে না সে। দেখে, মালতী আজকাল কখনও অন্যমনস্ক, কিন্তু প্রায়ই পরিহাস-প্রবণ। কি একটা খুশিতে রয়েছে যেন ও। সতীশের সঙ্গে মালতীর দেখা হয় শুনে বলে (সতীশ মিনতিরও পরিচিত), 'ঠাকুরঝি, ওর সঙ্গে আমার একদিন দেখা করিয়ে দাও না। নিয়ে এস না একদিন...'।

মালতী বললে, 'আচ্ছা. নিয়ে এসব একদিন !'

আর সত্যিই একদিন সতীশকে নিয়ে হাজির করল মালতী। সেদিন ওদের মীটিং, মনু দিগারের জমির সেই ধানতোলা আর মারামারির ব্যাপার নিয়ে। প্রথম সুবলের সঙ্গেই দেখা হল সতীশের, তারপর ভেতরে গেল ওরা।

সেদিন বিকেল থেকে মিনতি কেমন মনমরা হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল। কী রকম অদ্ভুত ক্লান্তিবোধ করছিল ও। আবার যে রান্নাঘরে যেতে হবে, সেটাই ওকে পীড়িত করে তুলছিল। সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। এমন সময়, 'এই মিনি, মিনি-বউ...' বলতে বলতে মালতী হঠাৎ ঢুকে আটকাল ওকে। কেমন উচ্ছল, সকৌতুক হাসিটা ওর সামনে মেলে ধরল।

মিনতি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মালতী আবার বললে, 'বল দিকি, কাকে এনেছি...' বলে ওর হাত ধরলে।

'আমার মুণ্ডুকে...' সত্যিই ভালো লাগছিল না মিনতির। কিন্তু ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার আগেই সুবল আর সতীশ ঘরে ঢুকল। মনে হয় দুজনে ওরা ভীষণ একটা কিছু নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল, সুবলের মুখটা তখনো কাঁচু-মাচু হয়ে আছে, আর সতীশ হাসছে আস্তে আস্তে।

'বৌদি, দেখা করতে এলম যে।'

প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মিনতি। অনেকক্ষণ। কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে ও। তারপর বললে, 'এস ভাই...'

'থাক, হয়েছে !' মালতী ক্ষেপে ওঠে, 'ননদদের খাতির ত নাই, যত আদর সব ঠাকুরপোদের জন্যে !'

ত্যালাই পেতে ওদের বসাল মিনতি। বললে, 'এতদিন দেখিনি তোমাকে। কোথায় ছিলে, বল।'

'তার কী আর মা-বাপ আছে? কারও আঁদালে-কাঁদালে, কারও ট্যাকশালে...আর জঙ্গলেই তো কাটাই বেশি দিন। দেখছ বৌদি, রেঁধে-

বেড়ে বাটনা বেটে কুটনো কুটে এই হয়েছে হাতের অবস্থা। তোমাদের জাত মেরে দিলম, হুঁ।'

মিনতি হাসল একটু। সতীশ সেই রকমই আছে।

'তুমি সেই আগের মতই আছ।'

এই সময় বাইরে গেল সুবল, ঘরে নেই একমুঠো মুড়িও। পাড়ায় কিনতে গেল মুড়ি, যদি মুড়কিও পাওয়া যায় কিছু।

মিনতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, পারবে তোমরা ওই সব করতে, মারামারি, বিপ্লব এই সব। কিন্তু তোমাদের ভরসা তো এই চাষা-ভুষোর দল। ওদের আছে কিছু? আমি তো ভাই কিছুই বুঝতে পারিনি।'

সতীশ একটু হাসল।

'ছাই, ছাই, ছাই পারবে ওরা!' মালতী ধারালো তাচ্ছিল্যে ভেঙে পড়ে, 'ছোটলোক-চাষাভুষোর কথা ছাড়ান দিলম, ত ওদের নিজেদের কথাই ধরনা কেনে। ওই পটকা ছোঁড়াগুলা পুলিস মারবে? থালেই হইচে! আর মজা দেখ, পুলিসগুলো সত্যিই ওদের ভয় করে। আমার কি মনে হয় জান্নু, ভাই বউ, ওরা সতীশদাকে দেখেনি, দেখলে আর ভয়টি করতনি...' এই রকম পরিহাস করে কোথায় মালতী আনন্দ পাচ্ছিল।

'মালতী, তুই চুপ কর একটু। আমাদিকে কি ভয় করে? করে আমাদের কথাকে। আমরা সত্যি কথা বলি বলে আমাদের এই সাহস, আর ওদের ভয়ের শেষ নাই। দেখনি সুবলদার পাঠশালে, কোনো ছেলে মিথ্যা কথা বললে, চোখগুলা কেমন পিটপিট করে?'

মিনতি বললে, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমাদের কথা কি এরা বুঝবে? ভালো বললে যে এরা খারাপ শোনে!'

মালতী বলে, 'বুঝবেনি কেনে, কানের কাছে যদি সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে, থালে মানুষের মাথার ঠিক থাকে? এই সতীশের কথা ধর। এতক্ষণ উ কি করছিল জিগাস কর দিকি। সুবলদার কানে যেমন ভূত নামাবার মন্তর পড়ছিল। বলে, আজকাল যে নেকাপড়া হচ্ছে, সেটা কিছু লয়। বলে, নেকা-পড়া ভালো করার জন্যে মাস্টারদিকে ধম্মঘট করতে হবে। ঝাড়া এক যুগ ওরা সব কাঁাচর-ম্যাচর কি করল। তারপর সুবলদার এখন দুকুল যায়। দুদিন পরে দেখবে সুবলদা ইস্কুল তুলে দিয়ে বসে আছে।'

সতীশ বলে, 'কথাটা ঠিক তো। আমি একটা কথা একশ বার বলতে পারি। কথাটা যে ঠিক, যতক্ষণ না কেউ বুঝে ততক্ষণ তাকে বলতে হবে।'

মিনতিকে অত্যন্ত আত্মগত দেখায়। মালতীর এই রকম মুখর উচ্ছ্বাস ওর ভালো লাগে না, ও যেন ওদের কত নিজের! ও গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমিও সেকথা বলি। মানুষ খারাপ, কিন্তু তাই বলে ওরা যে ভালো হবে না, তার মানে নাই। কতবার আমি পাড়ার ছেলেদের বলেছি, এটা করো না, ওটা বলতে নাই, কিন্তু কিছুতেই শোনে না। যে লোকগুলো আমাদিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, এক-একবার মনে হয়, গিয়ে ওদেরকে আমি নিজেই বলি, এসব করতে নেই, কিন্তু আমি পারিনে। কেমন করে বলতে হয় জানিনে।'

মিনতি চুপ করে যায়। সতীশ পিদিমের আলোতে দেখে, ওর কালো উজ্জ্বল চোখ দুটো কেমন ভিজে-ভিজে দেখায়। বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় গলার কাছে।

মালতী কিন্তু ওদের অমন চুপচাপ থাকতে দেয় না।

'কেনে, কেনে, যে রকম করে সুবলদাকে বলেছ, সেই রকম করে বল না ..'

সতীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মালতী আবার বললে, 'উ কথা বুঝি তুমি জাননি? শুন তবে। সুবলদা আগে তো হাতকাটা তেলের ব্যবসা করত রেলগাড়িতে, ত বউ বললে, না, উ করতে পারবেনি, ওতে মিথ্যা কথা বলা হয়। হাত কাটবেনি, আর মিথ্যা করে দেখাবে...ত উ চলবেনি। তবে করবে কি রে, বাবু। অনেক যুক্তি-যাক্তা হল, এ কাজের কথা হল, উ কাজের কথা হল, তবে যাবে কোথা রে বাবু। সব জায়গায় ঐ মিথ্যা। তা কি করি বল, না মাস্টারি কর। সেখেনে মিথ্যে কথা বলতে হবেনি। গেল শ্যামপুর মাস্টারি করতে, ত জানিনে ভাই, একদিন দেখি চলে এল সুবলদা কাঁথা-কম্বল লিয়ে। কা ব্যাপার, না, সেখানে মাইনে পেইছে পঞ্চাশ, কিন্তু লিখতে হবে পঁইষট্টি, ত ও নিজেই পালিয়ে এল। জান ভাই, যেমনি হাঁড়ি তেমনি সরা। ত কাঁটায় কাঁটায় চলছে সব।'

'আঃ, থাম, ঠাকুরঝি। ও কথা এখন রাখ।' মিনতি লজ্জা পায়, কিন্তু এবার ও খুশিও হয়ে ওঠে।

এক সময় মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'লাও, বাবু, সতীশদাকে কি খেতে দিবে দাও। ভাত ত হয়নি, মুড়িই দাও চারটি। জান ভাই বউ, আজ ওদের মীটিন হবে, সেই শ্যামগঞ্জের মনু দিগারের ধান লিয়ে যেটা হল, সেইটার মীটিন। কী তালুক-মুলুক হবে সারারাত, দাও চারটি...'

সতীশ বললে, 'যাবি তুই, চল না...'

মিনতি বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও না ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোদের ব্যাপারটা দেখে আসবে একটু।'

হঠাৎ বুকের ভেতরটায় লাফিয়ে ওঠে মালতীর। আঃ, সত্যিই যদি সেটা সম্ভব হত! বুকের ভেতর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ও, কিন্তু আগেকার মতো তীক্ষ্ণ ভঙ্গিটা বজায় রেখে বলে, 'থালেই হয়েছে। এখন রাস্তা দিয়ে গেলে লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন কুকুর লেলিয়ে দিবে।' কিন্তু বলেই জিব কাটে ও, ছি-ছি।

বড় অসতর্কভাবে কথাটা বেরিয়ে গেছে। ভাই সম্পর্কের সতীশের সামনে কথাটার উল্লেখ ভালো হয়নি। বড় অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মালতী। বলে, 'নাও বাবু, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও'

সতীশ চলে যাবার সময় মিনতি বললে, 'তোমার ভয় করে না ঠাকুর পো।'

'ভয় আর কাকে, বৌদি, এই যে তোমাদের ঘর এলম, তুমি ত আর ধরিয়ে দিবেনি আমাকে? এখেনে আমাদের শত্রু নাই, অতি অল্পই আছে, তবে সেগুলোকে সামলাতে পারব!'

হঠাৎ মালতীর কী হল জানিনে, ও একটু এগিয়ে এসে সতীশকে বললে, একটু সাবধানে থাকবে সতীশদা, কতদিন আবার খপর পাবনি...'

না, ও কাঁদবে না। কাঁদতে জানে না ও। কিন্তু ওর সেই কৌতুকের আবরণটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল যেন। বোধহয় সেই বেফাস কথাটা বলে ফেলার জন্যই। মুহূর্তে ওর মুখে সেই মেয়েটির ছাপ ফুটে ওঠে, যে নিঃসঙ্গ, বেদনার্ত, সহায়হীনা, যে বুকের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

বারো

মাথায় আঘাত পেয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল লখীন্দর। ভীষণ যন্ত্রণা প্রায় কাবু করে ফেলেছিল তাকে।

কিন্তু ওর মানসিক অশান্তিই ওকে বেশি ব্যস্ত করে তুলেছিল। দেহের যন্ত্রণা বা নিজের অসুবিধা সম্বন্ধে ও কোনো চিন্তাই করত না, কিন্তু সুধীরের কথা ভেবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল লখীন্দর।

সেই ধান-তোলার দিন লখীন্দর চোট খেয়েছে শুনে ছুটে গিয়েছিল সুধীর, বলেছিল, 'বাবার মত লোকের গায়ে হাত দিছে, কুন শালার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে!' অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়েছিল সুধীর। ওর পেশিগুলো শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সামনে পেলে তখনই ছিঁড়ে ফেলত সেই লোকটাকে। কিন্তু তারপর যখন ও শুনেছে, ওর বাবা নিজেই এগিয়ে গিয়েছিল, সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটা তার বাবাই পরিচালনা করেছে, তখন পালিয়ে এসেছে সুধীর। তারপর থেকে বাবার সঙ্গে কথা বন্ধ।

'তোর বাপের এমন অবস্থা, ত কথা কসনি অর সঙ্গে দুটা?' গ্রামের কোন বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, 'তুমি মানী লোক, তুমি যদি তোমার মান খুয়াও, ত আমি কী করব? বাবার বুড়া বয়সে মতিভ্‌ভ্‌ম হইছে খুড়া, তুমি দেখবে! আবার শুন্‌ছি, দেশের কাজ করবে, গোবিন্দ মিস্তিরের দলে যাবে, মিটিন হবে...'

এ নিয়ে লখীন্দর কথা বলছে ছেলের সঙ্গে।

'ওরে, তুই অমন করে ভাবছু কেনে। ধান তুলা লিয়ে ব্যাপারটা হইচে ত? ধান ত আমরা ছেড়ে দুবনি। তবে ই ব্যাপারটা অত সহজ লয়। সে লিয়ে মামলা-মকদ্দমা আছে, পাঁচজনের মত-অমত আছে। আমরা ত সব বুঝব-নি। যারা ই কাজ করে, ত তাদের কাছে সব জানতে হবে বৈকি। জেনে শুনে যদি ভালো লাগে তোমার, ত তুমি সেটা মেনে নিলে, না যদি লাগে ত তুমি চলে এসবে!'

জবাব দিয়েছিল সুধীর, 'তোমার সে-লিয়ে অত মাথা ব্যথা কেনে। অন্ত লোকের জমি, যার দরদ সে তার বুঝবে। তোমাকে বলি শুন, এই যে তুমি মিত্তিরের দলে গেছ, ত তোমার ঘরে সব্বনাশ ঢুকল...'। কেঁপে উঠল লখীন্দর কথাটায়। সুধীর আবার বললে, 'যে লোক গেছে, সেই মরেছে। ত ঐ গোবিন্দর কথা দেখ, ওর মাগ নাই, ছেলা নাই, ত ঐ ভবঘুরের সঙ্গে তুমি যাবে! খাল কেটে কুমীর আননি বলছি...'

এর উত্তরে কত কথা বলার ছিল লখীন্দরের কিন্তু একটা কথাও সে বলতে পারেনি। 'ওরে, তোরা ত বলছু পরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে নাই। কিন্তু তোর নিজের কাজ যখন পড়বে, তখন কী হবে। আর তাছাড়া ইটা যে আমাদের মত বুড়াদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কবে কুন কাজটাকে না বলেছি আমরা, পরের উবগারের ডাক পড়লে ছুটে যেতে হইছে। অভ্যাস বড় বালাই। তাছাড়া, এখনকার ছেলে-ছোকরারা কী সেটি জানেনি, না করেনি? এই তোর কথাই ধর। দলাদলি কী করিসনি? দুগাঁয়ে শিব-শীতলা পূজার রেষারেষি নাই? তোরা দল বেঁধে মাথাফাটাফাটি করিস ত? হ্যাঁ, সব কাজই তাই, একা হয় না, একা করতে পারে না কেউ। শুধু...'

সুধীরকে বলতে ইচ্ছে করে লখীন্দরের, 'রেষারেষি ত ছোট কাজ. উ কাজ করতে নাই। ভাল কাজ এক সঙ্গে করতে হয়। ভগমান থালে কিপা করে!' কিন্তু ও কিছুই বলতে পারে না।

ঠিক এই কথাই অখিলকে বলছিল লখীন্দর।

'সৎপথে থাকতে হয়, অখিল। পাঁচজনের কাজ করতে হয়, থালেই আনন্দ পাওয়া যায়।'

'আমিও ত তাই বলি, লখীন্দদাদা। জীবনে আনন্দ আর পেলমনি, সুখের মুখ দেখলমনি, এই বুড়া হয়ে গেলম, ত এখন সুখ একটু চাই বইকি ··' অখিল এসেছিল একটা প্রস্তাব নিয়ে। অখিলকে পাঠিয়েছে শীরষের জমিদারের দলের লোক। তারা যেন ব্যাপারটা থেকে সরে আসে। তাছাড়া, এ সম্বন্ধে আরও খবর দিলে, ওদের নানা-রকম সুবিধে হবে, টাকাকড়িও পাবে সঙ্গে সঙ্গে।

লখীন্দর বললে, 'উ কাজে সুখ নাই, ভাই। ছোট কাজ যদি করলে ত তোমার সব সুখ লষ্ট হয়ে গেল। পরের উবগার যদি না করতে পার ত অলেষ্ট (অনিষ্ট) করবেনি...'

একটু থেমে খানিকটে সংকুচিতভাবে বললে লখীন্দর, 'আমার অনেক বয়স

হল, আমার কথাটা লাও। এই আমি বুঝি তোমাদের মা-বাপের পায়ের ধুলার জোরে। আমাদের যে এই জীবজন্ম, তা ইটা হচ্ছে ভগমানের লীলা-খেলা। তুমি সুখ বলছ, টাকাকড়ি বলছ ত কী হবে উসব। সবই ত ফেলে চলে যেতে হবে একদিন। ত তুমি বলবে, থালে খাটাখাটুনি কেনে, মানুষ থালে টাকাকড়ি উপায় করে কেনে। ত বেঁচে থাকতে হয়। তুমি বলবে, থালে বাঁচব কেনে। আমি বলি, ঐ যে বললম, ইটা ভগমানের খেলা। এখেনে ছোট কাজ যদি করলে ত, তোমার সব গেল। ভগমান মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে, ত তুমি যদি ঠিক থাকতে পারলে ত তবেই আনন্দ পাবে। না হলে আনন্দ নাই। ছোট কাজ খুব খারাপ, অখিল…'

অখিল অতশত বোঝে না। হয়তো কিছু কিছু ধরতে পারে, স্বীকার করেও। কিন্তু তবুও জোর পায় না। তাছাড়া, ওর সহপাঠী শ্যামচন্দ্রের সচ্ছলতা ওকে পীড়া দেয়। যে শ্যামচন্দ্র ওর চেয়ে বোকা ছিল, সে আজ ঘাটালের মোক্তার হয়ে কত রোজগার করছে, আর ওর এই অবস্থা। লখীন্দর ওকে বোঝায়, 'নিজেকে হীন ভাবতে নাই, অখিল। কেউ সুখী লয়। ই কথা ত সেদিন তোমাকে জমি চষতে চষতে বলছিলম, তুমিও তাই বলছিলে। তার বাবার টাকাকড়ি ছিল, তাই সে অমন হইছে, তোমার ঐ সুবিধা থাকলে তুমিও পারতে।'

অখিল চলে যাবার সময় বলে লখীন্দর, 'খুব সাবধানে থাকবে ভাই। লোভ খারাপ জিনিস, মানুষকে পশু করে দেয়। পরের যদি উবগার না করতে পার…তাহলে অলেষ্ট করবেনি।'

এসব কথা বিশ্বাস করে লখীন্দর। প্রাণপণে ও পালন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার অন্তরে একটা দ্বন্দ্ব এসে গেছে। সুধীর তাকে ভয় দেখিয়েছে। পাড়ার দু-একজন লোকও এসে বলেছে, 'ই সব মাহাঝামেলার ব্যাপার লখীন্দ-দাদা, কিন্তু কি না, তুমি পরাচীন লোক, তুমি ভাল বুঝবে...'

ওর ভয় হচ্ছে, হয়তো, তার নিজের পরিবারের ওপর কোন বিপদ ও ডেকে আনছে। কিন্তু বিপদই বা কার নেই ? কখন কী হয় বলা যেতে পারে ? এই যে তেরশো ঊনপঞ্চাশ সালে অত বড় ঝড়টা হল, ত মাঠে ধান ছিল ? চারাগাছ সব উপড়ে গিয়েছিল না ? আর সেই চারা-ধানের গাদার মধ্যে চাষাদের মৃতদেহ ছিল না ? সেদিন যে সুরেন্দ পাত্তর তার বউকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তা একটা সাপকাটিতে দুজনেই তো মরল ? তাহলে কাকে কী বলবে তুমি।

নিজের কথা ভাবে না সে। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে নিজের কাজকেও নিন্দনীয় মনে করতে পারে না লখীন্দর। কিন্তু অধীর আর টুকির কথা ভেবে ও কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ও নিজের অজ্ঞান্তেই শিউরে ওঠে। ওদের কী হবে? আর মহাভারতের সেই উপাখ্যানটা ওর মনে আসে। দাতা কর্ণের পুত্র বৃষকেতু ছুটে এসেছে, হাতে তখনো তার খেলনা। বাবা-মা কাঁদছেন। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ বললেন, শিশু, তোমার মাংসেই আমার পরিতৃপ্তি। বৃষকেতু হাততালি দিয়ে মায়ের কোলে গিয়ে পড়ল, 'বেশ হবে। মা-বাবা আমাকে কাতো।'

লখীন্দর কাঁদে। আহা, আহা, কী সুন্দর!

ভগমান, ঘর ভরে দাও, অমন ছেলে দাও। ভগমান, সব ঘর ভরে দাও। পিতাকে সংকট থেকে রক্ষা করুক তারা।

আস্তে আস্তে অধীর আর টুকির মাথায় হাত বুলোয় লখীন্দর। ওদের ওপর ভীষণ খুশি হয়ে উঠেছে সে। সেদিন মাঠে গোরু-লাঙল-জোয়াল-গুলো সব ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সে। ভাবনা ছিল, হয়তো সবগুলো ওরা সামলাতে পারবে না। কিন্তু ওরা যে সবগুলি ঠিক মতো করেছে, তাতে ওর আনন্দের সীমা নেই। তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু ওর মনে হয় যে ওদের ওপর সে ভরসা করতে পারে।

এখন প্রায় তার কাজকর্ম নেই। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে থাকে, ছেলেদের গল্প বলে। মাঝে মাঝে অধীরের বইটা নিয়েও ভুরু কুঁচকে পড়তে থাকে।

বিয়েবাড়ি হৈ চৈ, হাতে দৈ পাতে দৈ, তবু বলে কৈ কৈ।

তার চোখের সামনে দইয়ের ছড়াছড়ি নয়, হাতে-পাতে-দই ঐ ছেলেগুলোর আনন্দের ছবি ভাসে। আনন্দে সে কেমন হয়ে যায়।

'বাবা অধীর, তোমার বিয়াবাড়িতে ঐ রকম দইয়ের ছড়াছড়ি হবে, দেখবে।'

'হ্যাঁ?' ঘাড় বাঁকিয়ে অধীর বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আর টুকি মায়ের বিয়াতে কিছু হবেনি, কিচ্ছু না। ও আবার আমাদিকে ছেড়ে চলে যাবে। ওর নোতন বাপ হবে, মা হবে...' লখীন্দর হয়তো ব্যথা বোধ করে।

টুকি একটু বড় হয়েছিল বলে ও লজ্জা পায়। বলে, 'দূর!' কিন্তু ওর আবার একটু অভিমানও হয়।

লখীন্দর ওকে কোলের কাছে টেনে আনে। তারপর আদর করে বলে, 'না গো মা, তোমারও হবে। তোমার বিয়াতে রসনচৌকি বাজবে, হুঁ্যা…'

লজ্জায় আনন্দে হেসে ফেলে টুকি। বাবার হাত ধরে বলে, 'বাবা, আমার বিয়াতে পাল্কী হবেনি, শ্যামার যেমনি হইছিল?'

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কী আশায় আনন্দে রয়েছে ওরা। ভগমান, শক্তি দাও, শক্তি দাও। ওদের ওই আশা পূরণ করবার শক্তি দাও।…

অধীরের আর এক বইয়ের এক জায়গায় আছে, 'বালকবালিকাগণ অলস হইবে না। অলস লোককে শয়তানে ধরিয়া থাকে…'

পড়ুক ওরা। পড়ে পড়ে শিখুক। সুধীর যাই বলুক, টুকিকেও লেখা-পড়া শেখাবে লখীন্দর। মেয়েটাকে সে সুবল মাস্টারের পাঠশালেই পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু মেয়েটা বোধ হয় বড় হয়ে গেছে! অত বড় মেয়েকে পাঠশালে পাঠালে হয়তো লোকে নিন্দা করবে। তার চেয়ে ঘরেই 'ম্যাস্টর' রাখলে কেমন হয়? সে এসে পড়িয়ে যাবে ওদের দুজনকেই। কত নিতে পারে সে?

ছেলেদের উপদেশ দেয়, 'কাজ করে যাও, বাবা। অলস থাকতে নাই। এই দেখ তোমাদের বইতে লেখা আছে ··' হয়তো তক্ষুণি ওদের পাঠিয়ে দেয় কোন কাজে, 'মা টুকি, যা, গোরুগুলাকে লেড়ে দি' আয়। মঙ্গলীটাকে জল দেখাবি। অধীর, বেগুন বাড়ি থিকে বেগুনগুলা তুলে লিয়ে আয় ত।' এই কাজ নিয়েই একদিন কথাবার্তা হচ্ছিল রামের সঙ্গে। রাম সেদিন মনু দিগারের জমিতে কাজ করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। আনন্দ কাকে বলে সে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিন লখীন্দরের সঙ্গে কাজ করে তার মনের গ্লানি দূর হয়ে গেছে।

'জানলে লখীন্দদাদা, ভাবতম, আমি বুঝি মানুষ লয়। ত কারও মুখের দিকে চাইতে পারতমনি। সবাই আমাকে ঘেন্না করত। আবার যারা আমাকে দুটা ভালমন্দ কথা বলত, যে রাম কেমন আছ, তমার শরীরটা ভেঙে গেছে, ভাই—ত ইগুলাকেও আমি-সহ্য করতে পারতমনি। জান লখীন্দদাদা, তুমি যে সিদিনটা আমাকে দেখেও দেখলেনি, আর সবাইকে যেমন তুমি বলছিলে, ইটা কর, উটা কর, ত্ আমাকেও তেমনি বললে···ত ওতে আমার খুব ভাল লাগল। থালে আমি সকলের সমান! আমার ইটা মনে হল। ত তোমাকে আমি বললম, লখীন্দদাদা, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করলম, তুমি যে কাজটা করবে, যেটা বলবে, সেটায় আমি না বলবনি...'

লখীন্দর গম্ভীর হয়ে যায়। কথাগুলো নিয়ে যেন জাবর কাটতে থাকে সে।

তারপর বলে, 'রাম, ইটা হচ্ছে শাস্তরের কথা। বাম্ভন পণ্ডিতের মুখে ইটা আমার শুনা। ভগমান ইটা অজ্জুনকে বলেছিল যে, কম্ম কর, কম্মেই আনন্দ। কম্মেই পাপ ক্ষয় হবে। ত তোমার পাপ ক্ষয় হচ্ছে, ভাই রাম, মানুষের পাপ এই করেই ক্ষয় হবে...' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু কু-কম্ম লয়, মানুষ থালে ছোট হয়ে যাবে। ত তোমাকে আর কী বলব ভাই, পরের জন্যে সকলের জন্যে প্যারানটায় একটু দয়া-মায়া রাখবে...'

একদিন জন-পাঁচেক কৃষক তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার মধ্যে সেই হিন্দী-জানা লোকটাও ছিল, আর ছিল পরান। পরানের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি লখীন্দরের, তাই ওকে বললে, 'এস ভাই পরান, অনেকদিন দেখিনি তোমাকে। ভাল আছ?'

এমনি করে প্রায়ই ওর কাছে লোকজন আসে। ওর শরীর সম্বন্ধে কুশল জিজ্ঞাসা করে। আর জমিটার সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুধোয়। লখীন্দর প্রায় সবাইকেই বলে, 'এই আমি বুঝি, ভাই। ধান আমরা ছাড়বনি, তাতে যা হয় হবে। তবে এই লিয়ে যে মাথা গরম করবে, তাও চলবেনি। কেনে, না মাথাটি গরম যদি করলে ত তোমার ইকূল-উকূল দুকূল গেল।'

গোবিন্দ মিত্রের মিটিং-এর কথা উঠলে বলে, 'তা যেতে হবে বৈকি। পাঁচ-রকম পাঁচটা দেখতে শুনতে হবে বৈকি। ইটা উটা শুনতে শুনতেই সব ঠিক হবে।'

আজকাল এই সব কথা না বলে পারে না সে। সবাইয়ের কথা সে ধৈর্য ধরে শোনে। তার থেকে ভাল অংশ গ্রহণ করে। সবাইকে আবার নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। অর্থাৎ সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে সে এক বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে। মনে হয়, যাই ঘটুক না কেন তার অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে হবে।

আর আশ্চর্য, চিন্তা করার শক্তি তার ভীষণ রকমে বেড়ে গেছে। সে নিজেই বিস্মিত হয়। অনবরত সে চিন্তার জাবর কেটে চলেছে। হয়তো প্রায় শেষ-রাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমোতেই পারে না। এখন আবার দিনের বেলা কাজ নেই তার। এক এক সময় বিরক্তিতে সে ভেঙে পড়ে, অসহ্য যন্ত্রণায় কপাল টিপে ধরে। মাথাটা নেড়ে হালকা করে নেয়, যেন নিজের চিন্তাগুলোকেই ঝেড়ে ফেলছে। আজকাল এমন হয়েছে, কোন একটা কথা উঠলেই সে সতর্ক হয়ে সেটা বিচার করবে, মাথা দোলাবে, তারপর সে সম্বন্ধে কথা বলবে।

সেদিন কথা হচ্ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে। কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে

যাচ্ছে। আর সেই জমিতেই দিনমজুরী করছে তারা। মন্নু দিগারের ঐ ধান তোলার ব্যাপারটা নিয়েও কথা ওঠে। কী করবে এর পর সে-সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

'জান লখীন্দদাদা, মা লক্ষ্মী আমাদের উব্‌রে বেরাগ হইচে। ধান আর দেখতে পেলমনি। জমি চলে যাচ্ছে সব...' পরান বললে।

'ত যাবেনি কেনে,' আর একজন বলে, 'তা চাষাদেরই ত দোষ। সুদের লোভ মন্দ লয়। বিয়া করবে ত জমি বন্ধক দিবে। আর ঐ হরি চৌধুরী, জমি যদি বন্ধক পেইছে ত আর কুনু কথা নাই। ছেলার অন্নপাশন বল, একটা আহ্লাদ-আমদ বল, সব ঐ জমি বন্ধক! ত থালে আর ই আবস্থা হবেনি কেনে? মা লক্ষ্মীকে মাথায় রাখতে হয়, তা না করে তাকে আবার বন্ধক দেয় কেউ?'

লখীন্দর বলে আস্তে আস্তে, 'ত উকথাই সবটা লয়। মানুষ কষ্টে পড়েও জমি বিচছে ভাই। গেলবারের আকালে কী হল। ত ব্যাপারটা হচ্ছে এই...' বলে সেই কথাটাকে নিয়ে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগল।

'আজকাল সব দিন বদলে গেছে' পরান বললে, 'আগে জমিদার পেরজা বসাত, এখন পেরজা সরাইছে। ই সব মানে বুঝিনি বাবা! সব খাস করে লিচ্ছে, খাস করে...'

'ত তাতে লাভ নাই মনে করেছ। পেরজা যদি বসালে ত কপয়সা খাজনা পাবে তুমি। কিন্তু ধানের দরটা দেখ আজকাল। ত থালে পেরজা বসাবে কী করে?'

এইসব কথাই পরিষ্কার করে বললে গোবিন্দ তাদের আয়োজিত গোপন মিটিংএ।

জমির দাম আজকাল অসাধারণ রকমের বেড়ে গেছে। অবশ্য ধনীদের কাছেও, আর, গরীবদের কাছেও। বড় বড় শিল্পপতিরা পর্যন্ত জমির ওপর নজর দিচ্ছেন, কারণ ধান আজকাল বেশি টাকা আনে। এখন ঐ এক লাভের ব্যবসা হচ্ছে জমি। তার উৎপন্ন দ্রব্য। তুমি যদি চাষ কর তো মজুর হয়ে করবে, দাম পাবে তার বদলে। কিন্তু ধানের ওপর কোন অধিকার নেই। আজকাল আবার জমিদার-জোতদার-তালুকদার, এদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া। 'এই আমাদের ব্যাপারটাই দেখুন,' বললে গোবিন্দ মিত্র, 'মন্নু দিগারের জমির কথাটা নিন। শীরষার জমিদার আর ধানগেছের জোতদার···দুজনে মিলে এই জমিটার ওপর পড়েছে। কেউই পারছে না সেটাকে কোলে টানতে।

মাঝখান থেকে লাভটা হচ্ছে কার? যতদূর মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারটা আর বেশি দূর এগোবে না। ওদের খাওয়া-খাওয়িতেই শেষ হবে।' বলে হাসল ও একটু। পরক্ষণেই কিন্তু সাবধান করে দিলে, 'কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রেই এমনটি হবে না। আমাদের সাবধান হতে হবে, তৈরী থাকতে হবে। একটি কথা শুধু আমাদের : ধান আমরা ছাড়ব না, ধান ছাড়ব না।'

তেরো

একথা ঠিকই। লখীন্দর মনে-প্রাণে এই জিনিসটি বিশ্বাস করে এসেছে। ধান হল গিয়ে মা-লক্ষ্মী। তাকে ছাড়া মানেই তো নিজের মৃত্যু, পরিবারের মৃত্যু। লোকে তো এমনিই বলে, ধান ছাড়া মানে লক্ষ্মীছাড়া। তেমন করে বেঁচে থেকে লাভটা কী।

তাছাড়া, মা-লক্ষ্মী তাঁর সন্তানদের পালন করছেন; সেই মা-লক্ষ্মীকে খামারে আনতে হয়, ঘরে তুলতে হয়। তাঁর পূজো করতে হয়। যে বছর ধান আসে না, সেই বছর মানুষ কেমন নিঃঝুম হয়ে যায়। পরের বছর মা-লক্ষ্মীর উপর তেমন ভক্তি থাকে না। মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়।

আর মানুষ সেই রকম হচ্ছে আজকাল। জমি বিক্রী করে দিচ্ছে চাষী। তারপর তাদের অবস্থাটা দেখ। যেন ওরা দড়ি-ছেঁড়া গরু, মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে ঝড়ের সময়। কিন্তু যাদের জমি আছে, তারাই বা জমির ওপর কী দরদটা দেখায়? কোন রকম নম-নম করে চাষ-বাসের কাজ সারে ওরা। ফসলও পায় তেমনি। কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। বলে, ফসল ত পাবে ঢের, তার জন্যে মাগ-ছেলে নিয়ে ত আর আট-পহর জমিতে পড়ে থাকতে পারিনি···সে সময় বরং আর পাঁচটা কাজ করলে দুটা পয়সা পাব।'

কথাটা সত্যি। নানা কারণে হয়ত জমির উপর সব মনটুকু দেওয়া সম্ভব নয়, হয়ত দুটো পয়সা কম হয় জমিতে লেগে থাকলে। কিন্তু তাই বা কেন, ঠিক ঠিক কাজ করতে পারলে, মা-লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইবেন বৈকি। তাতে মানুষের ঘরকন্না কেমন সুন্দর হয়। তকতকে ঝকঝকে উঠোন, পরিষ্কার মরাই, তুলসী তলা: লখীন্দরের ধারণা, যার ঘরে ধান নেই, তার ঘরে লক্ষ্মীশ্রীও নেই। শুধু কি তাই, তাদের সুখও নাই। জমির টান যদি কমল, তাহলে নিজেও ডুবলে। নিজের উপর টানও কমে যায়। হাজার হোক চাষী তো, তোদের রক্তের মধ্যে তো মাটি রয়েছে। মাটি ছাড়লি কি অধঃপাতে গেলি।

কিন্তু সে কথা নয়, লখীন্দর শুধু গোবিন্দ মিত্রের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত

অনুভূতিতে নির্বাক হয়ে ওঠে। যখন গোবিন্দ মিত্র জোর দিয়ে বললে, 'ধান আমরা ছাড়ব না,' তখন যেন তার মনের কথাটা টেনে বললে। লখীন্দর খানিকটে ঝুঁকে পড়ে ঘাড় নাড়ে। নিজের অজান্তেই সমর্থন জানায় সে। এতদিন সে যে কথাটা ভেবে এসেছে, সে কথাটাকে এত জোর দিয়ে তো এর আগে কেউ বলেনি। যার কাছেই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা উঠেছে, সে বলেছে, 'কি আর করবে বল ওরা। কেউ কি আর ইচ্ছা করে নিজের পায় কুড়াল মারে?' এর কোন পরিষ্কার জবাব সে দিতে পারত না। ফলে, তার অনুভূতির কথাটা কখনো সে জোর করে বলতে পারেনি। কেমন যেন ভীরু-ভীরু ভাব রয়ে গিয়েছে তার মধ্যে। আজ সেইটাকে হঠাৎ এত জোর দিয়ে বলায়, ও যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে। নিজের ওপর ওর বিশ্বাস বেড়ে যায়।

কিন্তু লখীন্দর সতর্ক হবার চেষ্টা করে। এই লোকটির সম্বন্ধে সে ভাল-মন্দ মিশিয়ে নানা রকম কথা শুনেছে। অনেকেই সাবধান করে দিয়েছে তাকে। যা-তা লোক নয় গোবিন্দ মিত্তির, ওর গায়ের হাওয়া লাগলে ঘরে আগুন লাগে। ওকে ধরবার জন্যে সরকারের মাথা ব্যথার অন্ত নেই। ও যে-সমস্ত কথা বলে, তার মধ্যে হয় তো সত্যি আছে কিছু, কিন্তু লাঠালাঠি খুন-জখমি নিয়েই তো ওদের কারবার। যে কয়টা লোক ওর পাল্লায় পড়েছে, সেই মরেছে। সর্বনাশ হয়েছে তাদের। এই রকম লোক গোবিন্দ মিত্তির? ভালো কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর গলা চেপে ধরে? কিন্তু কেন ও তা করে? কেন? কী স্বার্থ ওর! একথার পরিষ্কার জবাব সে কারও কাছে পায়নি, কিন্তু একজন তাকে বলেছিল, 'কেনে আর, চোখের সামনেই ইটা আর দেখছনি তুমি? এই যে কন্‌গেরেসের বাবুরা রাজত্বি পেল, ত অদের লাভ হলনি? অরা কি এর আগে আমাদিকে লোভ দেখায়নি যে, ইটা হবে, উটা হবে। ইস্কুল পাবি, খাবার পাবি, পরনের কাপড় পাবি। ব্যস, ইটা হলে ত মানুষ বেঁচে যেত। ত তারাই আজ কি করেছে দেখ। এই হলগে ব্যাপার...লঙ্কায় গেলত রাবণ হল।'

লখীন্দর স্বীকার করে। নিজের চোখে দেখেছে সে এসব। কিন্তু কেন যে এমন হয়, সে ঠিক বুঝতে পারে না। মানুষের মতিগতি তাহলে কখন কী হবে কে বলতে পারে। আজ যে তোমার বন্ধু, কাল সে তোমার শত্রু। মানুষ বড় খল, মানুষ বড় কুটিল। মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।

গোবিন্দ মিত্তির বলছিল, 'গেল বারের তেভাগা-আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আপনাদের? আমরা ধানের ভাগা নিয়ে লড়েছিলুম। এবার আমরা

জমি নিয়ে লড়ব। যে চাষী, যে চাষ করবে, জমি হবে তারই। আর কাউকে আমরা মানিনে।'

লখীন্দর গোবিন্দ মিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাকটা একটু থ্যাবড়া, নরম-নরম গোল-গোল মুখখানা। কোথায় যেন সুধীরের সঙ্গে ওর মিল আছে। অবিশ্যি সুধীরের মতো অত শক্ত গড়ন নয় ওর। রোগা-রোগা, লিকলিকে চেহারা। কিন্তু হাসিটা ওর আশ্চর্য। কেমন যেন অবজ্ঞা আর দৃঢ়তা একই সঙ্গে মিশে আছে ওই হাসিতে। লখীন্দর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। কোথাও ওর মধ্যে অপরিচিত কিছু নেই। না ওর চেহারায়, না কথায়-বার্তায়। কিন্তু হাসিটার কাছে থমকে যায় লখীন্দর। ও খানিকটে বিস্মিত আর সতর্ক হয়ে ওঠে। অমন হাসি সে দেখেনি।

এখানে পৌঁছেই গোবিন্দকে চিনেছিল ঠিকই। একদৃষ্টিতেই ওকে চেনা যায়। এতে শীতে সবাই মাথায় কম্বল চাদর জড়িয়ে এসেছে, কিন্তু ওর মাথা খোলা, দেহের অতি অল্প এক অংশে চাদরটা জড়ানো। একটা সাদা রঙের শার্ট গায়ে। ডান হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উঠিয়ে-নামিয়ে বলছিল সে।

লখীন্দরের মনে হয়, গোবিন্দ অনেকবার তার দিকে তাকাচ্ছে। আর গোবিন্দ তাকালেই সে যেন কী একটা লজ্জার মতো বোধ করে। তাই প্রত্যেক বারেই চোখ নিচু করে নেয় সে। তখন নিজের মনে ওর চিন্তার জাবর কাটা চলতে থাকে। তখন কতক কথা হয়তো ওর কানে যায় না।

এক সময় মুখ উঠিয়ে ও শোনে : 'কিন্তু জমি যারা কেড়ে নিয়ে গেছে, তারা এমনি ছেড়ে দেবে না। আমরা আমাদের জমি দখল করে নেব। তার জন্যে আমরা পেছ পা হব না লড়াই করতে। আমাদের ভরসা হচ্ছে, আমাদের একতা। আমরা যদি সবাই এক সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি...'

এর জন্যেই লোকে ওদের খুনী বলে ? লখীন্দরের কিন্তু মন সায় দেয় না ওতে। কেমন যেন মায়া হয় গোবিন্দের জন্যে, নিজের ছেলের ওপর যেমন হয়। হয়তো, সুধীরের সঙ্গে খানিকটে মিল থাকাতে এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ওকে খুনী মনে হয় না। না, ও খুনী নয়।

আর আশ্চর্য, এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খানিকটে বোঝা যেন নামে। অকারণেই ও আশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

এতক্ষণে লখীন্দর চারপাশে তাকিয়ে দেখে একবার। মাটির দেয়ালতোলা বড় দালানের মতো, তাল পাতার ছাওয়া ঘর। এই আমধেড়ে গ্রামেরই রতনের

ঘর এটা। বেছে বেছে এটাই মিটিং-এর জায়গা ঠিক হয়েছে। সে ঘরের ভেতর চাষীরা বসে মাথা নাড়ছে। কখনো উল্লসিত হয়েও উঠছে বা।

লখীন্দর দেখে, ভবিষ্যতের আশায় ওদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একজন কিন্তু হঠাৎ বাধা দিয়ে ওঠে।

'বাবু, ই কথাত শুনলম খুব। শুনলম অনেক দিন থিকে। গেল বারের কন্‌গেরেসের আন্দোলনের সময়ও ই কথাটা শুনেছি। কেশপুরে আমরা লড়াইটাও করলম। বলি শুন তমার গে...আজকে কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে বল ত। তোমার কথা শুনব কেনে আমরা। .ই কথা আমি ঠিক বুঝেছি, তোমরা যাই বল, আমাদের গরীব-দুঃখীর কপাল, ই কুনুকালে ভাল হবেনি, ভগমান আমাদিকে মুখ তুলে চাইবেনি, ত মানুষ কি করবে? মানুষে পারবে-নি কিছু করতে।' বলে লোকটি বোকার মত এদিকে-ওদিকে তাকাল দু-একবার, ওরা কী ভাবছে, সেটা দেখবার জন্যে। তারপর নিঃঝুম হয়ে চুপ করে রইল।

গোবিন্দ বললে, ওর মুখে সেই অদ্ভুত হাসি, 'কংগ্রেস যে তার কথা রাখেনি সেটা আশ্চর্য নয়। রাখবে কী করে। তারা আমাদেরই মত আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু গদীতে বসলেই গোদা হয়। তুমি যদি একটা দোকান ফাঁদ, তো তোমাকে অনেক কিছুই করতে হবে · মিথ্যা কথা বলতে হবে, খদ্দের ঠকাতে হবে, কারণ লাভ তো তোমার চাই। এক্ষেত্রেও সেই ব্যাপার, সবই হচ্ছে লাভের। ধনী আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে সব চায় লাভ। তো ওরা আর কী করবে। নিজের কোলে ঝোল টানতে হয়। তো আমরা কংগ্রেসী নই, আমরা কৃষক-সভার লোক!'

লখীন্দর দেখল, আশ্চর্য জোর দিয়ে কথাটা বলল গোবিন্দ মিত্র। প্রত্যেকের ওপর ও যেন চোখ বুলিয়ে নিল একবার।

'আমরা কৃষক-সভার লোক। কৃষকদের নিয়ে আমাদের দল। আমরা কি চাই? আমরা এই সমাজটাকে ভেঙে নতুন করে গড়ব। এমন সমাজ যার মধ্যে লাভের ধান্দা নেই, বড় ভাইকে ঠকিয়ে ছোট ভাই যেখানে দুপয়সা কামায় না। তার জন্যে আগাগোড়া এই জমিদার-ধনী-মহাজনের চক্র আমরা উচ্ছেদ করব।'

একটু থেমে ও আবার বললে, 'ভেবে দেখুন, ছেলে যে জন্মায়, সে তো আর মায়ের পেট থেকে চুরি-চামারি শেখে না। সে দেখে শেখে। আমরা সেই দেখবার জিনিসটুকুকে নষ্ট করব।'

হ্যাঁ? এমনই হয় বুঝি? লখীন্দর কথাটাকে লুফে নেয়। মানুষ কেন

বদলে যায়, সে কথা সে অনেক বার ভেবেছে কিন্তু তার কোন জবাব পায়নি। অবিশ্যি সে জানত, অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু যাদের অভাব নেই, তারা নষ্ট হয় কেন? হয়তো, এই জন্যেই। মানুষ লোভের মধ্যে পড়ে, পাপের মধ্যে, তারপর সে আর তার হাত থেকে ছাড়া পায় না। শেষকালে সে রাক্ষস হয়ে যায়। হ্যাঁ, অবস্থার বিপাকে মানুষ দেবতাও হয়, রাক্ষসও হয়।

'তাছাড়া কৃষক-সভা কৃষকদেরই। আমরা বলিনে এ সভা সবার। এটা মহাজনেরও নয়, জমিদারেরও নয়। এর সব কিছু কাজ এবং নীতি কৃষকরাই করবে। এই যেমন ধরুন...'

কিন্তু কেমন গোলমাল হয়ে যায়, জমায়েত লোকগুলি আশা ও সন্দেহে দুলতে থাকে। ওদের ভেতরকার প্রচণ্ড আবেগকে যেন ঠেলা দিয়ে থামিয়ে রাখে অবিশ্বাস। ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'যা বলছিলাম। মনু দিগারের জমির ধান-তোলা ব্যাপারটা নিয়েই দেখুন। তখন তো আপনারা সবই করেছেন। আপনাদের এই কাজ কৃষক-সভা সম্পূর্ণ-ভাবে সমর্থন করবে। এ কাজ আপনাদেরই নয়, এটা কৃষক সভারও।'

দু-একজন বলে উঠল, 'কই, লখীন্দদাদা কই। তুমিত সেদিন আমাদিকে মাথা দিলে। ত তুমি কী বল। বাবুর কথায় কি তোমার কথা, সেইটা বল...'

'হ্যাঁ, আপনিই বলুন। আপনাদের কথা আপনাদেরই বলতে হবে...' লখীন্দরের খুব ভালো লাগে, এই আপনি বলে সম্বোধনটা। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু তারাও তো মানুষ, ভদ্রতা বলে একটা কিছু তারা জানে। সেই রকম ব্যবহার করেও কখনো তারা তার প্রতিদান পায়নি।

কিন্তু লখীন্দর অদ্ভুত রকমে বিব্রত হয়ে পড়ে। সবাই, এমন কি, গোবিন্দ পর্যন্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওর কথা শোনবার জন্যে। কি করবে ও ভেবে পায় না। কোন রকম করে বলে, 'হ্যাঁ, ইটা ঠিক কথা', তারপর আর কিছু বলতে পারে না। মুখখানা ওর একটু ফাঁক হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কয়েকবার কিছু বলবে বলে মুখ তুললে, তারপর আবার নামিয়ে নিলে। অনেক চেষ্টা করেও তারপর বেরোল না কিছু।

দোষ নেই লখীন্দরের। এই ধরনের রাজনৈতিক সভার অভিজ্ঞতা ওর প্রথম। এর আগে ও রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেছে, হয়তো কিছু আগ্রহও ছিল। কিন্তু তা ছিল অতি দূরের। অত্যন্ত আলতো গোছের সেই যোগাযোগ। কিন্তু আজ সে এসেছে একটা বোঝাপড়ার ভাব নিয়ে। ওর অজান্তেই হয়তো ও জড়িয়ে পড়তে এসেছে। কে বলতে পারে সে কথা।

তাছাড়া প্রথম থেকেই বিস্ময় আর নতুনত্ব, এ দুটোর ধাক্কা ও সামলে উঠতে পারছিল না। রামকে নিয়ে সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিল লখীন্দর। শীতের রাত, শোঁ শোঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হিজল বনের ফাঁক দিয়ে। কোনরকমে মাথায় কানে কম্বল জড়িয়ে ওরা এগোচ্ছিল। ঠাণ্ডা ধুলো-ভরা রাস্তা ওদের খালি, ফাটা-পায়ে যেন কাঁটা ফুটোয়। কিন্তু অভ্যস্ত বলে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে না ওরা।

রতনদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে আটকালো ওদের। দুজন ছোকরা একটা জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

'কে, কে যায় ?' কাছে এসে ভাল করে দেখে বলে, 'লখীন্দদাদা ? যাও, যাও, যাবে বৈকি। তুমি আর যাবেনি ?'

অত শীতেও কেমন উত্তেজনা বোধ করে লখীন্দর। অত বয়সেও। মনে হয় ও একটা অজানা দুঃসাহসের কাজ করতে যাচ্ছে।

ওরা তাহলে চারদিকে ঘিরে আছে। পরে শুনেছিল লখীন্দর, কোন অচেনা অবিশ্বাসী লোককে ওরা যেতে দিত না। নানা রকম কথা বলে ছল করে অন্য পথে পাঠিয়ে দিত! আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকলে ইঙ্গিত করতো ওরা। আশ্চর্য। ওখানে গিয়ে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল লখীন্দর। ছেঁড়া তেলাই পেতে বসেছে সব। একটা টিমটিমে হারিকেন জ্বলছে, সেটা গোবিন্দর হাতের কাছেই। ওর মুখটাই ভালো করে দেখা যায়। একটু জায়গা করে বসল লখীন্দর। তখন কি একটা কথা নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল বলে ভালো করে লক্ষ্য করল না ওকে কেউ। শুধু সতীশ ওকে লক্ষ্য করে হাত নেড়ে বসতে বললে।

এই নতুনত্ব একদিন কেটে যাবে নিশ্চয়ই। তখন ও হয়তো ভালো করে বলতে পারবে ওর মনের কথা। এখন ও আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছে ওর পরিবেশকে।

সভা শেষ হবার পর, গোবিন্দ লখীন্দরকে বললে, 'আপনি একটু থেকে যান। কিছু কথা আছে।'

লখীন্দর তাই চাচ্ছিল। এতক্ষণ ধরে সভাতে এত লোকের মাঝখানে সে যেন মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। গোবিন্দর সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়তো সে তার চিন্তাধারার সঙ্গে সব কিছু খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

এক সময় সব খালি হয়ে যায়, শুধু সতীশ, গোবিন্দ, রাম আর লখীন্দর থাকে। রতন ঘরের ভেতর যায় কি কাজে।

'আপনি একটু পড়াশুনো করুন।' গোবিন্দ বলে।

'আমি?' লখীন্দর খানিকটে অবাক হয়ে শুধোয়।

'হ্যাঁ। সতীশ গিয়ে আপনাকে বই-পত্তর দেবে, ও মাঝে মাঝে আপনাকে পড়বার সাহায্যও করবে। নানা-রকম বই থাকবে তার মধ্যে। আপনি পড়াশুনো করলে সব কিছু বুঝতে পারবেন! মনের জোর পাবেন।'

একটু হেসে আবার বললে, 'আপনার সেদিনকার কাজ দেখে আমরা খুব খুশি হয়েছি।'

প্রশংসা করতে গিয়ে ওর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, গলার স্বরে আবেগ এসে যায় খানিকটে। 'আপনি প্রাচীন লোক, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আপনার সব কথাই জানি আমরা। আমার কথা বলতে পারি, আমার খুব ভালো লাগছে আপনাকে। কিন্তু তাহলে তো চলবে না। আপনাকে পড়াশুনো করে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে হবে, না জানলে আপনি লোককে চালাবেন কি করে। আজকের সভায় আপনি প্রায় কিছুই বলতে পারলেন না। আমি বুঝতে পেরেছিলুম আপনার অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু তবুও আপনার বলা হল না। পড়াশুনো আপনাকে সেই সাহস দেবে।'

লখীন্দর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলে। একটি ছাত্রের মতো। ওর যখন প্রশংসা করা হল তখন ও বিগলিতও হল না। ওর ত্রুটি উল্লেখেও আহত হল না। ধীরে ধীরে গোবিন্দের বক্তব্যটুকু ও শুনে নিলে।

বললে, 'হ্যাঁ। আপনি এই যে নেকাপড়ার কথা বললেন ইটা ঠিক। আমাদের কিষ্টমহন ঠাকুরও একদিন ই কথা বলেছিল। বলে, বাবু, মানুষ হল গিয়ে কাদা মাটি, আর বিদ্যা হল ছুঁতার। ত ঐ ছুঁতার কাদামাটি থিকে ঠাকুরের মুত্তি গড়ে। হ্যাঁ।'

'ঐ শিবের পূজারী কেষ্ট ঠাকুর? ওর কথা আমি বুঝি না।'

গোবিন্দ আহত হয়। তারই ভক্ত যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুজো করে এসেছে, এমন ধরনের একটা ভাব আসে তার মনে। কিন্তু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদের ভণ্ডামি বুঝবে কি করে ওরা? ভালোভালো কথার অন্য মানে করে ওদেরকে বোঝাবে। সেই দুর্দশা থেকে এদেরকে তো বাঁচাবার দায়িত্ব তাদেরই।

লখীন্দর গোবিন্দের মুখের ভাব দেখে বোঝে, নিশ্চয়ই কিছু ভুল ও করেছে। তা না হলে গোবিন্দ এমন অসন্তুষ্ট হবেই বা কেন ? গোবিন্দ কিন্তু সহজভাবে বলে, 'ওরা যে শিক্ষার কথা বলে তার কোন অর্থ নেই। আপনি এই ঘটনাটা ধরুন, মনু দিগারের জমির ব্যাপার নিয়ে যেটা হল। তো কেষ্ট ঠাকুর এল একটা প্রস্তাব নিয়ে। কি, না সিং বাবুর কথা তোমরা শুনবে না, অজয়বাবুর কথা তোমরা শোন, মারামারি কাটাকাটি করে লাভ নেই। মানে বড় কুমীরের কাছ থেকে সরে এসে ছোট কুমীরের কাছে দাঁড়াও, এই তো ? মারামারি কাটাকাটি করতে ওরা বারণ করে। কিন্তু কেউ যদি তোমার গলাটা কাটতে আসে, তা হলে কি করবে ? গলাটা বাড়িয়ে দেবে ? দাও তার জবাব।'

'ভাই গোবিন্দ, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, তোমাকে ভাই বলেই ডাকি। কিছু মনে করবেনি তুমি। তুমি কথাটা শুন, তোমারগে আমরা হলম গিয়ে মুখ্যু লোক। সব কথা ভাল করে বুঝতে পারিনি। তুমি এক কথা বললে ত সেটা বুঝলম যে, হ্যাঁ, ইটা ঠিক। আর একজন আর এক কথা বললে, সেটাও বুঝলম ঠিক। সব সময় জ্ঞানগম্যি আমাদের ঠিক জাগেনি তাই যা তা বলে ফেলি। এই মারামারির কথাটাই ধর—তুমি কিছু মনে করবেনি ভাই—লোকে তমাকে খুনে বলে। ত লোকে বলে ওদের ওই হচ্ছে কারবার। কার কথা শুনব ? তাছাড়া, তুমিই বল, খুন জখমি কি ভাল ?'

গোবিন্দ হাসল একটু। বেদনায় ওর হাসিটা বাঁকা দেখাচ্ছে।

'তুমি যখন আমাকে ভাই বললে, তখন আমিও তোমাকে লখীন্দদাদা বলব। সবাই তো ওই নামেই ডাকে তোমাকে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গোবিন্দ। ওর ভেতরে একটা তোলপাড় চলেছে, সেটাকে সামলাবার চেষ্টা করে সে। এমন প্রশ্ন সোজাসুজি তাকে কেউ করেনি। হঠাৎ তাই ব্যথা পেলেও গোবিন্দ আনন্দও পায়। এই হচ্ছে সত্য, সত্যের রূপ এমনই নগ্ন। লোকটির ওপর তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

'জানি, জানি। লোকে আমাকে খুনে বলে জানি আমি। কিন্তু সে কথার জবাব কাউকে দিইনি এতদিন, আজকে তোমাকেই দেব। জানো লখীন্দদাদা, ভেবেছিলুম, নিজের কথা কাউকে জানাব না তাতে নিজেকে ছোট হতে হয়। সেটা ভুল। শুনবার মতো লোক পেলে বলতেই হবে, বললে ভালোই হয়। আমার স্ত্রীকে নিয়েই তো কথাটা উঠেছে। তা ওকে আমি

সত্যিই খুন করিনি, সাপকাটিতেই মরেছে সে। কিন্তু খুন করতে পারতাম তাকে, বলেও ছিলাম তাকে সে কথা। মেরুদণ্ডহীন মানুষের দয়ামায়া নেই আমার। আমি বুঝি, অন্যায়কারীকে আমি ক্ষমা করব না, কাউকে ক্ষমা করিনে আমি, কাউকে না...' বলতে বলতে ওর চোখ দুটো দপ করে উঠল।

'বুঝেছি, বুঝেছি...' মাটির দিকে চেয়ে বাঁ-হাতটা গালের ওপর রেখে লখীন্দর ঘাড় নাড়ে। 'অন্যায়কে তোমরা ক্ষমা করবেনি। ত ভাই ই বড় কঠিন ব্যাপার। এ হল গিয়ে ধম্মরাজার সেই চোখ। তাকে পাপ করে ফাঁকি দিতে পারবেনি কেউ। শাস্তি পেতেই হবে...কিন্তু তোমরা পারবে ত?'

কী জানি কেন, লখীন্দরের মনে একটা আনন্দের অনুভূতি আসে। অন্যায়কে ক্ষমা করা যায় না, তার শাস্তি আছেই।

কিন্তু এ বড় কঠিন। তার মধ্যে দয়া-মায়া নেই, অন্ততো গোবিন্দ তাই বললে। কিন্তু ধম্মরাজা, তাঁর তো দয়া-মায়ার শরীর, পাপী অনুতপ্ত হলে তার রেহাই পাওয়া যায়! তবে, তবে? কোথায় যেন একটু খটকা থেকে যায় ওর।

চোদ্দ

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সতীশ চলে যাবার পর মালতী আর মিনতি কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে গেল কাজে।

রাত্রে মালতী তো এখানেই থাকে। তাই একসংগে রান্না-বান্না করে খেল ওরা। শীতের রাত্রি অল্পেতেই নিঝুম হয়ে এল। সুবল বিছানায় শুতে যায়। ওরা রান্না-ঘরে উনুনের ধারে বসে হাত-পা সেঁকে সেঁকে গরম করতে থাকে।

'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুরঝি,' একসময় মিনতি বলে, 'কোনদিন তুমি কিছু বিশ্বাস করনি, কারো ওপর তোমার ভরসা ছিল না। কিন্তু অমন নরম প্রাণ তোমার আছে তা তো জানতাম না। আজকে বুঝলাম। এখন দেখছি, কেন তুমি অন্যের কাজ করে এত আনন্দ পাও। কারো অসুখ-বিসুখ করলে সারারাত জেগে কাটিয়ে দাও।'

মালতী কিছু বলে না, ও চুপ করে থাকে।

মিনতি কিন্তু উস্‌খুস্‌ করতে থাকে, কি একটা বলবে বলবে করেও পারে না। মালতী সেটা লক্ষ্য করে বলে, 'কিছু বলবে ভাই।'

'হ্যাঁ। কথাটা আমার কিছু নয়, তোমাকে নিয়েই। আমার কিন্তু দোষ নিও না, ঠাকুরঝি। তোমাকে আজ যেন কেমন কেমন দেখলাম। শুধু আজ নয়, এর আগেও দেখেছি। তোমার ভিতরে কী একটা কথা আছে, আমাকে বলছ নি......'

মালতী চমকে উঠল, কিন্তু নিজেকে সামলে বলল, 'আমার কথা? অবাক করলে বউ! আমি গরীব দুঃখী মেয়ে, আমার আর কি কথা আছে...'

স্পষ্টত, বিশ্বাস করল না মিনতি। কিন্তু ওর একটু অভিমানও হল, এত দিনের জানাশোনার পরও তাকে বিশ্বাস করে কথাটা বলতে পারল না মালতী। অথচ কথাটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে সে। ইচ্ছে করে নিজেই সে কথার মোড়টা ফিরিয়ে দিলে। বললে,

'তবে আর একটা কথা বলতে হবে। তুমি কি সত্যিই মানুষকে বিশ্বাস কর

না? কতবার তুমি বলেছ, মানুষ বড় খারাপ, সেটা তুমি হেসে হেসে বলতে। তাই বুঝতে পারিনি…'

একটু থেমে, মালতী কিছু বলবার আগেই ও আবার বললে, 'আমার কথা তবে শোন, চারিদিকে মানুষ এত নীচ হয়ে গেছে দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি কী করব। সতীশ ঠাকুরপো যা বলে, হয়ত সত্যি। দুঃখে কষ্টে মানুষ এই রকম হয়েছে। একদিন ওরা হয়ত ঠিক হবে। কিন্তু ততদিন কি বাঁচব, তা ছাড়া এখন আমি বাঁচি কী করে।'

এক সময় মালতী কথা বলতে শুরু করে, তার প্রশ্নের জবাব: 'মানুষকে কেনে বিশ্বাস করবনি, ভাই। তা নালে এত বড় পিথিমিটা চলছে কি করে। তবে কি জান, মেয়া-মানুষের সংগে পুরুষের সম্বন্ধই আলাদা। এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নাই। মেয়ে জন্ম বড় খারাপ, বউ, বড় খারাপ। সব পুরুষ তোমার দিকে ছুটে এসবে, গিলে খাবে তোমাকে। তারপর বাদ-বাকীটা ছুঁড়ে ফেলে দি' যাবে। আর মেয়েদের প্রাণটা দেখ, কেঁদে-কেঁদেই মরবে ওরা, তাদের দুঃখ কেউ বুঝবেনি। কারও পায়ে ভক্তি করে পেন্নাম কর তুমি, ত দু-চার কথার পর তোমার দিকে ঘেঁষে ঘেঁষে সরে এসবে। ত সব পুরুষই ঐ, মেয়ে দেখলে তাকে চুষে লিবেই লিবে।'

ও একটু থামে। মিনতি দেখল ওর ঠোঁটটা কাঁপছে।

'তবে হ্যাঁ, এমন দু একটা পুরুষ আমি দেখেছি। মেয়েদিকে ওরা ফিরেও চাইবেনি। তবে তারাও ভাল লয়, ভাল লয়। বড় কঠিন তারা। তুমি ভালবেসে মরে যাও, কেঁদে বুক ভাসি' দাও, ত তারা দেখবেনি। দুটা কথাও শুনবেনি। মেয়ে জন্ম কিছু লয়, ভাই, তারা লরকের কীট।'

মিনতি একটু আগেকার অভিমান ভুলে গিয়ে বলে ফেললে, 'গোবিন্দবাবু তোমার মন টেনেছে, ঠাকুরঝি ··তুমি গোবিন্দবাবুকে…' কিন্তু বলেই চমকে উঠল ও।

মানুষ প্রেতাত্মার সামনে পড়লে যেমন হয়, দেখলে, মালতীর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয়ে ওর নিজের বুকের ভেতরটারও দুরদুর করে উঠল কিন্তু ও মুখ রক্ষা করবার জন্য বললে, 'কেন, তাতে আর মন্দ কি! আজকাল ত এই রকম বিয়ে হচ্ছে…'

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই মালতী এক রকম ওর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'বউ, তোমার পায়ে পড়ি…আমি ছেলেবেলা থেকে বিধবা হইছি, আমাকে উকথা বল' নি। কাকেও বলনি' পায়ে পড়ি তোমার…'

মিনতি বিমূঢ়, এতটা সে ভাবে নি। সে কেবল ওর এলোথেলো, থরথর করে কাঁপা দেহটার দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে রইল।

* * * *

এরপর এক আধ দিন মিনতির সঙ্গে ছিল মালতী, কিন্তু তারপর ওর নিজের কুঁড়েতেই কাটাতে লাগল। মিনতি আহত হল, এর কোনো হেতু সে বুঝতে পারল না। ওদের বাড়ির মাঝখানে একটা বাঁশ ঝাড় আর একটা ডোবার তফাৎ। মিনতি প্রথম ওকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালে, তারপর নিজেই গেল ডাকতে। কিন্তু এটা-ওটা বলে এড়িয়ে গেল মালতী, ওদের ওখানে আর এল না। মিনতি অনুতপ্ত হল, সেদিন কোনো কথা না বললেই হত। কিন্তু রাগও হল ওর : কী এমন কথা। তার ভেতর খারাপই বা কী ছিল? পরে ভাবলে, 'এখানকার লোকই তো, এর বেশি আর কি হবে। কে জানে মেয়েটার মতি-গতি কী রকম।'

মালতীর দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। কোনো নিষিদ্ধ, ভয়ের জায়গার মাঝখানেই মানুষকে ছেড়ে দিলে যা হয়, তার সব ভয় ভেঙে যায়, ওর অবস্থাও তাই হয়েছিল। সেই যে মিনতি অত স্পষ্ট করে কথাটা বলে ফেলেছিল, সেইটেই ওর দিক থেকে সব সংকোচ আর দ্বিধাটাকে সরিয়ে ফেললে যেন। সতীশের সঙ্গে দেখা হলেই ও বলত, 'গোবিন্দাকে একবার নিয়ে এস না, সতীশদা, অনেকদিন তেনাকে দেখিনি...'

দিনের পর দিন হাওয়ার ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল সে। এ অনুভূতি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল।

এমনি সময় গোবিন্দকে একদিন তার বাড়িতে পেলও সে। সতীশের সঙ্গে নয়, একাই। গোবিন্দর কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, অসময়ে যাকে দেখবার জন্য সেই গদ্‌গদ কৃতজ্ঞতা। নিজেকে মেলে ধরেছিল মালতী, কিন্তু গোবিন্দ অন্ধ। মালতীর ভেতরে নারীকে দেখতে পেল না সে।

ক'দিন মেঝের ওপর গুম খেয়ে পড়ে রইল মালতী। তার জীবনের সব স্বপ্নকে ফুটো করে চুপসে দিয়েছে যেন। গ্লানিতে আত্মহত্যা করতে চাইলে সে, একশ'বার করে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, ছি-ছি, কী বেহায়া, নির্লজ্জ! মেয়েমানুষ আবার এমনি হয়! মিনতিকেই এর জন্যে দায়ী করলে মালতী, তারই জন্যে তো এতখানি সম্ভব হল। এখন কারো কাছে মুখ দেখাবে কী করে সে।

নিজেকে বড়ই হীন মনে হতে লাগল তার। কোথাও সে সুখ পায় নি, আদর পায় নি। বুড়ি মা ঘুঁটে কুড়িয়ে, শাক তুলে, ধান ভেনে মানুষ করেছিল ওকে। দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়নি। অর্থের অভাবে বুড়ো এক বরের হাতে দিয়েছিল মা, দু'বছর যেতে না যেতে স্বামী মারা গেল। স্বামীর ঘরে স্থান হতে পারত তার, অবস্থা মন্দ ছিল না, কিন্তু দেওররা আর স্বামীর আর-পক্ষের ছেলেরা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওকে। তারপর এতগুলি বৎসর কী করে কেটেছে সেই জানে। সকলেই তাকে লোভের দৃষ্টিতে দেখেছে, কিন্তু দু'মুঠো ভাত দেয়নি কখনো। মিনতিরা যে আশ্রয় দিয়েছিল, তাও কৃপা করে, নিজেদের প্রয়োজনে। তারপর এই গোবিন্দ মিস্তির, সেও পায়ে করে ঠেলে দিয়ে গেল তাকে। মানুষ বলে মনেও করল না।

একদিন উঠে বসল মালতী। সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল ওকে। 'আমি কি এতই তুচ্ছ, এতই খারাপ, আমার কি একটা কানা কড়ির দাম নাই......' বেদনায় নয়, প্রতিহিংসার বিষাক্ত স্বরে প্রশ্ন করতে লাগল ও। 'সবাই কি আমাকে ঘেন্না করবে, নয়তো কুকুরকে যেমন লোক দয়া করে ভাত দেয়, তেমনি করবে···' বলতে বলতে বিপরীত একটা চিত্র মুহূর্তে ওর সামনে ভেসে ওঠে। যে চিত্র অনেক বারই আগেও তার সামনে এসেছে, কিন্তু এতদিন ঘৃণাভরে যা ও দূরে সরিয়ে দিয়েছে : 'কেনে, আমার কী নাই! আমার ঘর আছে, দুয়ার আছে, শাড়ি আছে, গয়না আছে, আমার সবই আছে...সেদিন ওরাই আসবে পায়ে ধরে দুটো পয়সা চাইতে, আজ যারা ঘেন্না করে...'

কুলুঙ্গিতে তোলা আয়নাটা পেড়ে নিজেকে দেখল মালতী, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, যেন নিজের চিন্তার সঙ্গে কী মিলিয়ে নিলে। তারপর ঘরদোর বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

মাসখানেক পরে একদিন আবার ফিরে এল মালতী, নিজের ঘরে কী সব দেখাশোনা করার জন্য। মিনতি একেবারে বুভুক্ষুর ক্ষুধা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। ওর আসা বুঝতে পেরেই ওখানে চলে এল ও। 'কী ঠাকুরঝি, কী ব্যাপার তোমার। আমি ভাবলাম, ঠাকুরঝি মরেই গেল নাকি...' কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল সে, মালতীর এ কি পরিবর্তন হয়েছে! সেই মোটা, ছেঁড়া, আধময়লা থানকাপড় আর নেই। তার বদলে সরুপাড় মিহি ধুতি উঠেছে গায়ে, শাদা ধবধব করছে। কিন্তু ওর সেই ফুটে-ওঠা রঙ আর নেই। দেহ শুকিয়ে গেছে, চোখের কোণে কালীবর্ণ।

ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল মালতী। হেসে বললে, 'না, ভাই, মরিনি,

জলজ্যান্ত বেঁচে আছি। গেছলাম চাকরী করতে, ওই ধানগেছের হরি চৌধুরীদের। বাড়ি...ত উনি আবার লাগিয়ে দিলেন অজয়বাবুদের ঘরে...'

'হরি চৌধুরী! ..' কিন্তু বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারে না মিনতি। মুহূর্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে ওর কাছে। ঘৃণায় ওর বুকের ভেতরটা ঘুলিয়ে ওঠে। বলে, 'তা বেশ করেছ, ভালই হয়েছে......' বলে ও চলে আসে।

মালতী পেছন থেকে বললে, 'তা আর কতদিন তোমাদের গলার পাথর হয়ে ঝুলে থাকি বল। উখেনে বেশ আছি, খাওয়া পরা, দশ টাকা মাইনা...'

মিনতিকে আঘাত করা ওর উদ্দেশ্য নয়, এও এক রকম নিজেকে দংশন করা। মালতীর ভেতরে যে প্রবাহ সুধাধারায় উৎসারিত হতে পারত, সেটাই কালনাগিনী হয়ে প্রথমেই নিজেকে দংশন করেছে, আর কাকে করবে কে জানে! কিন্তু মালতীর হৃদয়ও নারীর, এবং একদা তাতে সুধা ক্ষরিত হতে গিয়ে প্রতিহত হয়েছিল। সে সুধাও একেবারে ব্যর্থ হয় নি, গোবিন্দর অন্ধতা সত্ত্বেও। কিন্তু সে কথা পরে আসবে।

পনেরো

অতঃপর লখীন্দর পড়াশুনো শুরু করে। সতীশ অনেক রাত্রে আসে, একটি সাপ্তাহিক পত্র থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। বলে, সাধারণ খবরের কাগজে যে সব খবর বেরোয় না, সেই সব থাকে এই কাগজে। সাধারণ মানুষের ইজ্জতের লড়াই শুধু তো আর এই ঝাঁকরা-কেশপুর-তমলুকে সীমাবদ্ধ নয়। এই লড়াই চলছে সব জায়গায় : বাংলায়, ভারতবর্ষে—পৃথিবীর সবখানে। লখীন্দদাদা, তুমি কি বাংলা দেশের কথা জানো? ভারতবর্ষ? জানবে কি করে। তোমাদের সময় তো আর পাঠশালায় ভূগোল পড়ানো হতো না। তোমরা শুধু শুভঙ্করী-মানসাঙ্ক শিখেছ। তোমাকে ম্যাপ দেখতে শেখাবো একদিন। কিন্তু সে কথা থাক। যে কথা বলছিলাম তাই বলি আগে। এই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষ, লখীন্দর-রাম-অখিলের মতন মানুষ, লড়াই করে চলেছে। এটা আমার লড়াই, ওটা তোমার লড়াই তা নয়। তাই, জানো লখীন্দদাদা, আমাদের একটুও ভয় নেই। আমাদের আশংকা নেই। আমরা জানি আমরা জিতবই। আজ যদি ওরা বন্দুক ছুঁড়ে থামিয়ে দেয় কেশপুর ঝাঁকরাকে, কাল লড়াই চলবে কলকাতায়। বাংলাদেশকে ঠাণ্ডা করলে চলবে ব্রহ্মদেশে। হ্যাঁ, চলছেই তো। সে-কথা তোমাকে বলব একদিন। তুমি নিজেই জানতে পারবে। এই কাগজখানা পড়ো, প্রত্যেক হপ্তায় তোমাকে আমি দিয়ে যাব। এর মধ্যে সত্যি কথা লেখা থাকে বলে সরকার বে-আইনী করে দিয়েছে এই কাগজ। কিন্তু পারবে না ওরা, যা সত্য, চিরকাল তারই জয় হয়।

লখীন্দর প্রথম প্রথম ছেলেমানুষের আনন্দ নিয়ে শুরু করে। 'সতীশ, ইটা আবার কেমন হল বল দিকিন। তুমি আবার আমার ম্যাষ্টর হলে যে গো। আগে বুড়ারা ম্যাষ্টর হত এখন ছোকরারা হয়, হ্যাঃ হ্যাঃ...'

সতীশও হেসেছিল : 'আজকাল আমরাই যে বেশি জানি।'

কিন্তু এই লঘুতা থাকে না। দুদিন-চারদিন পরেই ওর মাথা ধরে আসে। রামায়ণ-মহাভারত লখীন্দর পড়েছে, একরকম মুখস্থই হয়ে গেছে বলতে হবে।

কিন্তু এই কাগজের নতুন বানান, নতুন ভাষা। একই লাইন হয়তো ওর কয়েকবার ধরে পড়তে হয়েছে। সপ্তাহের শেষে সতীশ নতুন কাগজ এনে তাড়া দিয়েছে, আগেরটা শেষ হয়েছে কি না। না, হয়নি। পারে নি লখীন্দর শেষ করতে।

তাছাড়া বুঝতেই বা পারে সে কতটুকু। ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান (হ্যাঁ, চীন-জাপানের যুদ্ধের কথা সে শুনেছিল আগে), সোভিয়েট, আমেরিকা—এত সব দেশ আছে পৃথিবীতে ? কোথায় সে-সব। প্রত্যেকটি অজানা শব্দ তার ভেতরটা তোলপাড় করে তোলে। সে কথার মানে না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। উপনিবেশ কী। সাম্রাজ্য কাকে বলে ?

দিনের পর দিন চলে যায়। রোজ রাত্তিরে 'লম্প' জ্বেলে পড়তে বসে লখীন্দর। কখনো উচ্চারণ করে পড়ে, কখনো মনে মনে। এক সময় তার চোখ জ্বালা করে, মাথা টিপটিপ করে। আলোটা নিবিয়ে দেয়। আর তারপর তার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত বিছনায় এপাশ-ওপাশ করে লখীন্দর। চিন্তায় তার মাথা কুরে কুরে খায়। আজকাল আর সুধীর তার কাছে শোয় না। ভালই হয়েছে। তাছাড়া বাবাতে ছেলেতে প্রায় কথাবার্তা নেই। সুধীর আজকাল কী করছে সে-দিকে খেয়ালই করে না ও। শুধু কি তাই। অধীর আর টুকি ওর কাছে আর আদর পায় না আগেকার মতো। একদিন অধীর বললে, 'বাবা, উটা কী পড়ছ ? আমাকে দাও।' আচ্ছা সে হবেখন। এখন যা। টুকি একদিন রামায়ণ পড়তে বলেছিল। সেও আর একদিন হবে। ওরাও আর তার কাছে আসে না।

স্ত্রী গৌরীবালা কিন্তু বলে, 'ওগো তমার শরীলটা কি হচ্ছে দিন দিন। তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ...'

সবই সে বোঝে, কিন্তু কেমন যেন এক নেশার মতো হয়ে গিয়েছে, তাকে পড়তেই হয়। তাছাড়া সকাল বেলা যখন সে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে লাঙল কাঁধে করে মাঠে যায়, তখন তার এত ভাল লাগে। রাত্রের সব ক্লান্তিই ভুলে যায় সে। রাস্তায় বা মাঠে ওর সহকর্মীরা ওকে নানারকম প্রশ্ন করে। ও তার জবাব দেয় দৃঢ়তার সংগে। 'বুঝলে কিনা ভাই, এই সমাজের রন্ধে রন্ধে গলদ, হ্যাঁ। যত দুঃখ সব সমাজের এই আবস্থার জন্যে।' নতুন শিখেছে এই কথা সে। কিন্তু 'সমাজের রন্ধে রন্ধে গলদ' এই কথাটা বলতে সে খুব আনন্দ পায়। লোকে তার কথা মন দিয়ে শুনছে, এটা ভেবেও তার আনন্দ হয়। কিন্তু অহংকার নেই ওর। অতি মনোযোগের সংগে ও শেখে। যা শেখে

তার সংগে মিলিয়ে নেয় নিজের অভিজ্ঞতা। অনেক সময় তার অভিজ্ঞতা থই পায় না, সেখানে যুক্তি দিয়ে ও নাড়াচাড়া করে। তারপর মেনে নেয়।

সেদিন মিটিং-এর শেষে রাস্তায় আসতে আসতে গোবিন্দ তাকে এই সমাজের কথা বুঝিয়েছিল। নানা কথা বলবার পর বললে—তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কিন্তু তার নিজের জীবন থেকেই উদাহরণ নিয়ে—'আমার কথাই ধর লখীন্দদাদা। বি. এ পাশ করেছি আমি। একটা ছেলেকে বি. এ পড়াতে ক'হাজার টাকা খরচ হয় বলতে পার? কি করে পারলুম আমি? লোকে বলে, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। সোনার ছেলে। ওসব কিছু নয়। সব ছেলেই সোনার ছেলে। সবাই পারত। তাহলে পারে না কেন—এ কথা হয়তো তুমি শুধোবে। হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা বলি। আমাদের সমাজে মানুষের মূল্য হচ্ছে টাকার মাপে। আমার মায়ের কথা জানো তুমি, আর আমাদের অবস্থার কথা। মা আমাকে খাওয়াত পরাত, ইস্কুলের মাইনে দিত। কী করে জানো? ধান ভেনে, ঘুঁটে কুড়িয়ে। কতটুকু সেটা, একটা বি. এ পাশ করবার তুলনায়। জোর মা না হয় দুশো টাকা দিয়েছে, আর ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট, বা কলেজের প্রিন্সিপাল—ওঁরা, ওঁরা সে জায়গায় অন্ততো পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন দান খয়রাতি করে। বল দেখি, কোনটার দাম বেশি।'

এই সময় গোবিন্দ থামল। লখীন্দরও উৎকর্ণ হয়েছিল। তারপর? 'মা আমার একটা পয়সার সাহায্য পায়নি আমার কাছ থেকে কিন্তু মরবার সময় মা কী বলে গেল জানো? বললে, আবার বিয়ে করিস। করবি তো? বল দিকিন লখীন্দদাদা, এর দাম কেউ দেবে? কে মাপ করবে এই আত্মত্যাগের, এই মহত্বের? মায়ের দাম আমার কাছে ওই দুশো টাকা!'

গোবিন্দ আবার বললে, 'ওরা কিন্তু বলবে, মায়ের ভাগ্য খারাপ। কারণ সে সুযোগ করে নিতে পারেনি নিজের জন্যে। জানো লখীন্দদাদা, এই জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যারা, তারা শেখায়, সুযোগ করে নাও। সুযোগ দিতে বলে না। তাহলে নবজাত শিশুর কি হবে? বাবা-মা সেই কথা তো বললেই পারে। তা নয়, সুযোগ করে নাও, কেড়ে নাও অন্যের সুযোগ।'

অন্য কথায় সরে যায় গোবিন্দ তারপর।

'এই লাভ লাভ করে ফল কী হয়েছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অতি দুর্বল, অকেজো। তারা শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পায় নি বলে রেখে যেতে পারছে না শক্তির উত্তরাধিকার। শুধু ঘৃণা, ভালোবাসার পরিবর্তে শুধু স্বার্থপরতা রেখে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে শুধু প্রতিযোগিতা, অন্যকে ঠকিয়ে কে কতখানি আদায়

করতে পারবে, তারই চেষ্টা চলছে। একসংগে মিলবার পথ নেই। তাই শক্তিও নেই তাদের। অবশ্য, যাদের ভাগ্য ভাল (ভাগ্য কথাটায় মোচড় দিয়ে বলে গোবিন্দ) তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। আর সেই শক্তি দিয়ে অন্যের শক্তি কাড়ছে।'

তাহলে ? তাহলে কি উপায় ? মানুষের কী বাঁচবার পথ নেই ?

আছে। অতি পরিষ্কার সে পথ। আবার জটিলও বটে। একদিনে তো সব বোঝা যায় না। একটু একটু করে সব বুঝতে হয়, অনেক পড়াশোনা করতে হয়।

বারবার করে গোবিন্দ বলেছে, পড়াশুনা করো। পড়াশুনা করো। তাহলে সব বুঝতে পারবে।

ধীরে ধীরে লখীন্দরের চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। অতি স্পর্শকাতর মন ছিল তার। সাধারণ কৃষকের ধর্ম-অধর্মের জ্ঞান আর রুচিবোধ নিয়ে সে মানুষ। প্রাচীন মুরুব্বিদের কথা সে অভ্রান্ত বলে মানত। মানুষের দুঃখ কষ্ট ব্যথা তার চোখে পড়বেই। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি পাপ নীচতা তার চোখ এড়াত না। কিন্তু কোনোদিন সে মানুষকে ঘৃণা করেনি। তাদের জন্যে সমবেদনায় সে কাতর হয়ে উঠত। ব্যথাই পেতে জানত সে, আর সেই অপরিসীম ব্যথার সামনে অসহায় হয়ে চুপ করে থাকত।

কিন্তু এখন আর তার দুঃখ বোধ হয় না। বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে না কারো বেদনার কথা শুনলে। এখন তার মন চলে যায় সেই বেদনার পেছনে। সে ভাবে, ওই বেদনার কারণ হচ্ছে এই। এতো শুধু তোমার নয়। হাজার হাজার লোকের ওই এক অবস্থা।

স্বভাবতই একজনের দুঃখকে অসংখ্য লোকের মধ্যে অনুভব করলে তার বিরাটত্ব বাড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, একথা বোঝার সংগে সংগে লখীন্দরের নিজের দুঃখবোধ অনেক কমে যায়। কি যেন সে একটা অনুভব করে, সে ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো সেটা সুখানুভব, হয়তো সেটা উৎসাহ-বোধ।

কথাটা সে সতীশকে বলেছিল একদিন। ঠিক মতো গুছিয়ে মনের কথা বলতে সে পারেনি, কিন্তু কোনরকম করে জানিয়েছিল। সতীশ বললে, 'তোমার মনের ভিতরটা সবটুকু তো বুঝতে পারছি নি। তবে, জানবে তুমি, এই বোধ তোমার হয়েছে কেন না তুমি জ্ঞান লাভ করছ। এই শক্তিতেই আমরা একদিন জিতব।'

যতই দিন যায়, ততই দুঃখের মূর্তিগুলি একটু একটু করে সরে যায় যেন ওর

কাছ থেকে। অনেক পেছনে ফেলে এসেছে যেন ওগুলোকে। মনে হয়, ওগুলো একটা মরা পাহাড়, সেটাকে সরাতে কষ্ট হবে। আবর্জনা তোলার কষ্ট। কিন্তু তারপর! কি এক আশ্চর্য আনন্দে ও চোখ বন্ধ করে। মুক্তি! পরিষ্কার আলো-আকাশ-হাওয়া! আঃ!

'লখীন্দদাদা, দেখলে তো তাহলে। পড়াশুনার কি গুণ দেখলে তো। কাজেই পড়ো, আরো ভেতরে যাও, আরো তলিয়ে দেখ। আর যখনই তুমি বুঝতে পারবে ভালো করে কেন এই রকম হয়, তখনই দেখবে ঐ দুঃখের-আবর্জনা সরিয়ে ফেলা কত সহজ। কিন্তু তা করতে হলে সংকীর্ণ হলে চলবে না। বড় করে, সমস্তটা মিলিয়ে এক করে দেখতে হবে। একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঘা দিতে হবে।'

অতএব সতীশ একটা ছোট্ট বই খুলে বসে। তার প্রথম লাইন শুরু করে,

'একটা প্রেতাত্মা ইউরোপকে শাসাচ্ছে, সাম্যবাদী প্রেতাত্মা।'

লখীন্দদাদা, কাদের ভয় দেখাচ্ছে জানো। যারা মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখতে চায়। মানুষের দুঃখ কষ্টকে স্থায়ী করে রেখে যারা নিজের সুবিধে করে নিতে চায় তাদের। আর প্রেতাত্মা কী জানো। যা সত্য যা কল্যাণ তাই হচ্ছে ওদের কাছে প্রেতাত্মা। সত্য কথাকে ওরা ভূতের মত ভয় করে।

লখীন্দর ঘাড় নাড়তে থাকে।

'বুঝেছি, বুঝেছি। ইটা আমিও দেখেছি। সাধু-সন্ন্যাসীর ভয় নাই, কোথাও তাদের ভয় নাই। আর যত সব বড়লোক বদমাইস, ত ওদের রাত্রে ঘুম নাই। ভয়ে ওরা আধ-মরা হয়ে থাকে।'

হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু কেন ওরা এমন হল। মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার ওরা পেল কোথা থেকে। বলি শোন। এই বইয়েই আছে। মানুষ যখন অতি প্রাচীন কালে অসভ্য ছিল, তখন তারা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করত না। ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই হত না তখন। তারপর এল মানুষের অহংভাব। কেবলমাত্র নিজেকে দেখতে শিখল মানুষ, ভাবতে লাগল নিজের কথা। কিন্তু যারা নিজের কথা ভাবলে, বুঝলে নিজের কথা তখন আর তাদের পায় কে। অন্যকে বুঝবার সুযোগ তারা দিলে না। কেবল নিজের কোলে ঝোল টানল অন্যের ভাগ থেকে। অন্যে যদি গেল তো তোমার কী। তুমি বাঁচলেই হল। আর ক্রমাগত সুখ-সুবিধে যদি পেতে চাও অন্যের আনন্দ কাড়ো। ক্রমাগত তাদের খিদে বেড়েই গেল।

এই ক্ষুধার মূর্তি কী জানো লখীন্দদা? ব্যবসা। এই ব্যবসাই লাভের লোভে মানুষকে মারে। প্রাণে নয়, তার মনটাকে নষ্ট করে। তাকে নির্জীব করে দেয়। তার মধ্যে যা কিছু ভালো সব নিংড়ে তাকে একটা কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখে। আর যখন খুশি যেমন খুশি নাচাতে চায় তাদের। ক্রমাগত তাদের শুষে নিলে এক সময় তাদের আর কাজে লাগানো যায় না। তারপর সেই শোষণের চৌহদ্দি বাড়ে, প্রথমে নিজের দেশ, তারপর বিদেশ। তার ফলেই তো উপনিবেশ হল, সাম্রাজ্য হল।

ভারতবর্ষের কথা জানো তুমি? ইংরেজ এদেশে এসে এদেশের মানুষ মেরে তাদের মাল চালালে। জানো কিসের জোরে? নতুন মাল দিয়ে নতুন অস্ত্র দিয়ে। আর সেই নতুন মাল আর অস্ত্র পেলো কোত্থেকে তারা? না বিত্তে থেকে। বিত্তেকে খাটিয়ে তারা মানুষ মারে। বিত্তেকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগায় না।

কিন্তু আমরা কি তা সহ্য করব? বিত্তেয় আমরা ওদেরও আগে। মানুষের আত্মজ্ঞান তো কয়েকজনের জন্যে নয়। সবার জন্যে। সবাইকে সে-জ্ঞান না দিলে সেটা হল অহং, আর অহং কি জানো? নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরা। ওদের অবস্থা হচ্ছে তাই। লোভ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ওঠে, তখন ওরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে। যুদ্ধ করে। এতেই ওরা মরবে।

তাই ওই বিত্তে, ওদের সব আয়োজন সবার জন্যে আমরা চাই। এই ব্যবস্থাটা বদলাব আমরা। মানুষকে বাঁচাও, তুমিও বাঁচবে। তা না হলে তোমার ভাগ্যে অশান্তি, কাটাকাটি, যুদ্ধ। বলো, কোনটা ঠিক।

কিন্তু এই সত্যি কথাটাকে সইতে পারে না ওরা। ভূতের মতো ভয় করে।...

প্রায় তিন মাসের ওপর হল। লখীন্দর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ওর প্রাণের এক ধারালো উৎসাহ যতই বাড়ে, ওর শরীর ততই কাহিল হয়ে যায়।

রাস্তা হাঁটবার সময় ওকে অত্যন্ত আত্মগত দেখায়। কী যে চিন্তা করে ওই জানে। কিন্তু একটা হাসি দেখা যায় ওর মুখে। সে হাসি বিষণ্ন না উজ্জ্বল ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু ভালো করে কারো সংগে কথা বলে না সে। একটু বেশি পরিশ্রম করলে ও হাঁপিয়ে ওঠে।

ভাত খেতে বসে পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা আর সে বলে না। একদিন একটা ব্যাপার ঘটল এই নিয়ে। স্ত্রী গৌরীবালা ওর পায়ে ধরে মেঝের

ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল। ভাত খেয়ে লখীন্দর আঁচাতে যাবে বলে উঠছে, এমন সময় দড়াম করে ও পড়ল এসে।

লখীন্দর মহা বিব্রত হয়। কি করবে অনেকক্ষণ ও কিছুই ঠিক করতে পারে না। এক সময় বলে, 'ছাড়, পা-টা ছাড়। কি হইচে তোমার বল।' কিন্তু কিছুতেই গৌরীও পা ছাড়ে না। শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

ষোলো

গৌরী এমন আচরণ কখনো করে নি। কোনদিন মুখ ফুটে কোন কিছু বলতে পারত না ও। কতবার লখীন্দর তাকে বলেছে, 'কেমন ধারা মেয়ে তুমি। তুমি লিবেনি আমার ঠিঙে কিছু মেগে? তারপর নিজেই হয়তো কিনে এনেছে একজোড়া নক্সী শাঁখা, নয়তো ফ্যাসান-মাফিক কোন শাড়ি।

গৌরী কিন্তু বলেছে, 'ছিঃ, মেয়েমানুষ কি আবার লিজের তরে জিনিস মেগে লিবে, ছিঃ। সে তুমি যা দিবে তাই আমার ঢের।' কোনো দিন নিজেকে কারো কাছে প্রকাশ করেনি। এক একবার হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে বলেছে, 'এই যে গেরস্তর ঘরকন্না দুবেলা ধানভানা-ভাত-রাঁধা, ই আমার দ্বারা হবে নি আর। ই আমার দ্বারা হবে নি। রইল তোমাদের সব, আমি বাপের ঘর চললম।' একদিনের জন্যে চলেও যাবে হয়তো, এইতো ও গাঁয়ে বাপের বাড়ি, তার পরের দিন সক্কাল-বেলা এসে বলবে, 'জানি যে আমি। ভাত রাঁধবে কে রাত্তে, ত সবাই মুড়ি খেইচ। হ্যাঁ'...তারপর সব চুপচাপ। কেউ কোনদিন ওর কথা চিন্তা করে দেখেনি।

আজ কিন্তু লখীন্দর ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

'ওগো, আমি আর ইটা সহ্য করতে পারিনি। তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। লোকে কি বলে জান। বলে, তোদের সব্বনাশ হবে। তোমাকে ধরে লিয়ে যাবে সিপাই। তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি কি বই পড়, ঐ দেখলে তোমাকে আর রাখবেনি।'

একেবারে নয়। অতি ধীরে ধীরে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বললে গৌরী। অনেক কথাই জড়িয়ে গেল। উদ্বেগ আর ভয়ে পরিষ্কার করে উচ্চারণ করতে পারছিল না সে।

'তুমি ছ্যানাগুলার দিকে একবার চাও। তোমার অধীর আর তোমার কাছে যায়নি, টুকি কেমন রোগা হয়ে গেছে দেখছ। আর সুধীর যে মধ্যে মধ্যে ঘর এসেনি গো। রাত্তে সে কোথা থাকে। তুমি তোমার সংসার ল্যাও। ই

দেখে আমি কেমন করে বাঁচব।' কান্নায় বেগ বাড়ে। সমস্ত শরীরটা ওর কেঁপে উঠছে।

বছরের পর বছর ধরে যে সংসার গড়ে উঠেছে, সে-সংসার নাড়া খেল আজ। আজ লখীন্দরের স্ত্রী আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লখীন্দর কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে বুঝতে পারে না। একে আজন্ম ও অশিক্ষিত, কোন রকম মস্তিষ্ক চর্চা খুবই কম করেছে ওরা। যা কিছু ব্যাপার সবেই তো প্রায় হৃদয়ের প্রাধান্য। তাই সহসা ও কিছু বলতে পারে না। অন্যান্য বারের মতো গৌরীকে ধমক দিয়ে থামাতেও পারে না ও। সান্ত্বনাও পারে না দিতে।

সব চেয়ে ওকে বিমূঢ় করে তোলে ব্যাপারটার আকস্মিকতা। একবারও সে ভাবেনি যে, তার স্ত্রী এইভাবে তার সম্বন্ধে চিন্তা করছে। তার সংসারে এমন একটা কিছু ঘটেছে. যার জন্যে সেই দায়ী। লখীন্দর তখন আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকে। এক সময় রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ও আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে ছেলে দুটোকে দেখবার জন্যে।

ওদের মাথা-সিথানে একটা পিদিম জ্বালা। শোবার সময় গৌরী বোধ হয় উস্কে দিয়েছিল। অধীর মাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। আর এদিকে টুকির গায়ে একটা কাঁথা জড়ানো। শোবার দোষে টুকির ডান পাটা বেরিয়ে গেছে কাঁথার বাইরে, কাঁধের বুকের অনেকটা খোলা। 'ছিঃ ছিঃ, এইতো ফাল্গুনের মাঝামাঝি, এমন সময় শীতে ওর কষ্ট হয় না।'

কাছে এসে আস্তে আস্তে কাঁথাটা ঠিক করে দিল লখীন্দর। কিন্তু কি হয়েছে ওর চেহারার অবস্থা? গাল দুটো পাতলা, শুকিয়ে গেছে। গলার কাছটা ধুক ধুক করছে। ঘুমের ঘোরে দু'একবার জিব নেড়ে ঢোক গিলল টুকি। বোধ হয় ওর তেষ্টা পেয়েছে।

লখীন্দর অতি সন্তর্পণে জাগাল ওকে। আস্তে আস্তে বললে, 'টুকি, চল মা, আমার কাছে শুবি।' এই রকম ডাকে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল টুকি। আর এই ডাক পেলে আনন্দে ছুটে যেত ও। আজও চলে গেল ওপরে।

লখীন্দর ওকে শুইয়ে নিজের লেপটা মুড়ি দিলে, নিজে বসে রইল ওর পাশে।

'হ্যাঁ মা টুকি, আমার উবরে তোরা রাগ করেছু, লয়?'

'না ত রাগ করিনি। কিন্তু দেখ, তুমি আর আমাদিকে ভালবাসনি। আমরা তোমার পর হয়ে গেছি। তুমি আর আমাদিকে দেখনি বলে মা রোজ কাঁদে। রোজ কাঁদে।'

হঠাৎ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসে সব। গৌরীকে নতুন চোখ দিয়ে দেখে লখীন্দর। এতদিন নিজেকে পেছনে রেখে কাজ করেছে গৌরী। কী মহৎ ভালোবাসা দিয়ে ও সংসারটা গড়ে তুলেছে। এত সব তো তারই জন্যে। পাকে পাকে জড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ গৌরীর সেই কান্না-ভরা চোখ দুটো মনে পড়ে।

'বাবা, তুমি কি পড় সব রোজ! তুমি আর উ সব পড়বেনি।' লেপের ভেতর থেকে হাত বের করে বাবার হাত ধরে টুকি। 'না তুমি আর উ সব পড়তে পাবেনি। হঁ্যা।'

'না, মা। উ সব আর পড়বনি…'

লখীন্দর জানে না ও কি বলছে। ঠিক এখনই ও একটি নিবিড় এবং তীব্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। এখন যেন মনে হয়, ওদের সবাইকে বুকে করে রাখে। সে সংসারী মানুষ, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তার ওসব চলে না।

সত্যিই তো। যদি তার কিছু হয়? যদি মারা যায় সে? তাহলে তার সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সুধীর একলা, তাছাড়া সে ছেলে মানুষ, সে কি করে চালাবে? না হয় না, তার ওসব করা চলে না।

'মা টুকি তুই ঘুমি' পড়। ঘুমা তুই' বলে ওর মাথার চুলে, মুখে হাত বুলিয়ে দেয় ও। লখীন্দরের বিশ্বাস হয়, হঁ্যা, এসব কাজে বিপদ আছে। সংসারী মানুষদের পক্ষে এ সব কাজ নয়। সেদিন সতীশের সংগে তার কথাবার্তা মনে পড়ে। সতীশকে হেসে বলেছিল সে, 'ত ভাই, এবার একটা বিয়ে-থা করে ফেল। লাল টুকটুকে বউ আসুক একটা। তারপর দাদা-নাতিতে মিলে কদিন খুব আহ্লাদ করা যাবে।' তার জবাবে সতীশ বলেছিল, 'তা হয় না, লখীন্দদাদা। ওসব আমাদের জন্যে নয়। বিয়ে থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়ি যদি, তাহলে? তাহলে কাজ করব কখন।' লখীন্দর বলেছিল, 'না ভাই, ই কথা তোমার ঠিক লয়। সংসার ধম্ম করতে হবে বৈকি। অত বড় যে ভোলা মহেশ্বর, তারও ত পাব্বতী আছে। ত এই হল ব্যাপার। সংসার ধম্ম খুব বড় ধম্ম, দাদা। উটি নালে মানুষ পবিত্তি হবেনি। হঁ্যা।'

সে কথা ভুল বলেছিল, লখীন্দর। সতীশের কথাই ঠিক। কিন্তু কি করে তাহলে ওরা সংসারী লোককে দলে টানে?

এক এক করে সমস্ত ভেবে দেখে লখীন্দর। কোথায় একটু একটু করে ভেসে চলেছে সে? গেল বছরের মজুর-আন্দোলনের কথা ওর মনে পড়ে। তখন অন্যান্য মজুরদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। তারা ধর্মঘট করেছিল।

তার জন্যে কম শাস্তি পায়নি ওরা। ভাগ্যক্রমে সে নিজে কিছু বিপদে পড়েনি। তারপর, এই সেদিন মন্টু দিগারের জমির ব্যাপারটা ঘটে গেল। লাঠির ঘাটা যদি জোর হত আরো? তাহলে?

তাছাড়া, এদের নীতিই তো হচ্ছে এই। লড়াই করে আদায় করা। তার জন্যে যে কোন বিপদের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। সে তো দেখেছে, সেবার মজুর আন্দোলনের সময়, মেয়েদের সংগে পর্যন্ত সংঘর্ষ হয়েছে পুলিসের। মান-ইজ্জত ছেড়ে মেয়েদেরকেও যদি নেমে আসতে হয়, তাহলে একটা ওলট-পালট হবেই। ওদিকে চাষীরা তো ক্ষেপে আছে। তারা তো বলে, বাবা, লাঠি দাও, বন্দুক দাও। লড়াই তারা করতে চায়। আর একথা তো সত্যি, দু একজায়গায় রাত্রে লাঠি খেলা হয়। কোথায় যে কি হচ্ছে সে সব খবর রাখে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে, একটা কিছু চলছে ভেতরে ভেতরে। মন্টু দিগারের জমি নিয়ে মারামারির পর, কয়েক জন লখীন্দরকে বলেছিল, 'এখন না হয় লাঠিতে ব্যাপারটা মিটল। কিন্তু পুলিসের সামনে দাঁড়াবে কি করে। এ্যাঁ?' তখন ওসব কথায় কান দেয়নি সে। তখন তার বুকে সাহস ছিল। মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, যাই ঘটুক না কেন, যা সৎ কাজ তা করতেই হবে। এখন কিন্তু সমস্ত কিছুর অতি বাস্তব রূপটি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। না, সে পারবে না। পারবে না ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ঠিক তার পরের দিন থেকে যথারীতি আগেকার মতো জীবন শুরু করে সে। নিজের কাজ নিয়ে মেতে থাকে। রাত্রে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সে সময় অধীরকে মানসাংক করায়, বা কখনো কখনো রামায়ণ পড়ে। লাউ-মাচা, গোয়াল-ঘর, মরাইয়ের চাল, এই নিয়ে বিকেলের অবসর কাটায় সে।

কিন্তু কয়েক দিন মাত্র। তারপর তার মনের এই উৎসাহ কোথায় উবে যায়। ক্রমে আবার গাফিলতি আসে। পুনরায় সে পড়াশুনো করতে বা কৃষক-সভার কাজের সংগে যোগ রাখতে পারে না বটে, কিন্তু তার প্রাত্যহিক কাজ ভালো লাগে না।

বিশেষ করে একটা ব্যাপারে সে অত্যন্ত মনমরা হয়ে উঠে। সে তার বড় ছেলে সুধীরের আচরণ। এই ক'মাস সুধীর তার সঙ্গে প্রায় কথা বলেনি। সেদিকে খেয়ালও করত না লখীন্দর। কিন্তু তার সম্বন্ধে নতুন কথা শুনে তার লজ্জার সীমা থাকে না।

সুধীর প্রায় সমস্ত গ্রামটাকে অস্থির করে তুলেছে। জোর করে টাকা আদায় করছে আগামী দোল-পূর্ণিমায় শীতলা পূজার জন্যে। সে এবারে একটা

কিছু দেখাবে। কিন্তু টাকা আদায় করার পদ্ধতিটা শোনো। মানুষের পাপ কাজের দাম হিসেবে টাকা নেয় সে। মানুষ যদি কোথাও কোন পাপ করল তো ওদের দল আছে, তার চোখ এড়াবে না। কেউ অস্বীকার করলে, শাসাবে। বলবে, যদি না দাও, তাহলে তোমার আর তোমার পরিবারের সবটুকু কেচ্ছা টেনে বের করব। মা-মাসি-বোন-বউ নিয়ে ঘর করো তোমরা। সাবধান হও। তাছাড়া দুর্নাম বানাতে কতক্ষণ, আর সে নিয়ে হৈ হৈ পড়তেই বা কতক্ষণ। পূজোর দিন যতই এগিয়ে আসে, ওদের জুলুম ততই বাড়ে। লোকজন এসে লখীন্দরকে ধরলে সে বলে, 'আমি জানিনি বাবু, আমি জানিনি। আমাকে বলনি উসব।' আর ব্যথায় সে বিবর্ণ হয়ে যায়।

একদিন সে ছেলেকে ডেকে ধমকায়। আর চুপ করে থাকতে সে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় রটে গিয়েছে, তার ছেলে 'খেমটা-নাচ' করাবে, কবি বসাবে। যত রকম বাজনা বাদ্যি আছে সব করবে। এটা কি করে সইবে লখীন্দর। যা কোন কালে হয়নি, সেটা এবারে হবে কেন। আর তার দায়িত্ব তার ছেলের উপরেই পড়বে বা কেন।

'ওরে, উসব খারাপ কাজ করতে নাই। খারাপ কাজ করলে চরিত্তি নষ্ট হয়। তার চেয়ে তোরা যত পারু বাজনা-বাদ্যি কর। থালে লোকে কিছু বলবেনি।'

সুধীর চটে লাল হয়। 'কুন শালা বলবে আমার চরিত্তি খারাপ। কুন শালার ঘরে লজর দিছি আমি বলু সে।'

সুধীরের ঐ মুখ-পাতলা রোগ গেল না। বাবার কাছে মুখ খাটো করতে নেই, একথা কিছুতেই মনে রাখবে না সে।

'ওরে সে কথা লয়। তোদের এই কাঁচা বয়েস, কখন মানুষের মতিগতি টলে কেউ সে কথা বলতে পারেনি। ত একটু সাবধানে থাকবি।'

সুধীরকে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই যখন, তখন যতটা পারে ওকে সাবধান করে দিতে চায় লখীন্দর। সুধীর কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দেয়। বলে, 'উ মতিগতি আমার ঠিক থাকবে। সে লিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবেনি...'

পূজো কাটল মহা ধুমধাম করে। কদিন গাঁয়ের লোক খুব মাতামাতি করলে। পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সুধীর ধন্যবাদ পেল অনেক। হ্যাঁ, একটা ছেলে বটে। লখীন্দর কিন্তু কিছুতেই এটাকে প্রসন্ন ভাবে নেয়নি। কি করেছে সুধীর? শুধু কয়েকটা ছোঁড়াকে মাতিয়েছে মদ

খাইয়ে। তাই অন্যান্য বছরের মতো সে মন্দিরে যায়নি মায়ের 'বিল্বপত্র' নিতে। বাড়ি থেকে প্রণাম জানিয়ে বলেছে, 'মা, ওকে সুমতি দাও। ওকে ভাল কর, মা।'

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হয় সে সবাই মেতেছে এই ব্যাপারে। এমন কি শীরষের জমিদার বাবু পর্যন্ত পূজোর সময় এসেছিলেন। বলে গেছেন, ছেলে-ছোকরারা যদি এই নিয়ে আনন্দ পায় তো তা নিয়ে আমাদের বলবার কি আছে। সুধীরকে ডেকে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধা হয়। কোনো গোলমাল যেন না হয়। তাছাড়া সুধীরকে দেখা করতে বলেছেন একবার তাঁর সাথে। উৎসাহ দিয়ে গেছেন পিঠ চাপড়ে।

এটা লখীন্দর বোঝে না। তার এই ক'দিনের পড়াশুনোর ফলে ওদেরকে শত্রু বলে ভাবতে শিখেছে ও, কিন্তু এই রকম একটা কাজে ওরা উৎসাহ দেবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। হয়তো সে নিজেই ভুল বুঝেছে। ছেলে হয়তো তার ঠিকই করছে। কিন্তু যখনই সে ভাবে যে এই পূজোর জন্যে পয়সা আদায়টা ভালভাবে হয়নি, জোর করে মানুষের পাপের সুযোগ নিয়ে মোটা মোটা টাকা ভয় দেখিয়ে আদায় হয়েছে, তখন কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না। তাতে যতই তার ছেলের গ্রামের মধ্যে প্রতিপত্তি বাড়ুক না কেন সে ব্যথা বোধ করে। কেমন করে যেন মনে হয়, এটা তারই লজ্জা।

কিন্তু এই সময় দুটি আকস্মিক ঘটনাতে সুধীরের কার্যক্রমে কেমন যেন ভাঁটা পড়ে। প্রথমটা হল এই। সেই বছর প্রকিওরমেন্ট শুরু হয়েছে। বাঁধা দামে ধান বিক্রী করতে বাধ্য করা হচ্ছে কৃষকদের। সরকারের গুদামে সেই দামে ধান পৌঁছে দিতে হবে। এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ উঠল চারদিকে। কৃষকরা মাথা নেড়ে বললে, না, তা হতেই পারে না। কৃষকদের মূলধনই উস্থল হবে না তাতে।

সরকার কিন্তু শুনল না সে কথা। যেখান থেকে পারে যেমন করে পারে তারা আদায় করতে লাগল ধান। সুধীর গোরুর গাড়ীতে করে ঘাটালে ধান বেচতে যাচ্ছিল। ঘাটাল পৌঁছোবার মাইল তিন আগে সরকারের লোক সে ধান আটক করে নিয়েছে। বাঁধা হিসেবে দামও দিয়েছে অবিশ্যি।

সুধীর সেখান থেকে ফিরে এসেছে। কথা ছিল ধান বিক্রী হলে সেই টাকার কিছু খরচ করে ঘাটাল থেকে সওদা করে আনবে। অধীরের নতুন বই, টুকী আর তার মায়ের জন্যে শাড়ি, একটা নতুন কোদাল। কিন্তু কিছুই কেনেনি সে, ঘাটাল পর্যন্ত যায়নি। শুধু টাকাগুলি বাবার হাতে দিয়ে চলে গেল। একটা কথা পর্যন্ত বলল না।

প্রাণে বড় বেশি লেগেছে তার। এতদিন কোথাও সে বেকুব হয়নি। সবাই তার কথাই শুনে এসেছে। কিন্তু আজ তাকে অত্যন্ত অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হল। তাই প্রায় সময়ই শুয়ে পড়ে থাকত সে। কারও সাথে কথা বলত না। বাইরেও যেত না। আর এই সময় কৃষকদের প্রায় কিছু কাজ-কর্ম থাকেও না।

লখীন্দর খানিকটে আনন্দিতই হল বলতে হবে। হোক তার টাকার লোকসান, কিন্তু সুধীর যে নিজের মনে ব্যথা পেয়েছে তাতে হয়তো ও খানিকটে শান্ত হবে। ওকে সে বললে, 'তা সবাই যখন দিচ্ছে ত আমরাও না হয় দিলম। তাতে অমন ভেঙে পড়লে চলবেনি। মনে কষ্ট করবেনি বাবা, খালে শরীর লষ্ট হবে।' কিন্তু সুধীর কোন উচ্চবাচ্য করল না।

তা নাই করুক, লখীন্দর নিজেই ঘাটাল গেল। সেখানে গিয়ে যে সমস্ত জিনিস কেনবার সমস্ত কিনল। তারপর বাড়ি ফিরে আসে ও। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কিন্তু কী জানি কেন ওর মাথার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। এসে ও উঠোনটায় বসে।

সুধীর সেই মাত্র বাড়ি ঢুকেছে, ওর কাছে ছুটে আসে।

'জান বাবা, আজ কি করেছি? শীরষেতে গেছলম মাসীদের ঘর। ত সেখেনে পুলিসের সংগে হয়ে গেল এক চোট—শালারা জোর করে ধান লিতে এইছিল, ত দিলম হটি' ওদের। বলি শুন...' অনেক কথা ছিল। সমস্তটা বলতে বেশ কিছু শান্ত হবার দরকার, সময়ও চাই।

কিন্তু লখীন্দর কিছুই শুনতে পায় না ওর কথা। কেবলই ও 'মাথা যাই'...'মাথা যাই' করতে থাকে। তারপর শুয়ে পড়ে উঠোনটাতে। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা।

গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ বললেন, অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তায় এবং মানসিক পরিশ্রমে ওর শিরঃপীড়া হয়েছে। ঝাঁকরার ডাক্তারও তাই বললেন।

সে যাই হোক, কিন্তু ওর অল্প একটু সেরে উঠতেও প্রায় মাস খানেক লাগল।

সতেরো

নীরবে গ্রামের ঘটনাটা সরকারের প্রকিওরমেণ্ট কার্যক্রম নিয়ে ঘটল। সরকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষকেরা সাধারণত যে-ভাবে ধান বিক্রী করে সেভাবে চলবে না। একটা নির্দিষ্ট দামে সরকারের গুদামে ধান পৌঁছে দিতে হবে। অবিশ্যি ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটিয়ে যেটা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটাই দিতে হবে। নানা দিক দিয়ে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সর্বপ্রথম দাম নিয়ে কথা ওঠে। যে দাম সরকার বেঁধে দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত কম। ওতে আসলই উসুল হয় না, লাভ তো পরের কথা। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসলটা যদিও বা উসুল হয়, তাতেই বা কি। কৃষকদের হাতে তো পয়সা চাই কিছু, খরচ-খরচা নিশ্চয়ই আছে। পাল-পার্বণে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করতে হয়। সারা বছরের কাপড়-চোপড় আছে। মহাজনের সুদ, জমির খাজনা আছে। তাছাড়াও রয়েছে অসুখ বিসুখ; কার ভাগ্যে কোন বছরে অসুখের খাতে কতো খরচ হবে, একথা কে বলতে পারে। এমনও তো হয়, মানুষের জমি জায়গা ভিটে-মাটি সব শেষ হল, সেও শেষ হল। আর এরকম হামেশাই ঘটে। এসব তো গেল প্রয়োজনের দিক। এছাড়া মানুষের সখ আছে, আহ্লাদও আছে। যদি সখ-আহ্লাদের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর জন্যেই অন্তত টাকাকড়ির প্রয়োজন।

সরকার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁদের লোক এসে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গেলেন। কার কত ধান আছে সেটার হিসেব নেওয়া হল। তার নিজস্ব প্রয়োজন কতখানি সেটারও হিসেব হয়। তারপর বাকী ধানটুকু উদ্বৃত্ত বলে লিখে নেওয়া হল।

এ ব্যাপারে কৃষকদের নালিশ শোনা যায়।

যে ভাবে ধান মাপা হচ্ছে সেটা বিশ্বাস যোগ্য নয়। দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন দেখতে অভ্যস্ত কৃষকেরা। কিন্তু ফিতে দিয়ে মেপে ওজন বোঝা যায়, এটা কোথাও কেউ শোনেনি। ওদের ধারণা, ওদের ঠকানোর জন্যে এই ব্যবস্থা করা

হয়েছে। যেখানে কৃষক জানে তার একশো মণ ধান আছে, সেখানে একশো পঁচিশ মণ ধরবার মানে কি।

তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়োজনের খাতে অমন মেপে মেপে মাথা পিছু হিসেব করলে চলে? অতিথি-অভ্যাগত কুটুম্ব-বান্ধব সবারই আছে, তাদের জন্যে ধান আবার কোথায় পাবে তারা? এ ছাড়া বারো মাসে তের পার্বণ. পিঠে-পুলি, সওগাত যৌতুক তো আছেই। যদি বলেন এখন সময় বড় খারাপ পড়েছে, ওসব বন্ধ রাখা উচিত। কই, সে রকম তো মনে হয় না। গেল বারে অত বড় যে দুর্ভিক্ষ গেল, তখনই কি আর পাল-পার্বণ বন্ধ রেখেছিল কেউ?

এতো গেল হিসেব-নিকেশের দিক। কিন্তু সব চেয়ে কৃষকদের যেটা লেগেছে সেটা হল সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা মা-লক্ষ্মীর অবমাননা।- জুতো পায়ে দিয়ে খামারে ওঠা বা ধান মাড়ানো বাপ-ঠাকুর্দার আমলে ওরা শোনেইনি কখনো, এখন কিন্তু স্বচক্ষে দেখতে হচ্ছে। একটা দারুণ অমংগল যে ঘটবেই সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এত সব সত্ত্বেও যথারীতি সরকারের নির্দেশ আসে, সরকারের লোক যাতায়াত করে। বাধ্য হয়েই যে তাদের এটা মেনে নিতেই হবে সে সম্বন্ধে ওদের আর কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ওরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করে।

এই সময় সারা গাঁয়ে একদিন পোষ্টার পড়ে, গাছের গুঁড়িতে, ঘরের দেওয়ালে, 'জান দিব তবু ধান দিব না।' জান এবং ধানের সংগে যে একটি অতি নিকট সম্পর্ক আছে, সে-কথা ওরা ভালোভাবেই জানে। কিন্তু ধানের বদলে জান দেওয়া ব্যাপারটা তো অতি সহজে হয় না। অথচ সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে হলে এছাড়া আর উপায় নেই। আর, অমান্য না করলেও তো ধান দিতে হয়, সেটা বেঁচে মরারই সামিল। কী করবে এ-সম্বন্ধে ওরা কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, আর বিভ্রান্ত হলে যা হয় ভেতরের গরম ওদের বেড়ে যায়। অতি তুচ্ছ কারণে লোকের সংগে ঝগড়া করে, বউ-ছেলেকে ধরে ঠেঙায়। অজুহাতে বা বিনা অজুহাতেও।

এই গোলমালের মধ্যেও এখানে ওখানে আলোচনা চলে, কী ভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। যাদের উদ্বৃত্ত ধান আছে তাদেরই সব চেয়ে ক্ষতি, তাদেরই এ-নিয়ে সব চেয়ে বেশি মাথা-ব্যথা। কিন্তু তাদের বুকে অত সাহস নেই। হাজার হোক অল্প-স্বল্প গুছনো সংসার তাদের, দুটো পাঁচটা আসবাব পত্র আছেই, সেই সংগে গড়ে ওঠা প্রাণের মায়া একটু বেশি রকম।

একটা কিছু সম্ভব হলেও হতে পারত, যদি দিন-মজুর চাষীরাও ওদের

পেছনে এসে দাঁড়াত। তারা কিন্তু অতটা আগ্রহ দেখালে না। বললে, 'আমাদের কি। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।'

এই সময় গোবিন্দ, সতীশ আর তাদের অন্যান্য কর্মীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওদের বোঝায়। ব্যাপারটা তো ওইভাবে দেখা যায় না। দেখা উচিতও নয়। যারা জুলুম করছে তারা যে আমাদের সবারই শত্রু একথা তো সবাই জানে। সেবারে ক্ষেতমজুর আন্দোলন আমরা করলাম, সেটা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো নয়, অথচ শান্তি-শৃঙ্খলার নামে আমাদের ওরা আক্রমণ করলে। আমাদের কর্মীদের জেলে পুরলে। আজ হয়তো প্রত্যক্ষভাবে দিন-মজুরদের ওপর আক্রমণ আসছে না, কিন্তু অন্যদিন আসবে।

অতএব সঙ্ঘর্ষ বাধে।

সরকারের নির্দেশ অমান্য করল নীরবে গ্রাম। ইতিমধ্যে দু'একজন যারা ধান দিয়ে দিয়েছিল, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু অধিকাংশই ধান পৌঁছে দিল না।

তারপর একদিন সরকারের লোকজন সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আপসে ধান না দিলে জোর করে নেওয়া হবে।

গ্রামের লোকজন এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। 'বাবু, তা কি আর হয়, আপনারা বিবেচনা করে দেখেন, ঐ দামে ধান বিক্রী করলে চলে কি করে।'

মাসি-বাড়ি থেকে সুধীর লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওর দেখাদেখি অন্য ছেলে ছোকরারাও ছুটতে থাকে। সুধীর এখন অল্প-বিস্তর বিখ্যাত লোক। ওর ভক্ত এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে অনেক ছড়িয়ে আছে। তারা ওর পাশে ভিড় করে দাঁড়ায়।

ও বলে, 'উটি হচ্ছেনি, বাজার দরে ধান কিন, ত দিয়ে দিচ্ছি।'

ও দাবি করে, 'আমাদিকে বুঝিয়ে দাও দিকি, ঐ দামে আমাদের চলে কি করে।'

লোকজন কম জোটেনি। বলতে গেলে পুলিসের ঐ ছোট্ট দলটুকু এক রকম ঘেরাও হয়েই গিয়েছিল। তাই অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, 'কিন্তু আমরা তার কি জানি। আমরা তো হুকুমের চাকর, আমাদের সরকার যা বলবেন, তাই করতে হবে...'

'তা তুমি যদি জানবেনি, ত তুমি এলে কেনে। তোমার সরকারকেই পাঠি দাওগে।'

সবাই হো-হো করে হাসে।

এই হাসির একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বয়স্ক লোকেরা কৌতূহলেই হোক, বা যে জন্যেই হোক ওদের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু সব সময়েই একটা ভারী আশংকা ছিল। এখন ওরা খানিকটে হাল্কা বোধ করে। ছোকরারা, বিশেষ-করে সুধীরের ভক্তরা আরো বাচাল হয়ে ওঠে। নানারকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তাঁদের।

অফিসার-ইন-চার্জ অতি সতর্ক লোক। এ সমস্ত প্রশ্নোত্তরের ভিড়ে তিনি লক্ষ্য করছেন ঠিকই যে, চারপাশে তখন লোকের ভিড় বাড়ছে। বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় লোক আসছে, দূরে মাঠের মধ্যে দেখা যায় অন্য গ্রাম থেকে লোক ছুটে আসছে। হয়তো কৌতূহলবশে আসছে ওরা, কিন্তু জনতা যত বাড়ে, বিপদের সম্ভাবনা ততই বেশি। এখনই একটা কিছু করা দরকার।

সামনে সুধীর দাঁড়িয়ে নানা রকম বে-ধড়ক প্রশ্ন করে চলেছে, আর, ওর কথাবার্তা উৎসাহিত করছে জনতাকে। বললেন তিনি, 'তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।'

'হুঁঃ, করলেই হল আর কি। ধানের কি হল সেইটে বল আগে।'

জনতার মধ্যে কেউ কেউ হাসল। কেউ কেউ এমন শব্দ করল যে সেটা আর্তনাদ না বিস্ময় তা বোঝা গেল না।

অফিসার বিব্রত বোধ করলেন। আর দেরী করা উচিত নয়।

'আমি এই জমায়েত বে-আইনী ঘোষণা করলাম।'

বলে কি ইংগিত করলেন যেন। বন্দুক-ধারীরা সার দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। জনতার দিকে মুখ করে, নিজেদের দিকে পেছন করে পরস্পর।

'এখান থেকে চলে যাও। হঠো। বাড়ি যাও।' ক্রমাগত লাল হয়ে উঠ্ছেন অফিসার।

'যদি না যাই বাপু। কি করবে।'

'শাট আপ।' অফিসার রুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইলেন ওকে। সুধীর রুলটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। উনি রিভলবার বের করার আগেই হাতটা ধরে ফেলল ওঁর।

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। বিরাট জনতা আর কয়েকজন মাত্র পুলিস বলে সহসাই গুলি করতে সাহস পায় না ওরা।

আত্মরক্ষা করে কোন রকমে পালাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হট্টগোলে ওদের দুটো বন্দুক খোয়া যায়। জনতা ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে।......

অফিসার-ইন-চার্জ সেদিন রাত্রে তাঁর বাসায় প্রায় উন্মাদের মতো পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে চুল টেনে ছিঁড়বার উদ্যোগও ছিল তাঁর।

অমন একটা বড় ব্যাপার ঘটবে, সেটা তিনি আশংকা করতে পারেননি। কেউই পারত না। অত অল্প পুলিস নিয়ে যাওয়াটা যে কী নির্বুদ্ধিতা হয়েছে, সেটা বলা যায় না। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমন হবে সেটা কে বলতে পারত। এখন সমস্ত দোষটা তাঁর ওপরই পড়বে। দুটো বন্দুক খোয়া গিয়েছে। এটা তাঁর নামে রেকর্ড হয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎটা কি? ছিঃ ছিঃ।

তবে, এই ব্যাপার নিয়ে এমন কিছু যদি করা যায়, যা ঐ কলংকটাকে (হ্যাঁ, কলংক ছাড়া আর কি) ব্যালান্স করবে, তা হলে অন্য কথা। কি এমন করা যায়? অবিশ্যি থানায় পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিস দল পাঠিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত এলাকাটাকে ঘিরে রাখবে। তাছাড়া আর কিছু ঠিক এখনই করা যায় না।

এক একবার তাঁর মনে হয়, অত অরক্ষিতভাবে না গেলেও হত। সহসা তাঁর মনে পড়ে, এই কয়েকদিন আগেই দু'একদিনের এদিক-ওদিকে আরো দুটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একটা অবিশ্যি ঘটেছে আমনপুরে। সেটা তাঁর এলাকায় নয়। আর একটা ধানগাছিয়ায় ঘটেছে।

আমনপুরের কাছারিতে এক প্রজার হেলে-বলদ আটকেছিল জমিদার বাবুরা। প্রজাটি খাজনা দিতে পারেনি বলে। তো প্রায় পাঁচশো লোক এসে সেই বলদ জোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে।

আর ধানগাছিয়ার ব্যাপারটাই বা কি। প্রায় হাজারখানেক লোক নব মল্লিকের ধান লুঠ করতে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে পুলিস-পেট্রল হাজির হয় সেখানে, তাই রক্ষে।

আর ঐ দুটি ঘটনার সঙ্গে আজকের ঘটনাটা যোগ দাও। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এই তিনটের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পান না। কিন্তু উচ্চপদস্থরা সেটা কি বুঝবেন? তাঁরা পরিষ্কার বলবেন যে, শেষের ঘটনাটা কাল্‌মিনেশন অব দি টু।

হ্যাঁ। কাল্‌মিনেশন ছাড়া আর কি। দুটো বন্দুক খোয়া যাওয়াটাকে পুলিস-বাহিনীর চরম অমর্যাদা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। তার চেয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইট দিলেই হত। কিন্তু ওই হতভাগা লোক দুটো, হাত থেকে

বন্দুক ছাড়ল কী করে। মরে যেতে পারল না তার আগে? ভীতু, ভীতু। ওদের দেখাবেন তিনি মজাটা।

ওপর থেকে নির্দেশ এল। যে কোন রকমে পরিস্থিতিটাকে আয়ত্ত আনতে হবে। যত পুলিস তাঁর দরকার ততটাই পাবেন। এই সময় কৃষকদের মেজাজ ঠিক থাকে না। কাজেই খুব সাবধান হয়ে যেন কার্যক্রম ঠিক করা হয়। ওপরওয়ালা দেখা করবেন।

একটি জিনিসের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে: এই সময় কৃষকদের মাথার ঠিক থাকে না। লাইনটার নিচে লাল কালির দাগ। সত্যিই তাই। নানা দিক দিয়ে বিব্রত হতে হয় ওদের। ধান খামারে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন-মালিক-পোষ্যপরিজন নানাদিক থেকে দাও দাও করবে। আর যখন দেখা যায় সারা বছরের আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ ফল যেই কে সেই, তখন আর মাথা ঠিক রাখা যায় না। যাই হোক, অফিসার-ইন-চার্জ শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। ভেবে দেখতে লাগলেন, এমন কিছু করা যায় কিনা যাতে তাঁর কলংক-ভঞ্জন হবে। তরুণ মানুষ তিনি, সারা ভবিষ্যৎটাই তো এখনো বাকী। আর একই পদে তো চিরকাল পড়ে থাকা যায় না।......

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছিল গোবিন্দ।

দিনচারেক কেটে গেছে, এখনো সাধারণের উত্তেজনা কমেনি। অমন ভীতু মধ্যবিত্ত কৃষকেরা পর্যন্ত উৎসাহে ডগমগ করছে।

পুলিসও বিশেষ কিছু করতে পারছে না। শুধু এলাকাটা ঘিরে আছে মাত্র। তা ছাড়া, করবারই যে কি আছে, এই অবস্থায় কিছু করতে গেলেই উল্টে মার খাবে ওরা। সেদিনকার ঘটনাতে কৃষকরা ভেবেছে যে ওরা একটা ভীষণ জয় করেছে। আর সেই জয়ের আনন্দে ওরা এতই মশগুল যে, এখন কিছু বললেই, ওরা মেরে ভূত করে দেবে।

অবিশ্যি, এত অল্প পুলিস দিয়ে ব্যাপারটা এগোচ্ছে না বলে পরেও এই রকম থাকবে তা নয়। ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে ওরা যে বহুসংখ্যক পুলিস এনে অঞ্চলটাকে শায়েস্তা করা হবে। আর সে সংখ্যাটা যে বড়ই হবে সেটা অনুমান করা যায়। গাঁয়ে ঢুকতে হলে বেশ কিছুদিন দেরী করতে প্রস্তুত ওরা, কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে আর ঢুকবে না এটা বোঝাই যায়।

তার আগেই যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে দেওয়া দরকার।

এটা অবিশ্যি পরিষ্কার বোঝা যায় যে পুলিস ক্রমে বেধড়ক গ্রেপ্তার শুরু করবে। সাধারণ কর্মী বা কৃষকেরা সবাই তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড থাকতে পারে না,

সেটা সম্ভবও নয়। তাই যেমন করে হোক গ্রেপ্তার করতে এলে পুলিসকে ঠেকাতে হবে।

ইতিমধ্যে সতীশ খবর এনেছে শ্যামগঞ্জের। শ্যামগঞ্জের দুই জোতদার রামু পাল আর হরি চক্রবর্তী খোঁজ করে করে নাম পাঠাচ্ছে পুলিসে। আমনপুর, ধানগেছে আর শীরষে গ্রামের থেকে এই ঘটনায় জড়িত এমন একশো জনের নাম ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছে ওরা। তাদের গতিবিধির খবরও দিয়েছে। পুলিস সেই অনুযায়ী গ্রেপ্তার শুরু করেছে, ইতিমধ্যে করেওছে কয়েকজনকে।

'আশ্চর্য। এই দালালগুলোকে থামানো দরকার।'

শুধু এরা দুজনই তো নয়, এ গ্রামে অনেক ছড়িয়ে রয়েছে ওদের মতো লোক। বড় বড় পুলিসবাহিনীকে ভয় করে না ওরা। কিন্তু এই ঘরশত্রু বিভীষণদের সব চেয়ে ভয় ওদের। যারা গ্রামের মধ্যেই আছে, গ্রামের নাড়ীনক্ষত্র সব জানে, তাদের এড়ানো শক্ত।

স্থির হয় যে, একটা শোভাযাত্রা বের করবে ওরা কৃষক সভার নাম দিয়ে। ওই লোকগুলিকে সাবধান করে দিয়ে আসবে যে, যদি তারা এরপর দালালি করেই তাহলে তাদের বাঁচোয়া নেই। তাছাড়া, কৃষক সভার কাজের জন্যে টাকার প্রচুর দরকার। কিছু টাকা আদায় করাও হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে ওরা বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে। লখীন্দরের ছেলে সুধীর গ্রেপ্তার হয়েছে। লখীন্দরকেও নিয়ে যেত, কিন্তু ও তো এখন ভীষণ অসুস্থ, প্রায় অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে কাটায়। তা ছাড়া এই পরপর যে তিনটে ঘটনা ঘটে গেল, তার কোনটার সঙ্গেই ওর যোগ ছিল না। কিন্তু হলে কি হবে, যার ছেলে এই মহাকাণ্ড বাধাতে পারে, সে কি কম যায়। তা ছাড়া তার নামেও তো কিছু কিছু রটনা আছে। অতএব ওকে অন্তরীণ করা হল, ওর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

সুধীরের সেদিনকার আচরণে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, সুধীর নিজে অপমানিত হয়েছে বলে এই কাণ্ড করেছে।

'কিন্তু ওকি আর শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবে। আমি জানি ওর বাবার সঙ্গে ওর বনত না, ওর বাবা আমাদের দিকে ঝুঁকে ছিল বলে', সতীশ বলে।

ওদের একটা আশংকা হয় যে, সুধীরকে ওরা চাপ দিয়ে সমস্ত আদায় করে নেবে। চাই কি একটা বন্দোবস্ত করে ওর সমস্ত দলটাকে ওদের বিরুদ্ধে লাগাতেও পারে। সুধীরের দলটা তো আর কম নয়, বিশেষ করে ওরা কার্যক্ষমও বটে।

তাছাড়া অনুতোষ বাবু সুযোগটা কাজে লাগবেন। শীরষের জমিদার। তাঁর নিজের গ্রামে ঘটনাটা ঘটল, সরকারের কাছে বে-সরকারী লোক হয়েও এটাতে ওর অপমান। সেদিন শেতলাপুজোর সময় ওকে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল ও, এ সুযোগ ও ছাড়বে না। হয়তো ওকে মুক্তি দেওয়াবে, আর সেই মুক্তির বদলে ওদের দলটাকে হাত করে নেবে ওরা।

গোবিন্দ চিন্তা করতে করতে বললে, 'তাছাড়া, লখীন্দরকেও কাজে লাগাতে পারলাম না আমরা। এই সময়েই ওর অসুখ করে গেল।'

মোট কথা ওদের বাপ-ছেলে, বিশেষ করে সুধীরের ব্যাপারটা নিয়ে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

আঠারো

দু'দিন পরে একটি শোভাযাত্রা বেরোল। সে দলে পাশাপাশি দু'দশ খানা গ্রাম থেকে লোকজন এসেছে। মোটমাট সংখ্যাটা ঠিক করে বলা যায় না। কারণ, ছোটছোট দল এদিক-ওদিক থেকে তখনও আসছিল। ওদের প্রধান আওয়াজ ছিল: 'দালাল নিপাত যাক', আর ওদের গন্তব্যস্থল ছিল, শ্যামগঞ্জ।

রামু পাল ও হরি চক্রবর্তীদের বাড়ি বেশি দূরে দূরে নয়। জোরে জোরে হাঁকডাক দিলে শোনা যায়। মাঝখানে কিছু জমি, কিছু আমবন বাঁশবন আছে।

শোভাযাত্রীরা প্রায় দু'জনকেই একসংগে ঘেরাও করল।

চক্রবর্তী মশায় প্রায় বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। নানা রকম চিন্তা আর পরিশ্রমে তাঁর গায়ের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে, নইলে এর আগে অতি উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।

গতিক্ দেখে ভড়কে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের কথা শিরোধার্য করলাম। ঐ রকম নোংরা কাজ আর কখনো করব না। দোহাই আপনাদের, আপনারা বিশ্বাস করুন আমার কথায়। আর আপনারা যা চাইবেন আমি দিচ্ছি, শুধু ধনে-প্রাণে রক্ষে করুন।'

কিন্তু তার প্রমাণটা কি। তুমি যে এরপরে আর নোংরামি করবে না, সেটা বুঝব কি করে।

'আপনাদিগের হাতের মধ্যেই তো রইলাম। আমার জমিজায়গা ঘরদোর কাচ্চা-বাচ্চা সবই এখানে থাকবে। এটা তো শুধু একদিনের ব্যাপার নয়।'

কথাটা ঠিক।

'কিন্তু আমাদের কৃষক-সভার কাজের জন্যে পাঁচশো টাকা দিতে হবে।'

ওক্ করে একটা শব্দ বেরোয় চক্রবর্তীর গলা থেকে। 'পাঁ-চ্-শো-ও...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাছাড়া কি। কত হাজার টাকা তুমি শুষেছ তার ঠিক আছে।'

'দোহাই আপনাদের, আপনাদের পায়ে পড়ি—ওইটে পারব না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতেই হয়। এদের দল থেকে মাতব্বর হয়ে যারা কথা বলছিল, তারা একটু হেসে নরম হয়ে বললে, 'তা চক্রবর্ত্তীর পো, আমরা সেই সকাল ঠিঙে বার হইচি, খাইনি এখনো। কিছু চাল-ডাল দেন।'

সিন্দুক থেকে টাকা বের করতে গিয়ে চক্রবর্তী মশায় বাড়ির মেয়েদের সাথে কাঁদ্ছিলেন, অবিশ্যি গলা বের করে নয়। সেই কান্নাটা আর একবার ঠেলে ওঠে তাঁর। তবু স্থির হয়ে বলেন, 'তা নিন, আমি বস্তা থেকে বের করে দিচ্ছি।'

সত্যিই যারা দূরগ্রাম থেকে সকাল বেলাই বেরিয়ে এসেছে, তারা চক্রবর্তীদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা শিমুল গাছের তলায় রান্নার আয়োজন করে। চালে-ডালে সেদ্ধ আর তার সংগে নুন। এই যথেষ্ট। বাড়ির থেকে ওরা একটু সরে যাওয়াতে বাড়ির পেছন দিকে নালা পেরিয়ে জংগলে ঢুকলেন চক্রবর্তী পায়খানা যাবার জন্যে। গাড়ু হাতে করে। সেখানে গাড়ু ফেলে রেখে জংগল পার হলেন। পড়লেন গিয়ে বালার মাঠে। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে জয়ন্তীপুর। আর জয়ন্তীপুর থেকে প্রায় ছুটন্ত অবস্থায় চন্দ্রকোণার থানায়।

চক্রবর্তীর শরীরের নানা জায়গা কাঁটার আঁচড়ে, বেনা-পাতার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। শেয়াল কাঁটায় পরণের ধুতি সমাকীর্ণ। মুক্তকচ্ছ অবস্থা।

দড়াম করে মেঝের ওপর পড়লেন। 'জল এক গ্লাস। তারপর বলছি।'

ওদিকে পালকে নিয়ে ব্যাপারটা এগোচ্ছে। এক হাজার টাকা তিনিও দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এরপর তিনি কি করবেন সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না।

'তাও কি হয়। গাঁয়ের বুকের উপর বসে গাঁয়ের শত্রুতা করবেন সেটা কী আর হয়, আপনিই বলুন।'

'আপনারা আমায় বিরক্ত করবেন না। আমি দুদিন অসুস্থতার জন্যে উপোস দিয়ে আছি। টাকা তো আপনাদের দিলাম। আপনারা যান এখন।' বলে তিনি ঘরের ভেতর চলে যাচ্ছিলেন। ওঁকে আটকাল হাত ধরে।

'আহা, করেন কি, করেন কি। কথা না দিলে আমরা যেতে দিই কি করে।'

জোর করে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন রামু বাবু। হঠাৎ পেছন থেকে একজন চাষী এসে ঠাস করে এক চড় লাগাল, 'শালা, আমরা কি ভেড়ার দল বকবক করছি নাকি।'

মোক্ষম চড়। ঠিক কানটার ওপর পড়েছিল, গালের কিয়দংশ সে চড়ের আওতায় ছিল। প্রথমে ছিটকে পড়লেন মাটির ওপর, তারপর ছটফট করলেন। আর মারা গেলেন আধ ঘন্টা পরে।

প্রথমটা ওরা হকচকিয়ে গেল। অতটা না করলেই হত। কিন্তু যখন শুনল হরি চক্রবর্তী বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিসে খবর দিতে চলে গেছে, বাড়িতে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বললে, 'উ শালাকেও অমনি করলে হত। সাপের জাতকে বিশ্বাস নাই।' অতএব পোষ্টার পড়ে: 'দালাল হুঁশিয়ার। রামু পালের কথা মনে রেখ।'

গোবিন্দরা যা আশংকা করেছিল, তাই হল।

সেদিন বিকেলেই সদর থেকে আর ঘাটাল থেকে নতুন পুলিস ফোর্স চন্দ্রকোণায় এসে পৌঁছেছে। সন্ধ্যে বেলা রওনা হয়ে রাত্রে তারা শ্যামগঞ্জে এসে হাজির হয়। চক্রবর্তী আর রামু পালদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। রাত্রের মধ্যেই ঠিক হয় কোথায় কোথায় গিয়ে কাকে কাকে গ্রেপ্তার করবে। চক্রবর্তী প্রায় প্রধান সব কটির নাম আস্তানা বললে।

বালায় একজনের বাড়িতে সতীশ থাকত। সে বাড়িতে বাবা-ছেলে দুজন মাত্র। ছেলে দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে মাষ্টারি করে। বাবা কৃষক।

ছেলের নাম যতীন। যতীন সতীশের কাছ থেকে তৈরী হয়েছে। সে এই প্রথম কাজ করবার সুযোগ পেলে। ভোরবেলা ওকে উঠিয়ে জানালে অন্তত জন আষ্টেক আর্মড্ পুলিস বাড়ির চারদিকে। যতীন বুঝলে ব্যাপারটা। সতীশকেই ধরতে এসেছে ওরা। ভাগ্য ক্রমে সতীশ সেখানে নেই। কিন্তু নানারকম কাগজ পত্র আছে। যতীন সেগুলো পোড়ালে। তারপর যখন বুঝলে যে পালাবার কোন পথ নেই, তখন ভাবলে, এমনিতে ধরা দিয়ে কোন লাভ নেই, কিছু একটা করাই উচিত।

জানালা দিয়ে ছুঁড়লে ও দুটো হাতবোমা। দুটোই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ফল হল। বাড়ির ভেতরকার লোকসংখ্যা এবং ওদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে পুলিস দলটুকু কিছুই জানত না। ওরা পিছু হটতে থাকে। এই সময় গ্রাম থেকেও কারা শাঁখ বাজায়। চারদিক থেকে হৈ হৈ করে ছুটে আসে জনতা। ওরা আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। এই ক'দিন উত্তেজনায় কোন কিছু তুচ্ছ ঘটনাতেও সমস্ত গ্রাম, তারপর কয়েকখানা গ্রাম, নড়ে ওঠে।

পুলিসের দলটি প্রথমে স্বাভাবিক গতিতে, তারপর দ্রুত, এগোয়। তারপর ছুটতে থাকে।

জনতাও ছুটন্ত। কিন্তু ওরা আগেই সরে পড়েছিল বলে পুলিসের নাগাল ধরতে পারে না।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে, যতীন ওর দুচারজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পুলিসের পথে ওৎ পেতে ছিল। হঠাৎ ঝোপের মতো একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো হাতে হাত-বোমা। যতীন বললে, 'অন্তত চারটে বন্দুক দাও, তা না হলে তোমাদের বাঁচোয়া নেই।'

দলটিরও তাই মনে হয়, অফিসার সমেত। পেছনের দিকে তাকাল ওরা একবার। অনেক দূরে আছে ওরা এই যা ভরসা। সহসা অফিসার লক্ষ্য করলেন ওদের হাতে তীর-ধনুক আর বোমা মাত্র, আর তাঁর দলের সবারই হাতেই বন্দুক। অতএব, কড়াক-পিং।

বোমার ঘায়ে আর তীর বিঁধে মরে গেল একটা পুলিস। অফিসার নিজে তার বন্দুকটা হস্তগত করলেন। আর সেই সংগে মারা গেল যতীন আর তার একটি বন্ধু। বাকিরা পালাল। পুলিসের দলটি মৃতদেহগুলো টানতে টানতে জয়ন্তীপুরে এসে হাজির হয়।

চন্দ্রকোণা থেকে আরো পুলিস ফোর্স রওয়ানা হয়ে এসেছে ওদের সংগে যোগ দেবে বলে। সমস্ত শুনে যাত্রা স্থগিত হল। এই ফোর্স নিয়ে হবে না। তাছাড়া গোলমালের এলাকা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। চন্দ্রকোণা থেকে সদরে, প্রাদেশিক দপ্তরে তার গেল। পাল্টা তারও আসে।

সেই সংগে নির্দেশ। আর এলেন দেবেন্দ্রনাথ সমাজপতি—হোম মিনিষ্ট্রির সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ।

তিনি সদরে বা চন্দ্রকোণায় পুলিস কর্মকর্তাদের সংগে দেখা করলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ শীরষের জমিদার বাবু অনুতোষ সিংহের সংগে। সেখানে রওয়ানা হলেন তিনি।

এই গোলমালের ভেতরে একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে।

শ্যামগঞ্জের দফাদার বাড়ি আসছিল চন্দ্রকোণা থেকে। কোথায় গিয়েছিল যেন।

পলায়মান পুলিসদলের অফিসার, তাঁর সাইকেল ছেড়ে এসেছেন। এত বিপদেও সাইকেলের মায়া তিনি ছাড়তে পারছিলেন না। ছাড়া শক্তও বটে। তাঁর কর্মজীবনের এক রকম সর্বক্ষণের সাথী ঐ সাইকেল। তিনি দফাদারকে বললেন, 'এই, তোদের গাঁয়ে সাইকেলটা ছেড়ে এসেছি আমি। চক্রবর্তীদের বাড়ি। এনে দিতে পারবি ?' সে অতশত জানত না। তাছাড়া মনিবগোষ্ঠীর

লোক, অতএব বিগলিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে, তা আর পারবনি।' বলে সে ছুটতে থাকে।

ফিরবার পথে সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতা ওকে ধরে। 'শত্তুর, দুশমন।'

হাত থেকে তাদের শিকার ফস্‌কে গেছে। অনেকদূর ধাওয়া করেও পুলিস দলকে পায়নি। অতএব ঐ পা-চাটা কুকুরটাকে ধরো।

শত অনুনয় সত্ত্বেও, ওকে চিরে চিরে কেটে ফেলল ওরা।

আশ্চর্য নৃশংসতা। গোবিন্দ আঙুল কামড়ে, অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। ছিঃ ছিঃ। অত্যন্ত ভুল হয়েছে, অত্যন্ত ভুল হয়েছে। ওদের কেউ থাকলে হয়তো ব্যাপারটা ঘটত না। একটা কলংক হয়ে রইল, এটা ঘুচ্‌বে কি করে? ঐ দফাদার, সরকারের সংগে অতি দূরতম সম্পর্ক তো ওর। সে রকম সম্পর্ক তো সবারই থাকে। আপসেই থাকে।

উনিশ

এবারে আর আর্মড্-পুলিস নয়, রাইফেলধারী জাত-সৈনিক।

দলটা রওয়ানা হল রাত্রেই। সাধারণত রাত্রিতে রওয়ানা হয় ওরা। তার কারণও আছে, প্রাতঃকালে উঠে কৃষকেরা দিনের একশো-রকমের কাজ শুরু করবার আগেই দেখবে ওদের। অতি স্থির মস্তিষ্কে ধারণা করবার সুবিধে পাবে, তাদের কোন পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যা তা ব্যাপার নয়।

চলার তালে তালে বুটের শব্দ হয়। কিন্তু কি রকম নিরুৎসাহ বোধ করে ওরা। কাঁচামাটির রাস্তা, দুজন করে সার দিয়ে চলেছে। সাধারণত মার্চ করলে বুটের যে রকম শব্দ হয়, সে অভ্যস্ত শব্দ মোটেই হচ্ছিল না। কেমন ধপাস-ধপাস ধরনের শব্দটা। তাছাড়া, রাস্তা উঁচু নিচু বলে মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছিল।

জয়ন্তীপুর পেরিয়েছে, এমন সময় একটা বিরক্তিকর ঘটনা ঘটে। কতকগুলো গ্রাম্য কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, দলটা প্রায় ওদের ঘাড়ে পড়ে পড়ে, এমন সময় একসঙ্গে অতি কর্কশ ভাবে ঘেউ-ঘেউ কেঁউ-কেঁউ করে উঠল কুকুরগুলো। অতর্কিত ছিল বলে দলের প্রায় প্রত্যেকেই চমকে যায়, বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। সামনের জন চারেক তো লাফ দিয়ে ওঠে একরকম। প্রথমটা ওরা কিছুই বুঝতে পারে না, পরক্ষণে সামলে আবার যখন লাইন বাঁধল তখন কুকুরগুলো সরে গিয়ে পাশের ঝোপঝাড় থেকে চিৎকার করছে। ওরা প্রায় জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেছে আধ-মাইল পর্যন্ত, তখনো কেঁউ-কেঁউ করে কুকুরগুলো। কেমন একঘেয়ে কান্নার মতো শোনায়। ওরা যে সেই কেঁপে উঠেছিলো একবার, সেটা এখন নেই; কিন্তু কখনো কখনো যেন হাঁটুর কাছটা একটু দুর্বল মনে হয়। ও কিছু না, ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দূরে আলো জ্বলছে একটা। বাঁধের ধারেই হবে বোধ হয়। সেই আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তারপর বোঝা যায় কারা যেন আগুন জ্বালিয়েছে।

ওইদিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটছে ওরা। একেবারে কাছে যখন এসেছে, তখন কতকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'বল হরি, হরিবোল।'

ওঃ হরি, মড়া পোড়ানো হচ্ছে। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ওরা। কিন্তু আগে হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল বলে তার প্রক্রিয়া খানিকটা ছিল তখনও। এবারও ওই বিকট হরিবোল শব্দে কেঁপে উঠল ওরা। অবশ্য কেউই লাইনচ্যুত হয়নি।

শ্মশানটা পেরিয়ে গ্রামের মাঠে ওরা নামে।

কিন্তু দুর্ভোগ ছিল ওদের কপালে তখনও। একটা নালার ধারে আল-পথ দিয়ে চলছিল। এবারে আর পাশাপাশি দুজন যাবার জায়গা ছিল না। একজন করে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ কালো মতো একটা ঝোপের আড়ালে কি যেন একটা জোর শব্দ হল, আর মানুষের নড়াচড়ার মতো কি দেখা যায়। থমকে দাঁড়ায় ওরা, হাতের রাইফেল উঁচানো। ওদের সন্দেহ থাকে না যে কতকগুলো মানুষ ওখানে লুকিয়ে আছে।

'কোই হায় ?' কম্যাণ্ডিং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলেন।

অন্ধকার কেঁপে কেঁপে গেল শুধু।

ঝোপটা বোধ হয় হাত পঁচিশ দূরে হবে। ওরা সেই দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোথাও কিছু হচ্ছে না দেখে এগোবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ডানদিকে ওদের গন্তব্য পথের ওপর কিছু দূরে আবার তীব্র শব্দ হয়।

পরিষ্কার বোমা-ফাটার আওয়াজ। ভড়াক করে ফিরে ওরা দেখল, কারা যেন পালাচ্ছে। আবছা আবছা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে গর্জাল সব কটা রাইফেল। কিন্তু একটাও আর্ত-শব্দ শোনা গেল না। নিশ্চয় কেউ আহত হয়নি। ধাওয়া করল ওরা সামনের দিকে। প্রায় সিকি মাইলটাক দৌড়বার পরও কাউকে পেল না ওরা। তখন গতি মন্থর করল।

কিন্তু তাতে কি হবে, এদিকে ওদিকে বোমা-ফাটার শব্দ ওরা আরো বার তিনেক শোনে, আর বার তিনেকই এদিক-ওদিক ছোটে।

ঘাবড়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ওরা। আর ওরা ছোটাছুটি করে না। সোজা পথ ধরে এগোতে থাকে। কাঁহাতক এমন করে নাকাল হওয়া যায়। বিশেষ করে বোমাগুলো যখন তাদের উদ্দেশ করে ছোঁড়া হয়নি।

ভয়ে ওদের তখন গলা কাঠ হবার উপক্রম। কিন্তু কিছুতেই ওরা ব্যাপারটার হদিস পেল না। ভুতুড়ে ব্যাপার হবে বোধ হয়।

শুধু একটি দল নয়, একের পর এক আসতেই থাকে। মাথায় হেলমেট্, খাটোখাটো সর্টস্ আর জামা, রোদ পড়ে পেতলের বোতামগুলো ঝক্ঝক্ করে। কিরিচগুলো চোখ ঝলসে দেয় মাঝে মাঝে। কৃষকদের বউ-ঝি ভয় পেয়ে ঘরে লুকোয়, কিন্তু কৌতূহলের বশে ঘুলঘুলি বা অল্প খোলা জানালা দিয়ে দেখে। ছেলেরা ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। যারা একটু বড় হয়ে সাহসী বা ডেঁপো হয়েছে তারা আর একটু এগিয়ে অথচ ওদের থেকে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। কার্যরত কৃষকদের বুকটা দুরদুর করে ওঠে একটু। কেউ বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। একটা আতঙ্ক নামে আস্তে আস্তে।

এদের এই হচ্ছে কাজ। ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা করে রাখা। কোন রকম টুঁ-শব্দটি কোর না, তাহলে যমালয়। আর সেটা হলও। ওরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। প্রায় কাজ কর্ম পর্যন্ত বন্ধ।

সে যাই হোক। আসল কাজ কিন্তু ওদের শুরু হল আরো দুদিন পরে। পরিকল্পনা মাফিক। ওদের কাজ শুরু হবার আগে অবিশ্যি ওদের কার্যক্রম সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল।

'বুঝলে দাদা, ঠেলা সামলাও এবারে, অরা ত সব মেরে সাফ করে দিবে। শুনলম, ই দশখানা গাঁয়ের লোককে দাঁড় করি' দিয়ে গুলি করে মারবে। মাহা শ্মশান হবে এখেনে, দেখবে তুমি। গিধিণী শকুনি এখেনে চলাচল করবে।'

অতি বিষণ্ণ, অতি চিন্তিত, প্রায় অর্ধোচ্চারিত কথাগুলি। ফিসফিস করে বলতে হয়, নইলে কে কোথায় শুনে ফেলবে। গ্রামে নাকি অদৃশ্য একরকম মানুষ এসেছে, তারা ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছে। মনের কথা মুখ দিয়ে বের করেছ, তা সে তোমার স্ত্রীর কাছেই হোক বা জেঠতুত দাদার কাছেই হোক, সেই অদৃশ্য লোকদের কেউ না কেউ তোমার কথা শুনে ফেলবে। তারপর কি হবে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর মুশকিল হচ্ছে এই, এই সমস্ত লোকদের চিনবার উপায় নেই। তোমাদেরই মতো সাজ পোশাক হাবভাব তাদের।

তবু মানুষকে কথা বলতেই হয়। একেবারে শ্রোতার কানের ঠেকাঠেকি বক্তার মুখ এনে। না বললে বাঁচবে কি করে।

'আচ্ছা, এই যে সৈন্য সব এস্ছে এস্ছে চলেঁ যাচ্ছে, ওরা যায় কোথায়?'

'সে আমি বলব কি করে। ঘরের বাইর হতে পারছি কেউ? তবে জান কি দাদা, লোকে বলে এই অঞ্চলটা উড়ি' দিবে, কেউ বলে, কেশপুর তমলুক

উসব রাখবেনি। আবার কেউ বলে মেদিনীপুর জেলাটাই রাখবেনি। বলে, উ শালা শয়তানের দেশ, কেউ ওকে শায়েস্তা করতে পারবেনি, ত যারই রাজত্ব হউ না কেনে।'

এতসব আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রথম দিন দুই-তিন কিছুই হল না দেখে ওরা মুষড়ে গেল। এই দু'তিন দিন কম সময় নয়। উদ্বেগ এবং আশঙ্কার সময় এক একটা ঘণ্টা এক একদিন বলে মনে হয়। তাছাড়া এদের হাতে কাজ নেই, হাটবাজার যাওয়া নেই। কারো সঙ্গে পাঁচটা কথা বলবার জো নেই। অতএব বিপদ এই আসে এই আসে করতে করতে প্রায় বিপদের আস্বাদ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু বিপদ ঘটছে না বলে ওরা আরও বেশি বিমূঢ়তার মধ্যে পড়ে। আর এই অবস্থায় সেটা আরো অসহ্য।

অতএব সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে লাল বর্ণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পালাচ্ছে তখন ওরা কাঁচালংকা মেখে বেগুন পোড়া দিয়ে ভাত খায়। গোরুগুলোকে জল দিয়ে আসে, খড় দিয়ে আসে। সারারাত আর দেখবার সময় হবে না। কোন রকমে পেতলের পিদিমে একটা সলতে গুঁজে দিয়ে ধরায়। সে সলতের মাত্র ডগাটাই তেলে-ভিজে হয়। পাবে কোত্থেকে? আজ তিন দিন হাট-বাজার বন্ধ। আজকে বেগুন পোড়ায় তেল দেওয়া হয়নি, সেই তেল অল্প একটু খরচ করে আজ, আগামী কাল হবে বাকিটা দিয়ে। কিন্তু তারপর? যদি তেলের অভাবে সন্ধ্যে দেওয়া না হয়? কৃষাণী কাঁপে থরথর করে অমংগল আশঙ্কায়। সেই কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে কোনরকমে ঘরে ঢোকে এসে, পিঠে যেন কেউ নিঃশ্বাস ফেলে যায়। আপাদমস্তক কাঁথা চাপা দেয়, হাতটা বা পাটা কোন-রকমে বেরিয়ে পড়লে ভয় আরো বাড়ে, তাড়াতাড়ি টেনে নেয়। বিপদ হচ্ছে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে, চার মাসের বাচ্চা। ও কাঁদলে মুখে হাত চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু ন'বছরের মেয়েটা যদি তাল-পুকুরের শুশনি শাকের কথা জিজ্ঞেস করে, ফোঁস করে ওঠে মা। 'চুপ কর, হারামজাদি', তাও আবার অতি আস্তে। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কাটে, তারপর কৃষাণী বলে, 'ওগো, কালকে আমগাছের ওই গড়েটা ফাল করে দিও। জ্বালন এগবারে নাই।'

'শালী, তোর পেটের চর্চা হল আগে! রাতটা বেঁচে থেকে আগে কাটা।'

তারপর উৎকর্ণ হয়ে পড়ে থাকে লোক। একটা মিনিটের জন্যেও ঘুম আসে না। গভীর রাত্রে কোন সময় হয়তো লাফ দিয়ে ওঠে লোকটা, তারপর বাঁশের জানালার ওপর থেকে চটের পর্দা সরিয়ে বাইরে চোখ চালায়।

'কিগা, কি হল,' বউ উঠে আসে।

'শালী, তোর অমুক হল' হঠাৎ মুখ খারাপ করে লোকটা, 'শালী কুপীটা নিবিয়ে দে।' কোন রকমে ঘরটার ও-প্রান্তে গিয়ে আলোটা এক ফুঁয়ে নিবোয় বউ। শাড়িটা কখন গা থেকে নেমে গেছে, কোন রকমে জড়ানো আছে কোমরটায়। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার এটা সময়ও নয়, ক্ষেত্রও নয়, ফিরে এসে আবার বেকুবের মতো শুধোয়, 'কি ?' বলে ডান হাত দিয়ে লোকটার বাঁহাতের কনুয়ের ওপরটা ধরে।

'ঐ দেখ, ঐ জামগাছটার বাঁদিকে...'

অনেক দূরে দুটি আলো গর্জন করতে করতে চলেছে, 'ঘর্ ঘর্র্র্...'

মটরগাড়ী !

একটা নয়, দুটো নয়, দশটা নয়, কে জানে কত হবে। আস্তে আস্তে কোথায় চলে গেল। না বোধ হয়, আলোগুলি নিবিয়ে দিল ওরা।

তারপর একসময় চুপচাপ। লোকটা বিছানার ওপর ফিরে আসবে কিনা ভাবছে, কিন্তু আসা হল না।

বউয়ের গা-টিপে ডান হাতের আঙুল বাড়িয়ে সামনের রাস্তাটার দিকে দেখালে। বউয়ের হাতের মুঠিটা আরো শক্ত হয়ে ওঠে, লোকটার কানের কাছে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ আর গতি দুই বেড়ে যায়। পুলিসের দল কোথায় যেন যাচ্ছে।

এই রকম কয়েক দল গেল। কোথায় গেল, কেন গেল জানবার উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ কোন কিছু শোনা যায় না, তারপর কোথায় যেন একটা আর্ত চিৎকার। দূরে, অনেক দূরে। বোঝা যায় না এই গ্রামে না অন্য কোথাও। তারপর সে চিৎকার থেমে যায়।

এর পরের বারে শোনা যায় কান্না। কোন স্ত্রীলোক কাঁদছে। এবারে আরো কাছে। ঐ কান্নাটা বোধ হয় এগিয়ে আসছে। না, ওটা কান্না নয় বোধ হয়।

কোথাও গোলমাল হচ্ছে যেন একটু। কোন্‌দিকে হবে ? ওটা যেন পেছন দিকে।

এই রকম করে ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গ্রামটা যেন কোঁকাতে থাকে। অতি বিলম্বিত চাপা কান্না, আর মাঝে মাঝে অতি যন্ত্রণার চিৎকার। শুধু পড়ে পড়ে শোনো। যদি একলা বিছানায় থাকো, তাহলে বালিশ জড়িয়ে

ধরবে, নয় তো, বউ থাকলে তোমাকে জড়িয়ে থাকবে বউ। তোমার আশঙ্কার কথা যদি মুখ ফুটে বলো যে, হয়তো এ বাড়িতেও অমন কান্না উঠতে পারে, বউ অমনি কেঁদে উঠবে, 'তোমার পায়ে পড়ি অমন কথা বোলোনি।'

এক সময় আবার তড়াক করে লাফিয়ে জানালার ধারে যেতে হয়।

সেই বাসগুলো ফিরে যাচ্ছে।

এবারের শব্দ আরো কম। নিশ্চয় বোঝাই হয়েছে।

'লোক ধরে লিয়ে গেল।'

তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বউ সেদিকে কান দেয় না, ও দড়াম করে লক্ষ্মীতলায় পড়ে কাঁদে আর চেঁচায়, 'হে মা লক্ষ্মী, তুমি রক্ষে করেছ মা, তুমি বাঁচি দিছ। হে ভগমান...'

কিন্তু সমস্ত দিন একটা শব্দও শোনা যায় না। সত্যি সত্যি যেন মড়ার মত পড়ে থাকে গ্রামটা। কিন্তু কানে কানে কথা ছড়ায়, পাঁচশো, উহুঁ, এক হাজার, উহুঁ, দু'হাজার লোক নিয়ে গেছে। কিন্তু সে তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেউ বললে, একশো। সেটাও তো বিশ্বাস করা যায় না।...

নিশাপর্বের পর শুরু হল দিবাপর্ব। দিন দুই পরে।

ছোট্ট পাড়াটার সব পুরুষগুলোকে একত্র করা হল, মনে করো রাধু চাষীর খামারে। তারপর বলা হল, 'বল, তোদের মধ্যে কারা ছিলি সেদিন শোভাযাত্রায়? যদি না বলিস, তাহলে সব কটাকেই নিয়ে যাবো।'

চারদিকে সৈনিকগুলি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একেবারে রাইফেল উঁচানো অবস্থায়। সেদিকে ওরা তাকায়, তারপর পরস্পরের দিকে। একজন ইতিমধ্যে বলে, 'মাখন, তুমি সত্যি কথা বল। তোমার জন্যে আমরা সবাই মরি কেনে?'

'তা আমার নাম বলবে বৈ কি। কিন্তু তমার ভাই-পো বঙ্কু, তার কথাটা বেমালুম চেপে গেলে চলবেনি!'

'তা ছাড়া, ওর ভাইপোর কথা কেনে, বুকে হাত দিয়ে ওর লিজের কথাটা বলুক। কি, তুমি আমার কাছে বলনি, যে তখন যদি আমি থাকতম, লাঠি মেরে মাথাটা ছিঁচে দিতমনি?'

'তোমার কথাটা? তোমার কথাটা বল আগে।'

এইভাবে ঐ ছোট্ট দলটুকুর সবাইয়ের নামে অভিযোগ উঠল, তাছাড়া, যারা ঘেরাও হয়নি তাদের নামেও উঠল। অতএব গ্রেপ্তার করো সব কটাকে।

দিনে রাতে এই পাইকারী হারে গ্রেপ্তারে অবিশ্যি একটা বাধা এসে দেখা দেয়। পুরুষরা সবাই, আর, মেয়েদের কিছু অংশ জঙ্গলে পালিয়ে যায়। নিশাপর্বের আগে থেকেই কিছু কিছু পালাতে শুরু করেছিল, তারপর দিবাপর্বের সময় পালাল দলে দলে।

কিন্তু যাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে গেল, তাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। 'বল শালী, তোর বেটা কোথায়? তোর পুরুষ কোথায়?' স্ত্রীলোকেরা শুধু কাঁদল, পুলিস আসার আগে, আসার সময়, প্রশ্ন শুধোলে পর, আর ওরা চলে গেলেও কাঁদে। পুলিস দল গত্যন্তর দেখে না। প্রথম অশ্লীলতম গালাগাল দেয়, তারপর লাথি মারে, চুল ধরে হাত ধরে টানে। তারপর যে অত্যাচারের জন্যে সমস্ত সমাজটাই অপমানিত বোধ করে, সেই চরম অপমানও চলে।

অতঃপর স্ত্রীলোকেরাও বনে পালিয়ে যায় পুরুষদের কাছে।

কিন্তু একটা ভুল করে গিয়েছিল। গোয়ালে গোরু, ছাগল, আর ভারীতে ছিল হাঁস-মুরগি। বন্ধ করা অবস্থায় পড়ে ছিল, তাড়াতাড়িতে খুলতে পারেনি। আগন্তুকরা যতগুলো পারল হাঁস-মুরগি শেষ করল কিন্তু গোরুগুলো অনাহারে তৃষ্ণায় চিৎকার করতে শুরু করল। তারপর মরে গেল একদিন। জনশূন্য গ্রামে দুর্গন্ধে মানুষ ঢুকতে পারত না।

ছেলে-গোরু হারানোর চেয়ে বড় আঘাত চাষীর কাছে আর নেই। তার ওপর, তাদের জঙ্গলে চলবে কি করে, খাবে কি। তার ওপর অনুপস্থিত কৃষকদের বাড়ি-ঘর ক্রোক করা হল। তাই ফিরে আসতেই হয়, প্রথমে দু'একজন, তারপর দল বেঁধে। এসে আত্মসমর্পণ করলে, 'হুজুর আমাদের মা-বাপ, যা ইচ্ছে কর।'

অবশ্য প্রায়ই এর উল্টো রিপোর্টও আসে।

স্ত্রীলোকরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে ব্যাপারটায়। কিছুতেই তারা কারো খবর দেবে না। স্বামী হয়তো খিড়কির ধারে বন দিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু, ওধারে বড় ছেলের গায়ে সংগীনের খোঁচা চলেছে সদরে।

'মাগি তোর ভাতারের খবর দে। নইলে তোর বড় ছেলেকে মেরে ফেলব।'

'খপর দিব কি করে, বাপ। জানব, থালে ত দিব। ছেলাকে আমার রাখ কি মার, সে তোমাদের হাত।'

এ রকমও হয়েছে, পাড়ার মেয়েরা বঁটি, কুড়ল, ঝাঁটা, কাটারি নিয়ে ভাগিয়ে

দিয়েছে একটা সশস্ত্র দলকে। ওরা একটা গুলি ছুঁড়বারও সময় পায়নি। সমস্ত অভিযানটা যিনি পরিচালনা করছিলেন, সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিস, মেদিনীপুর, তাঁর কাছে এটা রহস্য।

ছোট্ট ন'বছরের ছেলে। জিজ্ঞেস করা হল, 'বল তোর বাপ কোথায়? নইলে দেখেছিস বন্দুক।'

'মারবে তো মারো।' বলে দু'কোমরে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। হাসি পায় ওর বীরত্ব দেখে, কিন্তু আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য!

কিন্তু যে রহস্যের কথা বলছিলাম। অজস্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু আসল কর্মী যারা তাদের দু একজন ছাড়া কেউই ধরা পড়েনি। রুই কাতলারা তো নয়ই। গাফিলতি কার? পুলিসগুলো ওদের কায়দা করতে তো পারেইনি, বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে নাস্তানাবুদ হয়েছে। ওরা গুলি করে না মেয়েদের ওপর। অফিসার-ইন-চার্জ অনেক সময় গুলি করবার আদেশও দেননি। কারণ, যদি আদেশপ্রাপ্তরা অস্বীকার করে। একবার যদি তিনি অপমানিত হন, তাহলে তাঁর কাজ চালানোই দুরূহ। অধীনস্থ কর্মচারীদের মনোভাবেরও খোঁজ নিতে হয়, তারা তো মানুষ, ভালো-মন্দের জ্ঞান অল্প-বিস্তর থাকবেই তাদের।

এ রকম হামেশাই ঘটে যে, পুলিসরা জনতার ওপর গুলি ছোঁড়েনি বলে পরে গর্ব করেছে। ঠিক এই কথাই একটি পুলিস জনৈক অন্তরীণ কর্মীর কাছে বলেছিল।

'এটা যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে সেটা আমরা বলছি। কিন্তু দেখেন, কী আর আমরা করতে পারি। আমরা হুকুমের চাকর। তবু একটা কথা বলি, দেখেছেন তো সবই, আমাদের গুলিতে আর ক'টা মরেছে?'

এই মনোভাব গড়ে উঠল কী করে? সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিস, এ কথা অনেকবার ভেবেছেন। কিন্তু কোনো সন্তোষজনক জবাব পাননি। কিন্তু ওদের মনোভাব যে এরকম আছেই সেটা একটা ফ্যাক্ট, সেটাকে মেনে নিতে হবেই। তাই এই বর্তমান অভিযানে, তিনি নতুন পুলিস এনেছেন, অন্য প্রদেশের পুলিস। তাদের দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়েছেন।

যে সমস্ত পুলিস এখানকার নানা ক্যাম্প (এরকম ক্যাম্প অনেক আছে, এ সমস্ত ঘটনা ঘটবার অনেক আগে থেকেই) আগলায় তাদের ওপর বিশ্বাস নেই তাঁর। তিনি জানেন, এরা প্রথম দুদিন ঠিক থাকে, তৃতীয় দিন পাঁজারীর কাছ থেকে একটা শশা চেয়ে নিয়ে মুড়ি দিয়ে খায়, চতুর্থ দিনে গাঁজা টানতে টানতে গল্প করে মধু গয়লার সংগে। পঞ্চম দিনে গাঁয়ের বউ-ঝি নিয়ে গাল-

গল্প করে রসিয়ে রসিয়ে। এরা কখনো পারে তাদের ঐ অতি পরিচিত লোক-গুলির ওপর বন্দুক ছুঁড়তে ?

সরকার অবিশ্যি জনসাধারণের সঙ্গে পুলিসের যোগাযোগ বাড়াতে বলছেন। কিন্তু যাদের ঐ সাধারণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের দ্বারা কাজ পাওয়া যাবে না। অবিশ্যি গণসংযোগেরও দাম আছে একটা, সেটা তিনি স্বীকার করেন।

কিন্তু আসল কাজের বেলা সংযোগহীন দল আমদানি করতে হবে। তাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তারাও কি করে মেয়েদের ওপর গুলি চালায় না ? হাস্যকর ভাবে ঝাঁটা-বঁটির সামনে পশ্চাদপসরণ করে ?

তার কারণ অবিশ্যি কিছু নয়। ছেলেবেলা থেকে ওরা মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে আসে সেটা যাবে কোথা থেকে। সামাজিক নীতিবোধের ভূত চড়ে থাকে ওদের ঘাড়ে।

আশ্চর্য। মানুষকে দিয়ে অনেক কিছু করাও যায়, অনেক কিছু করা যায়ও না। এইটে তার কাছে সব চেয়ে ইরিটেটিং ওআণ্ডার!

কিন্তু হতে পারতো, যদি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আর্মিতে এনে ভর্তি করা হতো। হতে পারতো হয়তো। কিন্তু সেটা তাঁর হাতের বাইরে।

বিশ

ঘাটাল শহরের কুঠিবাজার এলাকার ভেতরে চত্বরের মতো জায়গা আছে একটা। অবিশ্যি চৌকো নয়, বাঁধানোও নয়। এক কালে ইট সুরকি দিয়ে কিছু একটা করা হয়েছিল। এখন এক পসলা বৃষ্টি হলে এক বিঘৎ জল জমে। একটু শুকনো হয়ে গেলে ধুলো উড়ে চারপাশের দোকানী আর খদ্দেরদের লাল করে দেয়, তাদের শ্বাস রোধ করে। আর যখন. হাজা-শুকো কিছুই নেই তখন চট্‌চট্‌ করে এঁটো শালপাতা, গোরুর উচ্ছিষ্ট খড়, তাতে কয়েক লক্ষ মাছি।

তারই এক ধারে ধানের দোকান একটা। কাদের হবে যেন। কোন এক বড় মহাজনের বলেই জানা গেছে। সেই ধানের দোকানের সামনে বিশ হাত লম্বা তিন হাত চওড়া ছোট্ট একটা চাতাল। সেই চাতালে শ'খানেক চাষী বসে বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। মনে হয় অতি নিশ্চিন্ত, যেন কোথাও যাবার পথে এখানে একবার বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছে আর কি।

প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর তাদের একবার করে হাজিরা দিতে হয় ঘাটালের আদালতে। তারা সরকারের আসামী, কিন্তু এখনো অভিযুক্ত হয়নি। অভিযুক্ত হবার আগে হাজতে থাকতে হয়, কিন্তু এরা জামিন পেয়েছে। আর তারা যে ফেরার নয়, সেইটা বোঝাবার জন্যে এই রকম মুখ-দেখানোর দিন পড়ে। প্রত্যেকবার তাদের যাতায়াতের বাস-ভাড়া, এখানে খাবার খরচ, উকীলের ফি, সব মিলিয়ে খরচ কত! তার ওপর সেদিনকার রোজ নষ্ট তাদের।

উকীলরা প্রথমেই বলেছিল তাদের, 'হতভাগারা, তার চেয়ে হাজতে থাক, জেলে যা। বরঞ্চ দু'বেলা খেয়ে বাঁচবি। তা না করে এত খরচ পাবি কোথেকে?'

'সি বাবু জানিনি, ভগমান সি একটু জুটি' দিবেন!' মাথা চুলকে মহা বিব্রত হয়ে উকীলবাবুর তক্তপোষের একধারে মাটির ওপর বসে কৃষকরা বলে। পাঁচ-

হাত ধুতি একটা পরনে, গায়ে পৈতৃক আমলের অতি পুরনো শত ছিদ্র কালো কোট। কোলের উপর ছাতা, সেই ছাতাটা গামছা দিয়ে জড়ানো, যার এক খুঁটে কৃষক-বউয়ের দেওয়া পান-বাঁধা, নয়তো মুড়ি শশা পোঁটলা করা। হাত দুটো প্রায় জোড় করে বলে, 'জেলে যেতে পারবনি, বাবু, উটি পারবনি।'

'শোন গো শোন তোমরা একবার। বলি জামিন তো দিলাম না হয়, কিন্তু এই পনের দিন ছাড়া মুখ দেখানোর খরচ জোগাবি কী করে। আজকাল কোর্টে যে রকম ঝামেলা, তার ওপর কবে তোদের নামে চার্জশীট আসবে, তারপর মামলার শুনানী। সে শুনানীও যে চলবে কতকাল, তাই বা কে জানে।'

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে যায় কৃষকগুলি। মনে মনে দুটো দিকই ওজন করে দেখে। একদিকে কালো অন্ধকার ভয়ংকর জেল (জেল বললে এই বিশেষণগুলি আপনিই ওদের মনে আসে), আর অন্যদিকে তার বউ ছেলে, তার জমি জমা, তার রোজকার কাজ। না, সে জামিনই চায়। তাতে তার দুটো চারটে বাসন-কোসন যদি বিক্রী করতেই হয় তো সে কিছু মনে করবে না। হয় তো, উকীলবাবু যা বলছেন, সেটা সত্যি যে এক সময়, তাদের মামলার শেষ হবে যখন, তাদের জেলে যেতেই হবে। যে অপরাধ তারা করেছে, তাতে এমনি রেহাই পায় না কেউ। তবু, তবু ভালো। বন্দী হয়ে থাকবার চেয়ে সেটা ভালো।

'তবে ওই হবে। তোমরা আগে সর্বস্বান্ত হও, তারপর যাও জেলে।' ওদের হিসেবী বুদ্ধি দেখে উকীলবাবুরা হাসেন।

অতএব ওরা পনেরো দিন ছাড়া একবার আসে। ওদের আসার কবে যে শেষ হবে ওরা জানে না। তাছাড়া দল ওদের ক্রমশ ভারী হয়। নতুন নতুন ধরে আনা হচ্ছে, নতুন যোগ করা হচ্ছে ওদের দলে। তারপর শুধু ঘাটাল আদালতেই নয়, এলাকা অনুযায়ী কাদেরও পাঠানো হয় সদর আদালতে। তাদের দলও খুব বড়ো, ঘাটালের দলের থেকে বড় হবেই।

একদিন ওরা একটা নোটিকা দেখে, ঘাটালে। অন্যান্য জায়গায়ও দেওয়া হয়েছে, সেটা তারা পরে জেনেছিল। কিন্তু প্রথম নজরে পড়ে তাদের ওখানেই। ঘাটালের নদী শীলাবতীর পোলের মাথায়, আদালতের ওপারে। সরকার ঘোষণা করেছেন, পলাতক আসামীদের যারা সন্ধান দিতে পারবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তারপর সেই আসামীদের

নামের এক লম্বা ফিরিস্তি। ফিরিস্তি দেখে ওরা অবাক। তাদেরই প্রিয় নেতাদের নাম। অতি পরিচিত, প্রত্যেক দিনকার কাজে ওদের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল।

আর আশ্চর্য। প্রত্যেকেই ওটা পড়ে, কিন্তু কেউই সে নিয়ে কোন আলোচনা করে না পরস্পরের সঙ্গে।

কিন্তু নানা রকম মন্তব্য, জিজ্ঞাসাতে বিব্রত হয়ে পড়ে ওরা। মোটর ষ্ট্যাণ্ড থেকে নদীর পোল পর্যন্ত আসতে আসতে পড়ে দু'সারি দোকান। পোলের মাথার কাছাকাছি পোস্তার সরু গলি, তার দুপাশে দোকানদার আর চ্যাংড়া কর্মচারী।

'এই লাও গো, কমুনিষ্ট (উচ্চারণ অকারান্ত) এল।'

'শালা, দেখলে মনে হয় মেনি বেড়াল। ইদিকে পুলিস মারে। ওগো বাবাগো...

কোনো অতি ফাজিল ছোকরা, বয়েশ দশ পেরোবে না, এগিয়ে এসে হয়তো কারো হাতটা একটু নাড়া দিয়ে বলে, 'ও জ্যাঠা, তোমরা কি করেছিলে, বল না? এ্যাঁ?'

কোনো দোকানদার, বয়েস হয়তো কুড়ি-বাইশ, হেঁকে বলে, 'ওগো গেঞ্জি লিবে, সরেস-গেঞ্জি' ওরই মধ্যে যারা খবরের কাগজ নিয়মিত ভাবে পড়ে, বা যারা খবরের কাগজের এজেন্ট, তারা বলে, 'দেশের সব জায়গায়ই ওই হচ্ছে। কোথায় তুমি জোড়া তালি দেবে বল।'

এই সব কথা ওরা অনেকটা বোঝে, অনেকটা বোঝে না। কেবল তারা যে একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে এখানকার লোকগুলির কাছে, সেটা বুঝতে পারে। আর লজ্জায় কেমন হয়ে যায়। মনে হয়, নিশ্চয়ই একটা বোকামির কাজ করেছে।

কোর্টের সবুজ-মাঠে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসে ওরা। একটা বড় শিরীষ গাছ, আর আম গাছ ছায়া মেলে রয়েছে অনেকখানি জায়গার ওপর। ওদের অধিকাংশই সেই ছায়ায় বসে। গাছের ওপর কাক ডাকছে। দক্ষিণ দিকে ইস্কুল, সেখানে এই মাত্র ঘন্টা পড়তে ছেলেরা হৈ হৈ করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল। প্রজাপতির মতো ছেলেগুলো লাফিয়ে বেড়ায়, মার্বেল খেলে, ছুটোছুটি করে। একটা ফুলো-ফুলো গাল ছেলে তার দাদার সংগে ওদের দেখতে এসেছিল। কী সুন্দর ছেলেটি, অমন সুন্দর ছেলে আর দেখেনি ওরা। ইচ্ছে হয়েছিল দুহাতে তুলে আদর করবে, কিন্তু হাতের যা ছিরি—ফাটা, চামড়া-ওঠা।

ছেলেটা যন্ত্রণায় মরুক শেষ কালে। কিন্তু ওর দাদা, সেও সুন্দর, সে অদ্ভুত কথা বললে। শুনে বিশ্বাস হয় না। বলে, 'আপনারা যা করেছেন এর চেয়ে ভালো কাজ হয় না। এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে আপনারাই শান্তি আনবেন।'

কালো কালো চোখ, ঠোঁট দুটি লাল, চওড়া কপাল ওর। ধীরে বলে কথাগুলি। গলার স্বর তো নয়, যেন মধু ঝরে পড়ছে। আহা রোজ যদি ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়।

ওরা একটু সরে আসে, বসে বসেই এগিয়ে ঘন হয় চারিদিকে। 'আর একটু বসেন আপনি। আরো দুটা কথা বলেন।'

'আমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি বলুন। কত ছোট আমি আপনাদের থেকে।'

ওরা তীব্র প্রতিবাদ করে, 'না, না। তাকি হয়। আপুনি কত বড়লোকের ছেলে। আপুনি বড় হলে লাট হবে, জজ হবে। আর আপনার ভাই হবে রাজা, আমাদের রাজা হবে। না, কিগো খোকা-বাবু।'

ছেলেটি একটু চুপ করে থাকে, তারপর বড় বড় জলের ফোঁটা তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসে। ও নিজে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমা খুলে চোখ মোছে।

'হ্যাঁ। তাইতো। বড় হলে লাট হব আমি, জজ হবো।'

ওরা ব্যথা পায়। এক হলকা কান্না গলার মধ্যে ঠেলে আসে, 'কাঁদছ আপুনি? আমরা মুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি বলেছি।'

'ছিঃ ছিঃ। ওকথা বলবেন না। আমার চোখের দোষ আছে। মাঝে মাঝে ভীষণ জল কাটে।'

এই সময় একজন উকীল হন্তদন্ত হয়ে আদালত-কক্ষের দিকে এগোচ্ছিলেন। ছেলেটিকে দেখে না থেমেই বললেন, 'কিগো রণু বাবু, এ আবার গর্ভ-যন্ত্রণা কেন? কমিউনিষ্টদের দলে?'

'কাকাবাবু, ভাববেন না। হীরে কয়লার খনিতে গেলে কয়লা হয় না।'

'তাই নাকি?' খানিকটে অপদস্থভাব আর খানিকটে ক্রোধ ওঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

ছেলেটি সেদিকে খেয়াল করে না। বলে, 'কিছু মনে করবেন না। খবরের কাগজে আপনাদের খবর বেরোয় না বলে, আপনাদের বিরক্ত করে গেলুম।'

পরে অবিশ্যি ওরা শুনেছিলো ওর কথা। ইস্কুলের সেরা ছাত্র।

কোলকাতার কে এক বড় লোকের ছেলে মা নেই বলে এখানে মাসি-বাড়ি থেকে পড়াশুনো করছে। এখানেই অনেক দিন আছে।

আশ্চর্য!

কিন্তু জিনিসটা ওদের ভাবিয়ে তোলে। ওরা জানতো, যে কেবলমাত্র ধান-বিক্রীর ব্যাপার নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে, তারপর সেটা দাঁড়ায় গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে। কিন্তু তারা যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে সে কথাটা ওরা বুঝতে পারে না। বুঝবার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু ওই ছেলেটিকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। বোধ হয় তাই হবে, তাই হবে।

অজান্তে ওদের ছাতি ফুলে ওঠে। এই দুপুরের বাতাসটা অতি ভালো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়।

একুশ

নানাকারণে অজয় রায়ের মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এতদিন তাঁর নিজের উপর একটি দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, এখন সেটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে। আজকাল যেন মনে হয়, তিনি যা করেন, তা ঠিক তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী নয়। আর অবাঞ্ছিত কাজ করার একটা হীনমন্য-ভাব তো আছেই। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে তাঁকে কোন কাজ করতে হয়, এটা কল্পনা করতেও লাগে। কোনদিন তিনি কারো কথা শোনেননি, যদি সেটা তাঁর মনঃপূত না হয়। তাঁর ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা দুজনেই গ্রাজুয়েট, কিন্তু তিনি মাট্রিকের পর আর পড়েননি। লোকে নিন্দে করেছিল, বাবাও বলেছিলেন, 'সে কিরে, তোরা কোথায় আমাদের ছাড়িয়ে যাবি, তা না করে পেছিয়ে পড়লি যে। লোকে কী বলবে।' জবাবে তিনি বলেছিলেন, কিসে কি হয়, সেটা ওরা কী বুঝবে।'

তাছাড়া কাজকে তিনি মনে করতেন লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়ক হিসেবে। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলো, তাতে অনেক রকম কাজ তোমায় করতে হবে। ভালোও, খারাপও। কি তোমার উদ্দেশ্য যদি ভালোই হয়, আর তার প্রতি যদি তোমার আস্থা থাকে, তাহলে জানবে ছোট কাজের পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু অনাবশ্যক ক্ষুদ্রতা, বা নিতান্ত লোভের ক্ষুদ্রতা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, তাতে মানুষ ছোট হয়। সেই ছোট-কাজগুলি মানুষকে চেপে ধরে, তার অগ্রগতি রুদ্ধ করে।

এটা অবিশ্যি ঠিকই, যথাযথভাবে সব কাজগুলি করে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ওদিকে ভুলত্রুটি ঘটবেই। কিন্তু সে ত্রুটি সামলে উঠতে কতক্ষণই বা।

কিন্তু আজকাল তাঁর মনে হয়, তাঁকে অনাবশ্যক ছোট-কাজ করতে হয়। বাধ্য করা হয় তাঁকে। আর এই চেতনাই তাঁকে কাহিল করে তুলল।

এই ধানগাছিয়াতে নব-মল্লিকের ধান লুঠ নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল

তারপর প্রয়োজন বোধে একটা পুলিস ক্যাম্পের জন্তে তিনি দরখাস্ত করেছিলেন। আজকাল বলা যায় না কিছু, একদল হতভাগা কেবলই চাষাদের খুঁচিয়ে খাড়া করছে, কখন কী ঘটবে কে জানে। সে অনেক দিনের কথা। তারপর শ্যামগঞ্জের ঘটনা ঘটেছে, শীরষের ঘটনা ঘটেছে।

তাঁর বাড়ির পাশেই, হাত কয়েক ব্যবধানে, একটা কাছারীর মতো ছিল। সেইটিতে পুলিস ক্যাম্প হয়েছে। তিনি দরখাস্ত করেছেন, প্রধানত তাঁরই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। যখন পুলিস ক্যাম্প হয়েছে, তখন তাদের একটা ঘাঁটির বন্দোবস্ত করতেই হয়। তাঁর কাছারীটা ছাড়া উপযুক্ত স্থান আর হয় না।

আর, শীরষের ঘটনা ঘটার পর, ধানগাছিয়াতে এক রকম থানাই বসেছে, তাঁর কাছারীই হয়েছে কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার। পুলিসের সংখ্যা বেড়েছে। হাবিলদার নয়, অফিসার এসেছেন একজন, আই. বি-রা সংবাদ আদান-প্রদান করেন। খবর আসে, সেই অনুযায়ী নির্দেশ যায়।

প্রথম প্রথম সয়ে গিয়েছিল। হাবিলদার আর তার দুচারজন সহকর্মী এই নিয়ে ছোট্ট দলটুকু ছিল। বিশেষ কিছু চোখের ওপর ঠেকত না। কিন্তু যতই দল বড় হতে থাকে, ততই তাঁর অসহ্য হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। তাঁর মনে হয়, হঠাৎ তিনি লোকের চোখে বেখাপ্পা ধরনের হয়ে উঠেছেন। তাঁরই প্রয়োজনে এত সশস্ত্র পুলিস তাঁকে ঘিরে রয়েছে। অতি অসহায় কোন প্রাণীর মতো নিজের চারদিকে পাহারার দেয়াল তুলে জবুথবু হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু এমন করে থাকা তাঁর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী।

নিরাপত্তা অবিশ্যি তিনি চান। কিন্তু সে নিরাপত্তা সবার থেকে অন্য রকম হবে কেন। কই, আর কারো বাড়িতে তো থানা বসেনি।

এই জিনিসটা অহরহ তাঁকে ক্লান্ত করে তোলে। বাইরে বেরোও, তোমার সামনে ওরা খৈনি ডলছে; জানালা দিয়ে তাকাও, বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাক, ওরা সিয়ারাম সিয়ারাম হাঁকছে।

এই কি তিনি চেয়েছিলেন?

কত কল্পনা ছিল তাঁর ছেলেবেলায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্রাক্টর চালিয়ে চাষ করবেন। তার জন্যে একসঙ্গে অনেক জমি দরকার। আর, কাজেও তিনি সেই দিকে এগোচ্ছিলেন। নিজের গ্রামে অনেক জমি কিনেছেন তিনি, বেশি দামও দিতে কুণ্ঠিত হননি।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করবেন। ইস্কুলে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার এক জায়গায় ছিল, 'সপ্তাহে একদিন গ্রামের

সমস্ত বালক বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মিলিয়া ম্যালেরিয়া বিতাড়ন করিব। কচুরাপানা ধ্বংস করিব, খানা ডোবা ভরাট করিব…'গ্রামের লোকেরা সুস্থ সবল হবে, প্রত্যেকের ঘরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, এই তিনি কল্পনা করতেন। তিনি অনেক জমির মালিক যখন হবেন, তখন প্রজা বসাবেন না, তাতে মানুষকে অধীন করা হয়। তার চেয়ে মজুরী দেবেন তাদের।

অর্থাৎ নিজের শুধু নয়, সংগে সংগে দেশেরও উন্নতি করবেন। আর এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল, একদিন তাঁর দেখাদেখি সবাই সে আদর্শ গ্রহণ করবে। ফলে দেশ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হবে।

কিন্তু সে আশা গেল কোথায়? প্রথম প্রথম বেশ চলছিল। কিন্তু তারপরে কোথায় যেন ভাঁটা পড়ে। যতই তাঁর জমির পরিমাণ বাড়ে, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁকে আরো সাবধান হতে হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিস পাহারার মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছে।

এক-একবার মনে হয়েছে, ওই সব ক্যাম্প-ফ্যাম্প তুলে দেন। তাতে যা হয় হবে। দরকার তো ছিল কেবলমাত্র তাঁর ধানের গোলা সামলানো নিয়ে। তা যদি লুঠ হয় তো হোক। কিন্তু এমনি এক পরিবেশের মধ্যে থাকা, এ অসহ্য।

তাছাড়া ওরা যে কোন দিন কাজে আসবে সে তো মনে হয় না। যা দেখা শোনা যায়, সেটা সত্যি হলে, ওদের সাহসের দৌড় তো খুবই। দিনে-দুপুরেই নাক ডাকিয়ে দেয় ওরা, রাত্রে মেয়েরা এসে বঁটি দিয়ে গলা কেটে দিলে তারপর হয়তো বলবে, 'কোই হায়?'

হরিকে একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা বলেছিলেন। হরি শুনেই পান-চিবানো জিব বের করে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'তাও কি হয়। আজকালের ব্যাপার বাবাজী, লোক থরথর করে কাঁপছে, কখন কি হয়, কখন কি হয়। আর এই সময় আপনার মাথায় ঐ কথা ঢুকল কি করে। তবে, ঐ যে বললেন, ওদিকে দিয়ে কাজ হয় না কিছু সে কথা আলাদা। তবু, কাজ ওদিকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তারও দাওয়াই আছে। দাওয়াই সবেরই আছে, বাবাজী, কেবল জানতে হয়…'

সে দাওয়াই একদিন প্রয়োগ করল হরি নিজেই। পুলিস অফিসারের হাতে মালতী মেয়েটাকে ঘুষ দিয়ে। কিন্তু দাওয়াইটা যে কিসের জন্যে অজয় আজও তা বোঝেন না।

মালতী যেদিন হরিকে এসে বললে, 'আমাকে একটা ঝি-গিরি দেন।

রোজগার আর হচ্ছেনি। না খেয়ে আছি', সেদিন হরি বিশ্বাসই করতে পারেনি। আর কেউ হলে আত্মহারা হত, কিন্তু হরি, তৎক্ষণাৎ ওকে এনে অজয়ের বাড়িতে লাগিয়ে দিলে। বললে, 'বাবাজী, মেয়েটাকে রেখে দিলম। হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলে, খেতে পাচ্ছেনি...'

'কিন্তু ঝি আর আমাদের কি হবে? ঝি-চাকরের অভাব কি, তাছাড়া কুল-বৌ (তাঁর সম্পর্কীয় ভ্রাতৃবধূ) তো রয়েছে,' তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। কিন্তু হরির ব্যক্তিগত লোভের তদারকি করায় তাঁর তখন মন ছিল না, এক সময় যদিও একটু নজর রেখেছিলেন।

হরি বললে, 'তা কি করে হয়, আজকাল কাজ বেড়েছেনি? ওরা ছুটিতে পারবে কি করে?'

হরিকে বুঝতে বাকী ছিল তখনও। ও আরো এক কড়া চাল চাললে।

সেদিন থানা থেকে অফিসার-ইন-চার্জ এসেছেন তদারক করতে। চা খেতে খেতে হরির সংগে গল্প করছেন। এমন সময়, মালতী জল আনতে যাচ্ছিল মোনা-দিঘিতে, হরি ডেকে বললে, 'কেটলীটা নিয়ে যাও তো মালতী।'

মালতী আসতেই বললে, 'এই ইনি আজ সারা দিনরাত এখানে থাকবেন। যখন যা দরকার হবে, দিয়ে যাবে তুমি। চা, খাবার সময় ভাত—বুঝলে?' অফিসারটিকে বলেন, 'খুব ভালো মেয়ে, আলাপ করে আপনি দেখবেন। লেখাপড়া জানে একটু একটু, গরীব বলে তাই ঝি-গিরি করছে।'

এই জঘন্য নীচতাকে অজয় নিজের বলেই মনে করেন। আজকাল তাঁর চিন্তা এমনই হয়েছে, তাঁর কাজ বা তাঁর সংক্রান্ত কোন কিছুর জন্য যে যাই করুক না কেন তার দায়িত্ব তিনি নিজে অনুভব করেন। তিনি ভেবেই পান না, চারদিকে এত কর্তব্যবোধের অভাব এল কি করে।

কিন্তু ক্রমশ তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর আর গায়েই লাগে না যে, অফিসারই আসুক বা তাঁর ওপরওয়ালাই আসুক, মালতীকে চা দিয়ে আসতে হয়, ভাত দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সাধারণ পুলিসগুলোর অবস্থা দেখে হাসেন উনি। ওরা টেরচা করে তাকায়, কিন্তু যেখানে বড় বড় ওপরওয়ালাদের ব্যাপার, সেখানে মাথা গলায় কী করে? কিন্তু কখনো যদি সুযোগ পায় কথা বলবার, দিল উজাড় করে দেয়। আর আশ্চর্য, মালতী ওদের সংগেই কথা বলে বেশি, প্রাণ খুলে আলাপ করে।

একটি পুলিস কিন্তু একদিন বেসামাল হল। মালতী জল আনতে বেরিয়ে গেছে, ও বললে, 'দাঁড়া ভাই, একটু পায়খানা ফিরে আসি', বলে জোর পায়ে

এগিয়ে একটা তালগাছের তলায় ধরল মালতীর হাত। কয়েকজন চাষা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। সিপাহীটাকে ধরে মার লাগাতে লাগাতে টেনে নিয়ে এল ওদের ঘাঁটিতে। 'বিচার চাই।'

গাঁয়ের বৌ-ঝিরা তাহলে থাকবে কি করে? শুধু এইটেই নয়, আরো অভিযোগ ওদের আছে। মাঝে মাঝে পুলিসগুলো এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি মারে, সেটা কী আর ওরা দেখেনি।

অতএব, বিচার হল। পুলিসটির শাস্তি হল কারাবাস।

কিন্তু ওর সহকর্মীরা খেপে গেল। ওরা নিম্নপদস্থ বলে তাদের বেলাতেই যত শাস্তি। গুমরে গুমরে ছিল তারা। তারপর একদিন ঘটনা একটা ঘটালে।

তখন কোন অফিসার ছিলেন না, অজয় বাইরে কোথায় গিয়েছেন, পাশাপাশি হতভাগা চাষার দলও নেই। শুধু মালতীকে নয়, ফুল-বৌকে শুদ্ধ নিয়ে কাছারী ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করে দিলে। ওরা দু'জনে স্নান করতে যাচ্ছিল।

অজয় প্রথম দিন গুম হয়ে বসে রইলেন। দ্বিতীয় দিন কাঁদলেন (এই প্রথম)। তৃতীয় দিন সদরে, আর প্রাদেশিক দপ্তরে দরখাস্ত পাঠালেন, 'ক্যাম্প উঠিয়ে নিন। আমার আর দরকার নেই। এর পর ক্যাম্প আমার এলাকায় রাখা সম্ভব হবে না।' আসল কারণটা উহ্য রেখেছিলেন, সেটা তাঁর মান-অপমানের প্রশ্ন। কিন্তু সরকারী কাজে আইন আছে, মান-অপমানের প্রশ্ন নেই। জবাব এল, 'দরখাস্তে দাবির অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি দেখানো হয়নি।'

এদিকে সেই অঞ্চলটার সমস্ত জোতদার-মহাজন মায় শীরষের অনুতোষবাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'সে কী করে হয়। সমস্ত অঞ্চলটার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র হচ্ছে ওটা। সমস্তটার শান্তি এখানে ওটা থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে।' অতএব রইল সেটা।

বাইশ

লখীন্দর বিছানা থেকে উঠে বসল মাসখানেক পরে। চলা-ফেরা করতে, মাঠে যেতে আরো একমাস।

কবিরাজ বলেছেন, 'কোন-রকম চিন্তা করবে না লখীন্দর। তাহলে আবার তুমি ঘুরে পড়বে। তোমার রোগ হয়েছে শিরঃপীড়া, বড় কঠিন ব্যাধি।' তাই লখীন্দর কোনোরকম চিন্তা করে না। ও শুধু চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তো অলস থাকতে পারে না, তাই ক্রমশ চিন্তার স্রোত মাথার মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। আর সেটাকে ঠেকানোর জন্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে গল্প করতে বসে।

মাথায় যখন তার অসহ্য যন্ত্রণা হত, তখন তো নয়ই, যখন সেই যন্ত্রণাটা বন্ধ হল, তখনও কিছু দিনের জন্যে কোন চিন্তা ছিল না লখীন্দরের। সে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব, ঘটনার পারম্পর্য হারিয়ে একাকার হয়ে যেত। তার মস্তিষ্ক এতই দুর্বল ছিল যে কোনো কিছু সম্বন্ধে ধারণা করতে অনেক সময় লাগত। হয়তো টুকি জায়গা করে তার জন্যে উঠোনে দিয়েছে ভাত, আর কলমি শাক ভাজা একটু, তার সংগে লাউ-ডাঁটার ঝোল। 'বাবা ভাত খাবে এস।' বলার পর টুকির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে লখীন্দর, তারপর বুঝতে পারবে যে তাকে ভাত খেতে ডাকা হয়েছে। ভাত খেতে খেতে হয়তো সামনের দিকে পেঁপে গাছটার দিকে তাকায় লখীন্দর। একটা কাঠ বিড়ালী এডালে-ওডালে ঘোরাফেরা করছে। সেই দেখতে গিয়ে বাকি সব ভুলে যায় সে, তারপর কাঠবিড়ালীকেও ভুলে যায়। টুকি আবার তাড়া লাগায়, 'বাবা, খাওগো। মাছি বসে গেল।'

'হ্যাঁ মা, খাই।'

একটু একটু করে ওর বল ফিরে আসে। আর সেই সংগে মস্তিষ্কের শক্তিও বাড়ে। এখন আর ভাত খেতে ডাকলে বুঝতে দেরী হয় না, বরঞ্চ ভাতের

আশায় বসে থাকে ও। 'মা টুকি গে রান্না হল?' ও ভাত খায়, আর সন্ত জেগে-ওঠা খুশিতে এটা ওটা দেখে। পেঁপে গাছ থেকে নেমে একটা গিরগিটি পাশের করঞ্জা গাছে উঠল, একটা কাক উড়ে গেল করঞ্জা গাছটার থেকে, তারপর সামনের আলু জমির বেড়াটায় গিয়ে বসে। সেই বেড়াটার ধার দিয়ে একটা ছাগল মাঠের দিকে যায়, কালোতে সাদাতে ছোপ-ছোপ ওটার রঙ। ওরা বেশ সুখে আছে।

মাঠের রঙ তখন জষ্টির রোদ্দুরে তামাটে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, কেমন মাথা ঘুরে যায়। আজকাল কি মাঠে লোকজন যায় না? গোরুবাছুর কই?

'মা টুকি, হাত ধুবার জল দেগো...'

'দিই বাবা...' অতি দূর থেকে যেন ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। নিস্তব্ধ দুপুরের মধ্যে ওর কণ্ঠস্বরটা অতি একাকী বলে মনে হয়।

ও জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে, তোরা মাঠে-ঘাটে আর যাউনি না কি? গোবর গুড়াতে যাউনি, কি গরুবাছুর লাড়তে?'

'কেনে যাবনি বাবা, যাইত।'

'তবে দেখ দিকিন, মাঠে একটা জনপ্রানী নাই কেনে? একটা গোরু-বাছুরও নাই।'

'কি রোদটা হইচে দেখছনি? এই রোদে আবার কেউ বেরায়। মরে যাবে যে। বিকাল বেলা আমরা যাই।'

'কই, তাওত দেখিনি। তোরা কখন যাউ?'

'হ্যাঁ গো বাবা, বিকালে যাই। দেখবে তুমি।'

অতএব বিকেলে ডান হাতে একটা লাঠি, আর মাথায় লাল গামছা ফেলে লখীন্দর উঠোন থেকে বাইরে নামে, সেখান থেকে সীমানার বেড়া পেরিয়ে সামনের চটিটার একটা অশত্থ গাছের তলায় বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সূর্য অস্ত যেতে দেরী নেই আর বেশি। দূরে পদ্ম-দীঘির পাড়ের নিচে যে সাদা জমিটা আছে, সেটা চকচক করে উঠেছে। এক ঝাঁক পাখি দূর থেকে উড়তে উড়তে লখীন্দরের মাথার উপর দিয়ে কোথায় চলে গেল।

পুরনো দিনের কথা লখীন্দরের মনে পড়ে। এই মাঠে এমনি সময় একদিন কত লোক যাতায়াত করত। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এ গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে আসত যেত লোকজন। কত গোরু-বাছুর হাম্বা-হাম্বা করেই মাতিয়ে রাখত।

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। গাঁটা খাঁ-খাঁ করছে।

কেমন একধরনের নিঃসংগতা বোধ করে লখীন্দর। যেন ওর বুকটা কেউ চেপে ধরে আছে। যেন কেউ পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। স্বপ্নে যেমন হয়, কেবলই নিচে পড়ে যাচ্ছে যেন, কেবলই নিচে।

এই অস্বস্তিটুকু দূর করবার জন্যে টুকি আর অধীরকে ডাকে ও।

'বিনন্দরাখালের গল্প জান? শুন তবে।'

অতি দুঃখিনীর ছেলে বিনন্দ রাখাল। লক্ষ্মীর পূজো করে ওর অবস্থা ভাল হল। শ্মশান-মশান সব ভেঙে চাষ করল সে। লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তি থাকার জন্যে যেখানেই সে ধান বোনে সেখানেই ধান লাফিয়ে ওঠে। শেষে রাজা হয়ে গেল সে।

বিরাট রাজা তাকে শেষ পর্যন্ত অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। বুঝলে বাবা, লক্ষ্মীর উপর ভক্তি রাখতে হয়, তাহলে সব হয়।

'আর একটা বল, বাবা...'

'আচ্ছা। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প জান? শুন তবে...'

এক সময় লখীন্দরের ভালো লাগে না আর। ওরা যতই জেদাজেদি করে ও ততই বলে, 'কাল আবার বলব...', শেষকালে ধমক লাগায়। কিন্তু পরের দিন ওরা যখন আবার বলে, তখন ওর আর বলতে ইচ্ছে করে না। কি হবে এসব বলে।

এক সময় ছেলেগুলোকে পাশে বসিয়ে কোলে শুইয়ে কত আরাম পেত সে। কিন্তু এখন ওরা পাশে এসে যদি আগডুম-বাগডুম করেছে, কী চেঁচামেচি করেছে একটু, ও ধমকে উঠ্‌বে, 'যা, বিছানায় শুগে যা...'

এই সময় লখীন্দরের ওপর সরকারের নতুন নির্দেশ এল। অন্তরীণ অবস্থায় প্রত্যেককে হপ্তায় একবার করে থানায় হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। লখীন্দরের কঠিন অসুখের কথা বিবেচনা করে সরকার এতদিন ওকে রেহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো সে চলাফেরা করতে পারে, অতএব তাকে হাজিরা দিতেই হবে।

যদিও তার শরীর এখনও খুব দুর্বল, তবুও বাধ্য হয়েই থানায় যায়। ওদের গ্রাম থেকে থানা কমসে কম মাইল ছয়েক হবেই। তাই প্রথম দুবার ও পাল্কীতে করে যায়, তৃতীয় বারে হেঁটে। অতি ভোরে তখনও কাক-কোকিল 'বাম' দেয়নি সেই সময় বেরিয়ে গেল ও। সঙ্গে গামছা আছে, দরকার হলে ভিজিয়ে মাথায় দেবে। ছাতাও আছে সঙ্গে। অন্যেরা তার অনেক পরে বেরোল, হাজিরা দিয়ে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু লখীন্দর

দুপুরটা কাটাল ওখানে, তারপর বিকেলে রোদ্দুরের তেজ কমতে আবার রওনা হল।

অনেকের ওপরেই অন্তরীণ আদেশ আছে দেখা গেল। আবার একই দিনে সবাইয়ের হাজিরা দেবার নির্দেশ নেই, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন লোক আসে। কিন্তু ঝাঁকরার ডাক্তার সোমনাথ বাবু আর দোকানী মনোহর সিংএর ওপর কেন এই আদেশ হল, তা বোঝা যায় না। অতি নিরীহ মানুষ ওরা, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। অবিশ্যি, হিসেব করলে সবাই তো প্রায় নিরীহ মানুষ, গেলবারের গোলমালের সময় ওঁদের অংশগ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। শুধু সরকার সন্দেহ করে এই আদেশ দিয়েছেন।

কারো কারো সঙ্গে কথা হল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল কেমন একটা। দেখলেই গলাগলি করবার অবস্থা। কিন্তু এখন অতি সাবধানে, সন্তর্পণে কথা বলে সব।

'জান লখীন্দর, একটি লোক বাকি নাই এই দশখানা গাঁয়ে। কোনরকম শাস্তি প্রত্যেকেই পেয়েছে। যারা অন্তরীণ হয়নি, তারা ধরা পড়েছে। এদের সংখ্যাই বেশি। আর এদের অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। পনেরো দিন ছাড়া ওদের ঘাটাল-মেদিনীপুর ছুটতে হয়, পাঁচ মাস হয়ে গেল ওদের এখনো মামলা রুজু হয়নি। যেতে আসতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ঢেঁকি বিক্রী পর্যন্ত করছে কেউ কেউ। দেশটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।'

লখীন্দর বাড়ি ফেরে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কোন রকমে উঠোনে বসে, একঘটি জল খায়। মাথাটা দপদপ করছে। দেখ, আবার কি হয়।

লখীন্দরের হঠাৎ মনে হয়, ও আর বাঁচবে না। আর, তাও তো অস্বাভাবিক নয়। বুড়ো হয়ে গেছে সে, এখন তো তার যাবার সময় হয়েছে। হাঃ ভগবান!

সেদিন শোবার সময় বউকে ডেকে বললে, 'বস একটু।'

তারপর বললে, 'আমার এবরে যাবার সময় হয়ে এল। কিন্তু ছোট ছেলেটা আর মানুষ হলনি। যাক, ভগবান মানুষ করবে। ই কটা দিন শান্তিতে কাটাতে পারলেই হল...'

'উকথা বলতে নাই...'

লখীন্দর প্রসংগান্তরে যায়। 'বলি, বউ, তুই নাকি কাঁদু সুধীরের জন্যে? টুকী বললে।'

নিজেই আবার বলে, 'কাঁদতে নাই ছেলার জন্যে। থালে অমঙ্গল হয়। আর সুধীর ত কুচু খারাপ কাজ করেনি। ভাল কাজই সে করছে। ভালয় আছে সে, আমি খবর পেইছি। ত পাঁচ জনের যদি মঙ্গল হয় তাতে, তা সে গেলেই বা। কাজটা ত ভাল।'

সুধীরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর একদিন কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে ও। এসে গোবিন্দর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। লখীন্দর শুধালে, 'কিন্তু, তুই আর উ-কথা ভাববিনি বল।'

গৌরী বললে, 'না, আর ভাববনি।'

কিন্তু কথা রাখতে পারেনি গৌরী।

একদিন রাত্রে চুপ করে পড়ে আছে লখীন্দর, এমন সময় ও শুনতে পায় কে যেন অতি মৃদুমৃদু কাঁদ্‌ছে। অতি আস্তে, টেনে টেনে। প্রথমটা ও ভেবেছিল, গাঁয়ের অন্য কেউ হবে হয়তো, কিন্তু পরে বুঝলে, না, বাড়িতেই কাঁদ্‌ছে। তার আর সন্দেহ রইল না যে গৌরী ছাড়া অমন করে আর কে কাঁদ্‌বে। ও আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল। দরজাটা একটু ফাঁক করা আছে, তার ভেতর দিয়ে দেখা যায় গৌরী বালিশে মুখ রেখে কাঁদ্‌ছে। ও কি বলছে অনেক চেষ্টা করে বুঝলে লখীন্দর: 'আমার সনার সংসার গেল...হা বাবা, সুধীর রে...' আর সব কী বলছে বোঝা যায় না।

লখীন্দর আস্তে আস্তে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল।

গৌরী বুঝতে পারেনি, তাই এক রকম লাফিয়ে উঠল ও। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কান্না বন্ধ করে লখীন্দরের পা জড়িয়ে ধরলে, 'না না, আমাকে তুমি মেরনি, আর আমি কাঁদ্‌বনি। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

লখীন্দর কি জানি কেন হঠাৎ রেগে তালপাতা হয়ে ওঠে, 'পা ছাড়। আমি কি তোকে মারতে এসেছি। এমন কথাটি বললি তুই আমাকে? কখনো আমি তোর গায়ে হাত তুলেছি? ছিঃ ছিঃ। কাঁদ তুই যত পারু, ঝকমারি করে এসেছিলম আমি।'

ছিঃ ছিঃ, মেয়েটা তাকে এই বুঝল! সান্ত্বনা দিতে এসেছিল লখীন্দর, কিন্তু মেয়েটা ভাবলে তাকে শাস্তি দিতে এসেছে। কি নোংরা মন ওর।

কিন্তু পরক্ষণেই ওর উত্তেজনা শান্ত হয়ে আসে। গৌরীর ওপর ওর রাগ তো থাকেই না, উপরন্তু ওর সঙ্গে কটু-ব্যবহার করেছে বলে লজ্জিত হয়ে পড়ে। আহা, মেয়েটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কেমন অসহায় ভাবে তার পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে আবার অপমান করে?

তার মনে পড়ে, কী জন্তে কাঁদ্‌ছিল গৌরী। তার সোনার সংসার ছারখারে যাবে এই তার আশঙ্কা। সত্যিই তো, এই আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি। লখীন্দর তো বুড়ো হয়ে গেছে, তার আর শক্তি নেই। তা ছাড়া, সে এখন আগেকার মতো কী সংসারে মন দিতে পারে? না তো। কত-রকম চিন্তা তার সংসারে। তার ওপর যোগ্য ছেলে সুধীর চলে গেল। এখন কী ভরসায় ও বুক বেঁধে থাকে? অধীরকেই বা মানুষ করবে কী করে। টুকিটার বিয়ে হবে কী করে।

যতদিন বাড়ির কর্তা বেঁচে আছে ততদিন এসব চিন্তা করতে নেই, অমঙ্গল হয়। তবু, গৌরী এই চিন্তা করেই হয়তো অমন কেঁদেছে, আর, ধরা পড়ার ভয়ে পা জড়িয়ে ধরেছিল তার। তার কী দোষ।

না, এমন ভাবে আর থাকলে চলবে না।

তার পরের দিন ও মাঠে গিয়ে হাজির হয়। জমির আগাছাগুলো কোদাল দিয়ে কেটে ফেলে। এবারে ভালো করে জমি তৈরী আর হবে না। এর আগে লাঙল দিতে পারলে হত, কিন্তু তার অসুখ, আর সুধীরও ছিল না, তাই চাষ পড়েনি। লখীন্দর দেখল, অল্পবিস্তর প্রায় সবারই ঐ অবস্থা।

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এবারে চাষ-বাসের অবস্থা তাহলে এই। মানুষ বাঁচবে কী করে। সে যাই হোক, নিজেরটা সামলানো আগে দরকার। সুধীর নেই বলে ও মুনিষ খুঁজতে বেরোল। কিন্তু, পেল না। অনেক মজুর পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। তারা রোজ আনত রোজ খেত, গোলমালের সময় কাজ বন্ধ হয়ে গেলে খায় তারা কি? যারা তখনও ছিল, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত।

চিন্তা করে থই পায় না লখীন্দর। কি হবে তাহলে?

ওর ভেতরে সেই অসহিষ্ণু ভাবটা আবার ফিরে আসে। কোথাও সে দু-দণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। কোন দিক দিয়ে সে শান্তি পাচ্ছে না এতটুকু। চারদিক নিরুপায়। যে দিকে ও চোখ ফেরাচ্ছে, সেদিকটাই ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে।

সেই একা একা মনে হয় তার। আর এইটেকেই সব চেয়ে ভয় করে সে। অসুখের পর তার ঐ এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আর প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখে, অনেক উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছে সে, অতি নিচে, অতি বেগে……কোথায়?

গৌরীর কাছে গিয়ে বসে লখীন্দর। সবেমাত্র গৌরী কাজকর্ম সেরে ছেলেদের ঘুম পাড়িয়েছে। লখীন্দর ওর হাতটা ধরে বসে রইল, মাঝে মাঝে

হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পিঠে। গৌরী প্রথমটা কিছু বুঝলে না, তারপর বললে, 'যাও, শুতে যাও তুমি। তোমাকে আলো দেখি' দি চল।'

'না, বউ, আমি শুবনি এখন। তুই একটু কাছে বস আমার। তুই বসলে আমি একটু আনন্দ পাই।'

আবার লখীন্দর হাত বুলিয়ে দেয়। 'তুই বড্ড রগা হয়ে গেছু বউ।'

অতি সন্তর্পণে এগোয় লখীন্দর। মনে হয় অতি-সূক্ষ্ম তারে ঝুলছে তাদের এই সম্পর্ক। অতি মোলেয়েম করে তাকে নাড়া চাড়া করতে হবে। এতটুকু নিশ্চিত নির্ভর নেই কোথাও। এতটুকু উচ্ছ্বাস বা আনন্দের ভার সইবে না। ক্ষীণ একটি জলরেখা বালির মরুভূমি পেরিয়ে এগোচ্ছে। কে জানে হঠাৎ কোথায় শেষ হয়।

'তোদের জন্যেই বেঁচে আছি। তোরা সুখে থাকবি বলে তবু খাটাখাটুনি করতে ইচ্ছে যায়। তবে, বউ, ই কথা তোরা মনে রাখবি, তোদের মুখ চেয়েই আমি আছি। আমাকে হীন-ছিন করিসনি...আমাকে দুটো মিষ্টি কথা বলে সন্তুষ্ট করবি। তাতেই আমি খুশি। আমি যদি দু'দিন উপাস দিই তাতে কুনু আমার খেদ নাই, কিন্তু তোরা হেলাফেলা করলে আমি মরে যাব, মরে যাব!'

তেইশ

সেদিন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে সন্ধ্যা-বেলা। সেই মাত্র সন্ধ্যে হয়েছে, তবু চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। লখীন্দর চুপ করে উঠোনে বসে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছিল। বৃষ্টি পড়ার কতরকম শব্দ যে বেরোয় তার ঠিকানা নেই। পেঁপে গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ে এক রকম শব্দ হবে, করঞ্জাগাছের পাতায় আর এক-রকম, আর আম গাছের পাতায় আরো এক রকমের। আর সব মিলে সে এক অদ্ভুত শব্দ। এত আনন্দ দেয়। লখীন্দর এই বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভালোবাসে তাই। সে চোখ বুজে শব্দ শুনে বলে দিতে পারে কোন পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ছে।

ওদের বাড়ির চারদিকে কঞ্চি আর বাতা দিয়ে একটা বেড়া-দেওয়া। তার ফটকটায় কেউ কি নড়ল? অন্ধকারে ঠাওর হয় না, কিন্তু বোধ হয় কে যেন দরজাটা ঠেলল। হ্যাঁ, পরিষ্কার শব্দ হয়। এমন সময় কে আর আসবে।

সেই মূর্তিটি কাছে এসে বললে, 'লখীন্দদাদা!'

'কে, সতীশ? এস ভাই, এস...'

'একটু আস্তে। তোমাকে বারান্দায় পেয়ে খুব ভালো হল। ভিতরে থাকলে কী অসুবিধেই না হত, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা জেনে যেত...'

'তুমি এসেছ বলে খুব আনন্দ হচ্ছে, ভাই। কতদিন তোমাদিকে দেখিনি। দাঁড়াও, তোমাকে একটা কাপড় এনে দি, তুমি ভিজা জামা-কাপড় খুলে ফেল।'

'হৈ-চৈ কোরনি। জানো ত আজকালকার অবস্থা...'

দুজনে বসল ওরা। লখীন্দর কেমন আছে জিজ্ঞেস করল সতীশ।

'কেমন আর থাকব ভাই। আমাদের আর কি, আমরা ত পা বাড়ি দিচ্ছি......'

'সে কথা কে বলতে পারে। বাঁচা-মরার কথা নয়, মানুষকে যতদিন বাঁচতে হয়, ততদিন কাজ করতে হয়। আর কর্মের প্রয়োজনেই শরীরধর্ম পালন করা দরকার।'

যাক সে কথা।

সতীশ বললে, সুধীরের খবর সে নিয়ে এসেছে। ভালোই আছে। লখীন্দরের খবর জানতে চেয়েছে সে।

লখীন্দর হঠাৎ চুপ করে যায়। তারপর বলে, 'তাকে বলবে, আমার অবস্থা ভাল নয়।'

'লখীন্দদাদা, একটু আগে যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তাতে আমি মনে করেছিলম যে তুমি ভাল আছ।'

হঠাৎ দুরন্ত অভিমানে লখীন্দর কেমন ছেলেমানুষের মতো অবুঝ হয়ে ওঠে।

'ভাল আছি সে আমিই আছি। তাকে বলবে, যে বাপ-মায়ের কি হল না হল দেখেনি, তার অত খবর লিবার ঘটা কেনে।'

সতীশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্তভাবে বললে, 'আচ্ছা, একথা আমি তাকে বলব।'

'আর তাকে বলবে, সে যেন ঘর-মুখো না হয়।'

'আচ্ছা, তাও বলব।' তারপর সতীশ বললে, 'আমি তাহলে আজ আসি। আর একদিন আসব।' বলে সতীশ উঠোন থেকে নেমে পড়ে। দু'এক পা এগিয়েছে, এমন সময় লখীন্দর অত্যন্ত আগ্রহ ও অনুনয় করে ডাকলে, 'ভাই, শুন, শুন...'

সতীশ ফিরে এসে উঠোনে ওঠে।

'তোমরা সব কেমন আছ বললে নি? তোমাদের কাজ-কম্ম কেমন চলছে?'

'তোমার আজ মন ভালো নেই, লখীন্দদাদা। আর একদিন এলে কথাবার্তা হবে।'

'তা কি আর হয়। কতদিন পরে তোমাকে দেখলম। তোমাদের দুটা কথা শুনি।'

সতীশ বলে, 'সেই কথাই ত বলতে এসেছিলম। শোন তবে। আমরা অতি বে-কায়দায় পড়েছি, কোন-রকম কাজ-কর্ম আর হচ্ছে না। চারদিকে একরকম সব চুপ চাপ। তাই জানতে এসেছিলম, এখানকার অবস্থা কেমন। তুমি তো এখানে রয়েছ, কিছু কাজ করার সম্ভাবনা আছে কি?'

লখীন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শুধোলে, 'সতীশ, তুমি কি মনে কর আমি আর তোমাদের কাজ করতে পারব?'

'আমরা তোমার ওপর অত্যন্ত ভরসা রাখি।'

'সত্যি বলছ ?'

'লখীন্দদাদা, তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যেক সমস্যাকে তুমি একেবারে সোজাসুজি দেখতে পাও। তুমি যদি সত্যই কাজ কর, তাহলে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল করতে পারবে।'

'কি জানি, ভাই। কিন্তু এখন আমার নিজের উব্‌রে একটুও ভরসা নাই। এখন আমি কিছু করতে পারিনি। সতীশ, বলতে পার, কেনে এমন হল ?'

'অসুখ করে তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। সেই জন্যে বোধ হয়।'

'তাই হবে হয়ত। বলে চুপ করে রইল লখীন্দর অনেকক্ষণ। তারপর বললে, 'আমার এখন ভয় হয়। মনে হয় আমি একলা। আমার চারপাশে কেউ কোথাও নাই। আমি মরে যাব ভাই, মরে যাব। আমার দ্বারা কিছু হবেনি।'

সে আবার বললে, 'আর দেখ, সতীশ, মিত্যুকে আমি কুনুদিনও ভয় করিনি। আগে ভাবতম, মানুষকে ত মরতেই হবে একদিন, তাতে দুঃখ কী। ইস্তি-পুত্ত-কন্যার মুখ দেখে যে মরতে পারে, তার তুল্যি আনন্দ নাই। কিন্তু এখন আমি ইস্তি-পুত্তকে ভালবাসতে পারিনি। ওরা আমার কেমন পর হয়ে গেছে। আর আমার ইস্তির কথা শুন। উ আমাকে পর ভাবে, আমার উপর তার কুনু নিভ্‌ভর নাই। অথচ, কুনুদিন আমি ওদিকে পর ভাবিনি, ওরাও ভাবেনি।'

'তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ, লখীন্দদাদা, বুঝতে পারছি। কেন তোমার এমন হল, তাই ভাবছি……'

'ওই যে বললম, কেউ কারও উবরে নিভ্‌ভর করতে পারছেনি। তুমি এখেনের মানুষের খবর জানতে চাইছ, ভাই, ত সবাইয়ের হইছে অমনি। একথা মানলম, যে সবাই রোজগার করছে, তার ইস্তিপুত্ত পিতিপালন হচ্ছেও। কিন্তু ঐ ধর কাছি 'ত ধরে আছি। আমি রোজগার করলম, তুমিও খেলে। কিন্তু তোমায়-আমায় কথা নাই। স্বামী-স্তিতে কথাবার্তা নাই। না, না, কথা কইছে ঠিক। তবে পেরাণের কথা নাই আর কি। ই হইচে কি জান, কেউ সব মানুষগুলোকে খুঁটিএ কষে বেঁধে রেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে ই ওকে, কিন্তু কাছে যেয়ে দুটা কথা বলা, আদর-স্নেহ হচ্ছেনি। বুঝলে সতীশ, মানুষে মানুষে মিল নাই। যে যার নিজের কথাই ভাবছে, আর ঘুরপাক খাচ্ছে। সতীশ, কেনে এমন হয় বলতে পার ?'

'পারি। এই সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে এমন হচ্ছে। সেই জন্যেই আমরা বদ্‌লাতে চাই এইটে। একথা তো তোমার অজানা নয়, তবে স্বীকার কর কিনা ভাবছি। দেখ, আমরা অনেক বই পড়েছি, অনেক জ্ঞান পেয়েছি, তার থেকে বললাম কথাটা। কিন্তু হয়তো তোমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না। যত-দিন না মিলছে, একথা বুঝবেও না তুমি। তার চেয়ে তোমাকে নিয়ে যাব একদিন। গোবিন্দদা অনেক জানে শোনে, অনেক দেখেওছে। সে হয়ত তোমাকে ভাল বুঝিয়ে দিতে পারবে।'

সতীশ উঠল। আর বেশি দেরী করা হবে না। বৃষ্টিও থেমে গেছে। লখীন্দর ওর সঙ্গে এল একটুখানি। বললে, 'অথচ দেখ, মানুষ যদি মানুষকে না ভালবাসতে পারল, থালে এ পিথিমী শ্মশান হয়ে গেল। আজ মানুষের একটুও আনন্দ নাই, মানুষ শুকি' যাচ্ছে।' লখীন্দর তারপর প্রসংগান্তর ক'রে। 'তোমাকে মিনতি করি ভাই, সুধীরকে আমার উসব কথা বলনি, আমি ভাল আছি বলবে। তখন নিজের উপর রাগে বলেছিলম। সুধীর আমার খুব ভাল কাজ করেছে। উ আগে কুপথে গেছল, এখন সে পথে নাই সুধীর। আমার এতেই খুব খুশি। বলবে তাকে আমার কথা।' পরে বললে, 'আমাকে নিয়ে যেও একদিন।'

লখীন্দরের ওপর যে অন্তরীন থাকবার হুকুম ছিল, সে সম্বন্ধে তার ধারণা ক্রমশ বদলে গিয়েছে। প্রথমে তার মনে হত, ওটা কিছুই নয়। তার চৌহদ্দির বাইবে সে আর যাবেই বা কেন। বুড়ো-বয়েসে দৌড়ঝাঁপ করবার তো দরকার হয় না, বাকি কটা দিন শান্তিতে নিরিবিলি কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

তারপর তার মনে হয়েছে, এ-আদেশ সত্যিই তার বন্ধন। তুমি যদি অন্য পাড়ায় গিয়ে কারো সঙ্গে গল্প করেছ, তাহলে ওরা সন্দেহ করবে। অথচ, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ কথা-বার্তা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ বাঁচবে কী করে। এমন কী, তোমার আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে যদি পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা বল তাহলেও সেটা দোষের হবে।

সে নিয়ে লখীন্দরের আশঙ্কাও ছিল। খামকা কে-কোথা কি মনে করবে, সেটা সে পছন্দ করত না। পরে, নিজের এই দুর্বলতায় নিজেই সে লজ্জিত হয়েছে।

মাসখানেক আগে সে দরখাস্ত করেছিল, অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি তাকে দেওয়া হোক। শরীরটা একটু ভাল করবার জন্যে তার বোনের বাড়ি সারেঙ্গায় চলে যাবে। হ্যাঁ, ওখানকার জল-হাওয়া ভাল, সেখানে গেলে ওর ভালোই

লাগবে। সে জানত, ওখানেও তাকে থানায় হাজিরা দিতে হবে। তা হোক, তবু স্থান বদল করলে মনটা হয়তো ভালো হবে একটু। এখানে এক তিলও আর ভাল লাগছে না।

অনুমতি অবশ্য এল। কিন্তু তখন ও ধানবোনা শুরু করেছে। কতক জমি হল, কতক হল না। এ বছরের হালই হয়েছে ঐ, চাষবাসের 'বাড়' নেই। লখীন্দর ভেবেছিল বোনার পালাটা শেষ করে কিছুদিন তো কাজ নেই, তখন গেলেই চলবে। কিন্তু গেল না ও। ভাল লাগছে না আর।

এই—এইটেই হচ্ছে যত সর্বনাশের গোড়া। কোন কিছু তার ভালো লাগে না। ভাবে, এটা করলে শান্তি পাবে, কিন্তু পায় না, তারপর ওটাতে যায়, তাতেও সেই। সে আর এমন কী কথা!, নিজের স্ত্রী-পুত্রকেই সে ঝঞ্ঝাট বলে মনে করতে শুরু করেছে।

তাহলে দোষ দেবে কাকে। তোমার মনটাই যে তোমার বশে নেই।

অতএব লখীন্দর মরিয়া হয়ে ওঠে, তার বুকের এই বেদনা, এই লড়াই শেষ করবার জন্যে। কিন্তু যতই খেপে ওঠে, ততই বিপর্যস্ত হয়।

এই সময় তার দেখা হয় কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি তখন অমুতোষ বাবুদের আয়োজিত শান্তি-অভিযানে কাজ করছেন।

'কি লখীন্দর, ভাল আছ। অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা...'

'আপুনি ভাল আছেন? আপনার কথা অনেক দিন শুনিনি। আপনাকে দেখে আনন্দ পেলম ··'

'বেশ বেশ...তুমি আমাদের কোন মিটিংএ গিয়েছিলে, লখীন্দর?'

লখীন্দর বলে, 'যাইনি, কিন্তু আপনাদের কথা শুনেছি। উ আপনারা করতে পারবেন নি। আমার ইটাই মনে লেয়...'

ঠাকুরমশায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'চল, চল...ঐ গাছটার তলায় বসি। তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। এস।'

বসবার পর লখীন্দর বললে, 'শান্তি আপনারা করবেন কি করে। মানুষের মনেই শান্তি নেই...'

'কিন্তু সে শান্তি আনতে হবে। আর আমরা যা করছি তাছাড়া অন্য পথ নেই। মানুষের শান্তি নেই, সে তো দেখাই যাচ্ছে। আগে মানুষের মনটাকে ঠিক করা দরকার, তবেই সব হবে...'

আবার তিনি বললেন, 'তাছাড়া দেখ, এই অশান্তির জন্য দায়ী কারা।

কোন এক পক্ষকে সম্পূর্ণ দোষ আমি দিতে চাইনে। ছু'দলই এর জন্য দায়ী। একদল বিদ্রোহ করল, আর একদল দমিয়ে দিল,—এতে লাভের ভাগে, ছু'দলের ব্যবধান বেড়েই যেতে থাকে ক্রমশ। কেউ কারো কথা শুনছেও না, বুঝছেও না।'

এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। সরকারের আক্রমণের ফলে এই হয়েছে, না কৃষকদের নিজেদের অপরাধে এই হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, আগে ঠাকুর মশায়ের সামনে লখীন্দর বিশেষ কোন কথা বলত না, বললেও, ছাত্রের মতো প্রশ্ন শুধোত, তার উত্তর জেনে নিত। কিন্তু এখন সে অনর্গল বকে যাচ্ছে। এতদিন চুপ করে থেকে তার বক্তব্য অনেক বেশি বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।

'আমি আপনাকে বলি, দাদাঠাকুর, চাষীদের দিকে চেয়ে দেখেন, ত সবাই মন-মরা। বলি, এখন ত আর পুলিসের মারও নাই, গোলমালও নাই। কিন্তু দেখেন, কাজকম্ম করছে নি ওরা, চাষ-বাস ভাল হচ্ছে নি। আর হবে বা কি করে। কত লোক চলে গেছে গাঁ ছেড়ে, যারা আছে, তাদের হাত-পা সব বাঁধা। আপনি হয়ত বলবেন, ছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। উটি হবেনি, দাদাঠাকুর, কেনে না মানুষের মন ভেঙে গেছে। জানলম কিসে? ত বলি শুনেন, যে লোক তার হাতের কাজ করতে ভালবাসেনি, হাতে কেস্তে লিয়ে হাঁ-করে আকাশের চিল গণে, সে লোকের মন ভাল নাই, দাদাঠাকুর। দেখেন আপুনি, চাষের উব্‌রে কটা চাষীর মন আছে?'

বলে লখীন্দর চিন্তিত হয়ে পড়ে। কেমন বেদনার্ত দেখায় তার মুখখানা। তারপর, হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে, এমনি করে বলে উঠল, 'একটা কথা জিজ্ঞাস করি, দাদাঠাকুর। গোলমাল হল কি নিয়ে, না সরকারের বাঁধা দামে চাষীরা ধান দিবে নি। কিন্তু চাষীদেরই কথা ত লেয্য ছিল, তাদের উব্‌রে জোর করা হল কেনে? এই রকম অন্যায় যদি হরদম হয়, থালে শান্তি এসবে কি করে...' বলতে বলতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে লখীন্দর, যা সাধারণত ও হয় না।

সহিষ্ণু হয়ে কথাগুলি শুনলেন কৃষ্ণমোহন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন: 'তুমি ঠিক বলেছ, লখীন্দর। আমি স্বীকার করছি, সরকারী নীতির জন্যেই এই গোলমালটা প্রধানত ঘটেছে। পৃথিবীতে সব সময়ই একদল লোক আছে, যাঁরা অন্যের উপর জুলুম চালায়। কিন্তু তার সমাধান তো মারামারি কাটাকাটি করে নয়। সে তো চিরকাল চলে আসছে, কিন্তু এতদিন পরেও কি কিছু সুরাহা হল? হবে না লখীন্দর, ওপথে হবে না। আমার ঐ এক কথা, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে শান্তি আনতে হবে। আমরা

জমিদারের সঙ্গেও কথা বলি, আবার প্রজার সঙ্গেও কথা বলি। আর শুধুতো এখানেই নয়, আমাদের দেশের সর্বত্র, আর পৃথিবীর সব জায়গায় আমরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এ নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যা ন্যায্য তা একদিন জিতবেই।'

'উ হবেনি। অমন করে হবেনি, দাদাঠাকুর। যার জোর আছে সেই জোর পক্ষ যদি অন্যায় চালিয়ে যায়, থালে হবে কী করে। কেউ আমাদের দিকে মুখ তুলে দেখলনি। উসব হবে নি কিছু। আমার এই মন বলে...'এর পরে আর কথা বিশেষ এগোয় না। কেউ কারুকে বোঝাতে পারছে না যখন, তখন বেশি এগোনো সম্ভবও নয়।

এক সময় কৃষ্ণমোহন উঠে বলেন, 'এখন তাহলে আসি, লখীন্দর। পরে আবার দেখা হবে।'

লখীন্দর দাঁড়ায়, আগের মতোই দাদাঠাকুরের পায়ের ধূলো নেয়। তারপর খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলে, 'আপনার মুখের উব্‌রে অনেক কথা বলেছি, মাথার ঠিক নাই আমার, কিছু মনে করবেন নি। অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছি আমি, দাদাঠাকুর। পেরাণে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই বলছিলম দাদাঠাকুর, আপনারা অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন, দেখেন যদি সেই শান্তি দিতে পারেন একটু। আর কিছু চাইনি, শুধু এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে। স্বামী-স্ত্রী পুত্তকন্যার সুখের সংসার হয়। আর মানুষ কাজকে ভালবাসে যেমন। আর কিছু লয়, আর কিছু লয়।'

চব্বিশ

দিনগুলি আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। যেন তার কোন উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, অর্থও নেই কোনো। এমনটি কিন্তু চিরকাল ছিল না। লখীন্দরের অসুখের পর থেকে এমন হয়েছে। কিন্তু কত দিন তার জের চলবে? প্রথম প্রথম তার শরীর দুর্বল ছিল বলেই হয়তো এমনটা হত। কিন্তু এখন তার শরীরে আগেকার মতো শক্তি ফিরে এসেছে, নানা-রকম কাজ-কর্মও সে করে। তবু বুকটা যেন তার কেমন ভারী হয়ে থাকে। কী রকম একটা কষ্ট যেন বুকটা কুরে কুরে নেয়।

আগে গ্রামের অন্য পাঁচজন লোকের সঙ্গে সে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারত। তাদের চারিত্রিক আর মানসিক দৈন্যের জন্যে সে ব্যথা বোধ করেছে, কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু সে বেদনার যেন এক রকম কী আনন্দ ছিল। এখন ওদেরকে কেমন ভয় হয়। মানুষগুলো যখন আপন মনে সুখ-দুঃখের কথা বিড়বিড় করতে করতে চলে যায়, তখন লখীন্দর অনেক সময় সত্যি সত্যিই সরে দাঁড়িয়েছে পথ থেকে। লোকগুলোকে দেখলেই ওর খ্যাপা কুকুরের মতো মনে হয়, যেন হঠাৎ কখন কামড়ে দেবে।

অর্থাৎ, বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে তার শান্তি পাবার উপায় ছিল না কোথাও। সব জায়গা থেকেই যেন তাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কেবলই তাকে যন্ত্রণা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই সময় রামের সঙ্গে ওর দেখা হল। রাম তখন ঘাটাল থেকে ফিরে আসছে, কোর্টে হাজিরা দেবার পর। সেও জামিন পেয়েছে।

'অনেক দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল, রাম।' লখীন্দরের কণ্ঠস্বরে একটা বিষণ্নতা যেন লেগেই থাকে। একটা ক্লান্তি সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না।

রাম বললে, 'হ্যাঁ, লখীন্দদাদা, আমিও দেখা করতে পারিনি। আজকাল নানা ঝঞ্ঝাট এমন সব পড়েছে।'

'বেশ ভাই। হাতে উসব কী বল দিকিন...'

রাম যেন খানিকটে লজ্জিত হয়। বলে, 'বউটার অসুখ যাচ্ছে গো, দাদা। ত ঘাটালে গেছলম, দুটা ল্যাসপাতি লিয়ে এলম। জ্বরে জ্বরে বউটার আর কিছু নাই।'

রামের সেই শক্ত-সমর্থ, ডাগর-ডোগর বউ এখন ম্যালেরিয়ায় হাড্ডিসার হয়ে উঠেছে।

রামের কথার মধ্যে স্ত্রীর ওপর ভালোবাসা ঝরে ঝরে পড়ছে। লখীন্দর খানিকটে অবাকই হয়। তার স্ত্রীর ওপর সেই অপমানটা এত সহজে ভুলল কি করে রাম। একদিন সুধীর বলেছিল, 'লোকটার এক রত্তি মর্দানি নাই, শালা বেউশ্যেকে লিয়ে ঘর করছে।' লোকটা বোধ হয় সত্যিই মেরুদণ্ডহীন, চকিতে একথা লখীন্দরেরও মনে হয় একবার।

রাম বলে, 'তোমার কাছে এসেছিলম, দাদা। একটিবার আমার ওখেনে যেতে হবে।'

লখীন্দর বিস্মিত হয়। কোন এক অতিশয় আনন্দের ভাব রামের কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গীতে।

এই দীর্ঘ-দিনের মধ্যে হঠাৎ লখীন্দর যেন একটি পুরোনো জগতের লোক খুঁজে পেল। আগেকার দিনের হাসি-কান্না আশা-আনন্দ সব যেন অতি দ্রুত ওকে ছুঁয়ে যায়। লখীন্দর আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে, ভুলে যায় ওর সংশয়, 'কেনে, কেনে বল দেখি...'

পরে ও আবার নিজেই বলে, রামকে কোন কথা বলতে না দিয়ে, 'যাব ভাই, যাব। তোমাকে দেখে খুব আনন্দ পেলম। আমার উবরে যদিও বারণ রইছে, ত তবু আমি যাব। কাল সন্ধ্যে বেলা।'

'যাবে ত লখীন্দদাদা? তোমাকে বলি শুন। গেলবারে আমরা জঙ্গলে পালি গেছলম, ত একটা গরু মরে গেছল, পরাচিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত) করব একটি। ত তুমি যেয়ে একটু দেখবে। দুটা উপদেশ দিবে।'

'পরাচিত্তি করবে তুমি?' লখীন্দর যেন বিশ্বাস করতেই পারছিল না। অথবা, এ সম্বন্ধে ওর বোধ নষ্ট হয়েই গিয়েছিল। তাই ও অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকে।

'ছেলে মরলে তার পরাচিত্তি না করলে পাপের নিস্তার নাই। ছেলেগরু, কথায় বলে গোহত্যা...গলায় দড়ি ছিল, লখীন্দদাদা, চার পুয়া পাপ হইছে, ই পাপে নিস্তার নাই।'

লখীন্দর শুধোয়, 'তোমরা সবাই করবে ভাই? যাদের তোমারগে সব গরু মরেছে?'

ওর প্রশ্নে একটি আগ্রহ ফুটে ওঠে। যেন, রাম যদি জবাব দেয় সবাই করবে না, তাহলে ও ক্ষুণ্ণ হবে।

'সবাইয়ের কথা বলতে পারবনি লখীন্দদাদা, তবে আমাদের শামু শুদ্ধ করবে। ই হল গিয়ে ভগমানের মর্জি...যার যেমন পেরাণ চায়, সে সেই-রকম করবে।'

লখীন্দর বেশ খানিকটে আনন্দ নিয়েই রামের বাড়ি গেল। তখন রাত্রি হয়ে এসেছে, বৃষ্টিও পড়ছে টিপটিপ করে। অন্ধকারে জমিগুলো কালো হয়ে মিশে গেছে। কখনো কখনো বিদ্যুৎ চমকালে সমস্ত মাঠটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আলগুলোকে মনে হয় কতকগুলো সাপের মতো, জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। এমনিতে মাঠের মধ্যে পথ ভুল হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু লখীন্দর অভ্যস্ত বলে ও তাড়াতাড়ি হেঁটে এগোতে পারে।

পায়ে একটা কাঁটা ফুটল ওর। প্রায় একরকম হাঁটতে হাঁটতেই ও কাঁটাটা নখ দিয়ে টেনে নেয়। একবার একটা চোরাগর্তে পা পড়ে। কিন্তু এ সব দিকে মনোযোগ দেবার মত অবস্থা নয় ওর, কেবল রামের কথাই ও চিন্তা করছিল।

লখীন্দর আনন্দ পেয়েছে। এতদিন ও প্রায় একলা ভেসে বেড়াচ্ছিল, আজ ওর একটা আশ্রয় হল। রাম গোমাতার ওপর এখনো ভক্তি রেখেছে তাহলে? চারদিকে মানুষ তো সব হন্যে হয়ে গেছে, কেমন হয়ে গেছে, তার মধ্যে ভালবাসা পাপ-পুণ্যের বোধ কোথায়? ভালোই হল, যদি এমনি করেই সে মনে একটু শান্তি পায়।

সেদিন রামের বউটার অসুখ বেড়েছে। রোজ জ্বর হয় একটু একটু করে, আর তলপেটের নিচে কী একটা অসহ্য বেদনা। রাম গরম জল করে, তার মধ্যে ছেঁড়া কম্বল চুবিয়ে নিংড়ে সেঁক দিচ্ছিল। কেবলই কাতরাচ্ছিল বউটা।

কিছুক্ষণ পরে রাম সেঁক দেওয়া শেষ করে বাইরে আসে। লখীন্দরের পাশে চটটা টেনে নিয়ে বসে বলে, 'তোমার কাছে লজ্জা নাই, লখীন্দদাদা, বউটা মরতে চায়নি...বলে, তোমার মতন সুয়ামী পায়নি কুনু মেয়া। তোমার পায়ের ধুলা দাও, আমি মহাপাপী, তোমার পায়ের ধুলার জোরে আমি সগ্‌গে যাব...'

পরিষ্কার বোঝা যায় রামের চোখ জলে ভরে এসেছে। রাম তার কান্না গোপন করল না, গামছার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

'রাম, তুমি তোমার ইস্তিকে ভালবাসতে পেরেছ। তুমি ভাগ্যিমন্ত পুরুষ।'

রাম কিছু বলে না। লখীন্দরও চুপ করে থাকে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে রামের স্ত্রীর কাতর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর বাইরের ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যায়।

এক সময় রাম উঠে গিয়ে হুঁকো-কলকেটা আনে। চালের বাতা থেকে তাল-পাতা পেড়ে লম্প জ্বালিয়ে তামাক ধরায়। 'লখীন্দদাদা, লাও।'

লখীন্দর অন্যমনস্ক ভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'দি, ভাই...' বলে বাঁহাত দিয়ে হুঁকোটা নিল লখীন্দর। কয়েকটা টান দিয়ে বললে, 'একটা সত্য কথা বলবে, রাম? তুমি আনন্দে আছ।'

রাম প্রথমটা কিছু বুঝল না। তারপর লখীন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ই কথা কেনে শুধাচ্ছ, ই কথা তমার বুঝলম নি।'

লখীন্দর বললে, 'রাম, তুমি আগের কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি। তুমি কি রকম মানুষ ছিলে! তোমার দুর্দ্দশা দেখলে কান্না পেত। তুমি একদিন বলেছিলে তুমি আপ্তঘাতী (আত্মঘাতী) হবে। এখন তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি শান্তি পাচ্ছ, তোমার মনে শান্তি হচ্ছে। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি, এখন তাই আশ্চয্যি লাগছে।'

রাম আস্তে আস্তে বললে, 'একথা সত্যি। আমার পেরাণে আর কুনু দুঃখু নাই।' তুমি একদিন বলেছিল, রাম, মনে রাগ-ঘেন্না রাখবেনি। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। সবাইকে ভালবাসবে। আমি অনেক ঠকে দেখেছি, ইটাই হল সাচ্চা কথা। আর সব শূন্যি। হঁা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বললে, 'আমার জনমটা বড় দুঃখে কেটেছে, লখীন্দ-দাদা। কখনো সুখ বলতে পাইনি। ছেলেবেলায় মামার লাথ-ঝাঁটা খেয়ে কাটালম, বড় হয়ে দুটা পয়সার মুখ দেখলম নি, আর অসুখ-বিসুখ ত লেগেই ছিল। তার উব্‌রে ইস্তির জন্যে কী অপমান হল। বল দিকিন, একটা মানুষ সহ্য করে কি করে। এখন ইটা বুঝেছি, মানুষকে না ভালবাসলে শান্তি নাই।'

লখীন্দর যা জানতে চায়, এটা তার জবাব নয়। এসব কথাতো তার নিজেরই মুখের কথা, তারই কথা যেন তাকে শোনাচ্ছে। তাই আবার ও শুধোয়, 'রাম, দেখ, চারদিকে একটা ঝড়ঝাপটা গেল। এত বড় একটা আন্দোলন হল।

পুলিসে মেরে আর কিছু রাখেনি। তোমার উব্‌রেও ত কম হয় নি। ত তুমি তবু কি করে মনে শান্তি পাচ্ছ। গাঁয়ের চারদিকে চাইলে আমার মনে হয়, গাঁটা খাঁ-খাঁ করছে। আমার গা ছম্‌ছম্‌ করে।'

'লখীন্দদাদা, তোমাকে বলা হয় নি, আমি কিষক-সমিতির লোক হইছি। সতীশ বাবুই আমাকে কিষক-সমিতির কাজে নিলে। ই কাজ আমার খুব ভাল লাগে। লোকে বলে, রাম, ভয় পায়নি তোমাকে? আমি বলি, না, ভয় আমার নাই। মানুষের পেরাণ-বাউ' (প্রাণবায়ু) এই আছে, এই নাই, ত ভয় কিসের। ইটাও তোমার শিক্ষা, লখীন্দদাদা। সেই যে মনু-দিগারের জমিতে ধান তুলবার সময় তুমি শিক্ষা দিলে, সেটাই আমার মনে আছে। সতীশবাবু ভাল বলে, লখীন্দদাদা। মানুষের এই দুঃখ-কষ্ট সব এই মানুষে-মানুষে ভেদাভেদির জন্যে। যে লোক কষ্ট দেয়, সেও সুখী নাই, যে-পায় সেও সুখী নাই। সেই যে লখীন্দ-দাদা, একদিন কেঁচকাপুরের মাঠে লাঙল করতে করতে ঐ কথা তুমি বলেছিলে. মানুষ এখন কেউ খুশি লয়। সতীশ বাবু বলে...।'

লখীন্দর ওকে ঝটকা মেরে থামায়, 'উ সব কথা রাখ দিকিন, রাম।'

রাম থ' বনে গিয়ে লখীন্দরের মুখের দিকে তাকায়।

'উ সব কথা রাখ কেনে। উ সব কথা আমি ঢের শুনেছি...'

'তোমার মনে কষ্ট দিলম, লখীন্দদাদা?'

'ই সব কথা আমি শুনে শুনে বুড়া হয়ে গেলম। এই গেলবারেরঅসুখের আগে সতীশ আমাকে পড়ালনি? কত বই: পুঁথি আমি পড়লম, তোমার চেয়ে আমি খুব জানি, অনেক জানি। ত এত জেনে শুনে কিছু হলনি। উসব কিছু লয়, কিছু লয়।'

লখীন্দর অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। সহজে রাগ হয় না লখীন্দরের, কিন্তু রাগলে ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর ভেতরের জ্বালাটা যেন ও বের করে দিতে চায়, কিন্তু সব কিছু গুছিয়ে বলা ওর দ্বারা হয়ে ওঠে না। তাই ও প্রায় এক রকম হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর নিঃঝুম হয়ে পড়ে।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। কেমন একটানা নিস্তব্ধতা চারদিকে থমথম করে। দূরে পুবদিকের জলাটায় উচ্চিংড়ে ডেকে চলেছে।

রাম হাত দুটি লখীন্দরের সামনে জড়ো করে বলে, 'লখীন্দদাদা, তুমি আমাকে মাজ্জনা কর। তোমার কাছে ইটা আমি দোষ স্বীকার করলম।'

লখীন্দর ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে এসেছে। নিজের অস্বাভাবিক আচরণ সম্বন্ধে

ও একটু একটু করে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। বলে, 'না রাম, উ কথা বলবে নি। দোষ তমার লয়। দোষ আমার। তা না হলে তমার উব্‌রে আমি বেরক্ত হব কেনে।'

রাম ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'লখীন্দদাদা, তুমি ই কথা বলবে নি। এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করলম, তুমি আমার গুরু। তোমার কাছ ঠিঙে আমি শিখেছি। আজ তুমি যদি ই-কথা বল ত আমি সগ্‌গে যেয়ে শান্তি পাব নি।'

লখীন্দর কিছু বলে না। ও নিজের মনের ভেতরে কী মিলিয়ে দেখে। তারপর বলে, 'তমার অপমান করলম, রাম।'

'ই সব কথা কেনে বলছ, লখীন্দদাদা। তোমার কী দেহ ভাল নাই ? আমাকে দুখী করছ কেনে।'

লখীন্দর বলে, 'মানুষ এত পাথর কেনে। জান রাম, আমি কাঁদতে পারিনি, আমার কান্না নাই। কাঁদলে আমার ছোট-মনটা একটু ভাল হত। আমি একটু শান্তি পেতম।' তারপর রামের হাত ধরে বলে, 'রাম, তোমার চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করলম, ভাই, তুমি সুখী হবে। পরের দুঃখ বুঝে তুমি পুণ্যবান হবে, ভগমান তোমাকে শান্তি দিবে। শুধু আমি আর পারলম নি।' একটু থেমে ও আবার বললে, 'আমার আর কি। আমি ডাক শুনতে পেইছি, ক'দিনের জন্যেই বা আছি আর। তাছাড়া জান রাম, আমি ছোট হয়ে গেছি। আমার স্তি-পুত্তের উপরে আমার ভালবাসা নাই। আমার বেরক্ত এসেছে। আমি ছোট হয়ে গেছি।'

রাম মহা বিব্রত হয়ে পড়ে। জীবনে সে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে এই লোকটিকে। তারই সামনে লখীন্দর যখন এত কাতর হয়ে পড়ল, তখন ও নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করে।

'লখীন্দদাদা, আমি কনেষ্ট (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি, তোমাকে আমি আর কি বলব। তুমি একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মনে সেই শক্তি আছে, তুমি ঠিক পারবে।'

এরপর আর বিশেষ কথা হয় না। টুকিটাকি দু'একটা কথা হয়, তারপর লখীন্দর যাবার জন্যে ওঠে। রাম বলে, 'দাঁড়াও লখীন্দদাদা, তোমাকে একটুন পথ দেখি'দি। মণ্ডল বেড়ের পাশ দিয়ে যাবে ত ? একটা শিয়াল খেপেছে ওখেনে, আর সাপখোপের দিন আজকাল।' একটা হ্যারিকেন, আর বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরোল রাম।

পথে প্রায় ওরা কথা বলল না। যে সময় ওরা বিদায় নেবে, তখন রাম বললে, 'থালে বল তুমি, লখীন্দদাদা, কিষক-সমিতির লোক হয়ে কি আমি ভাল করিনি? সতীশবাবুরা যা করতে বলে, থালে কি ওতে কিছু হবেনি?'

'না, ভাই, উ কথা আমি বলব কেনে। সতীশকে আমি জানি, গোবিন্দকে আমি জানি। অমন ছোকরা আমি দেখিনি, ভাই। ত কি জান, তমাদের সব আশ (আশা) আছে, তমরা তাই আনন্দ পাচ্ছ। যে মানুষের আশ নাই, সে বাঁচবে কী করে। তমরা তবে কাজ করতে পারছ। তমরা পারবে, ভাই, তমরা পারবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক। এই আমার ছেলে সুধীরের কথা ধর। উ এখন গোবিন্দর কাছে গেছে। সুধীর এখন বুঝে কম। কিন্তু কখন ওর মন ত খারাপ হয়নি। ত ওরা পারবে। আমি আর পারলমনি। আমি যে এত বুঝি, ত তাতে কি হল। কিছু হলনি।'

গ্রামের এই নিঃঝুম অবস্থাটা একটু একটু করে কেটে আসে। দীর্ঘকালের রুগ্ন শরীরে একটু একটু করে রক্তের সঞ্চার হয়। কৃষক সমিতি আবার উঁকি-ঝুঁকি মারে এখানে ওখানে। কৃষকেরা একটু চঞ্চল হয়। ওরে, একটু চোখ মেলে দেখ, চোখ মেলে দেখ—কেউ যেন বলে বলে যায়।

দুজন, তিনজন, পাঁচজন, সাতজন...জড়ো হয়। শামুর বাড়ির কাঁদালে তেঁতুল গাছটার আড়ালে। দুটো ঝাঁটালো লম্বা আনারসের গাছ পশ্চিমদিকে। দক্ষিণ দিকে পুকুর। হ্যাঁ, এই জায়গাটাই ভালো। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিনে আর চলে না। আবার অন্য একটা জায়গা ওরা খুঁজে বের করে। তারপর আবার অন্য পাড়ায়।

মাঝে মাঝে রাম লখীন্দরের কাছে আসে। অতি উৎসাহের সঙ্গে তুচ্ছতম ঘটনা পর্যন্ত বর্ণনা করবে ও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্বন্ধে লখীন্দরের মতামত জানতে চাইবে।

একদিন ও বললে, 'জান লখীন্দদাদা, আমার এখন কী মনে হয় জান। আমি এখন অনেক কিছু কাজ করতে পারব। আমি মরবনি। আমি মরতে চাইনি।'

লখীন্দরের অতি স্পর্শকাতর মন এ উৎসাহ সইতে পারে না। চিরকাল তো সে এরই স্বপ্ন দেখে এসেছে। আজ সে নিজে যোগ দিতে পারছে না বলে বেদনার ওর সীমা নেই। ও শুধু বলে, 'ভাল, ভাই, ভাল।'

'আচ্ছা, লখীন্দদাদা, তুমি কি ইটাকে ঠিক বলনি, ইটার দ্বারা কিছু হবেনি—এই তমারগে কিষক সমিতি দিয়ে ?'

লখীন্দর বললে, 'সে কথা ত আমি কুন্থুদিন বলিনি।'

'তবে তুমি এমন করে কষ্ট পাচ্ছ কেনে। আমার ইটা মনে হয়, লখীন্দদাদা, তুমি চিরকালটা পরের দুঃখ কষ্ট দেখে এসেছ, পর হলগে তোমার আপন। আজ তুমি আমাদের সঙ্গে এস নি বলে তোমার এমন মন খারাপ।'

'তবে তোমাকে বলি শুন, রাম। তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু কাদের কাজ আমি করব, কি কাজ আমি করব ? তোমরা কিষক-সমিতির কাজ করছ। কিন্তু কিষক-চাষারা কি করছে দেখ। রাম, তুমি আমার সঙ্গে চল। সমস্ত গাঁটা তোমাকে আমি দেখাব। চাষীরা মা লক্ষ্মীর যত্ন লেয় নি। হামার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, বলে, কি হবে মেরামত করে। ধান ভিটায় উঠবে কিনা কে জানে। বলে, কবে রাম রাজা হবে, আজ তার অধিবেস। চালে খড় নাই। দিন রাত ঝগড়া লেগে আছে। চাষারা মদ খাবে। দেখছ ত একটা লোতন তাড়ি দোকান হইছে আমধেড়ায়। আর, ইদিকে তুলসী-তলায় মুথাঘাসের বন হইছে, ত আর কি কিছু আছে ভাই ? গাঁয়ে আর কিছু নাই।'

'তুমি কি জাননি, লখীন্দদাদা, ই সব কেনে হইচে। আগে কেনে এমন ছিলনি ? এখন বা এমন হচ্ছে কেনে ? আমাদের শত্তুকে যতদিন না আমরা মারলম, ততদিন আমাদিকে ইটা ভোগ করতে হবে।'

'কি হবে শত্তুকে মেরে ? ঘরেই কাল সাপ পুষে রেখেছ ভাই। মা লক্ষ্মীর উব্রে ভক্তি নাই চাষীর। চাষীর যদি মা লক্ষ্মী না থাকে তাহলে সে চাষী মরে যাউ, তায় ক্ষেতি নাই।' একটু থেমে দম নিয়ে ও আবার বললে, 'জান রাম, ই সব কথা আমি সবাইকে বলতে চাই। আমার ই বুকটায় অনেক কথা জমা আছে, ভাই। সবাইকে যদি আমি বলতে পারতম, থালে আমি বেঁচে যেতম। কিন্তু জান, মানুষ দেখলে আমার কেমন যেন হয়। আমি চুপ করে যাই, আমি বলতে পারিনি। বলতে গেলে আমার ছাতি যেন শুকি' যায়। বুক ধড়পড় করে।'

রাম লখীন্দরের জন্যে দুঃখ-বোধ করে। ও বলে আস্তে আস্তে, 'তোমাকে আর কি বলব, তুমি জ্ঞানী লোক। তবে তোমার কথা শুনবার জন্যে লোকে হঁ করে আছে। তোমাকে ভালবাসে সবাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। তাই আমার আরও দুঃখ হয়। আমার একটু অভিমান আছে, রাম। তুমি একদিন বলেছিলে, আর কেনে লখীন্দদাদা,

তোমার ত বয়স হল, মানুষের অনেক উব্‌গার তুমি করেছ। এখন শান্তিতে কাটি' দাও।—ইটা আমার পেরাণে কতটা যে লেগেছিল, তা তুমি জাননি। আমি অনেক কিছু করতে চাই, রাম, আমি চুপ করে থাকতে চাইনি।'

'সব পারবে লখীন্দদাদা, তুমি সব পারবে। আর যে কথা আমি আগে বলেছিলম, সে কথা এখন বলব নি।'

'তাই যেন হয়, ভাই। মনে শান্তি লিয়ে আমি যেমন মরতে পারি। তোমাকে আশীব্বাদ করছি রাম, তমার কথা যেন ঠিক হয়। হে ভগমান, তুমি দয়া কর আমাকে। আমাদের উব্‌রে মুখ তুলে চাও।'

পঁচিশ

ইতিমধ্যে হরির জীবনে বিপর্যয় আসে। মালতীকে কেন্দ্র করেই ব্যাপারটা ঘটল। একদিন স্বয়ং অজয় রায় তার বাড়িতে এসে বললেন, 'মামা গো (এই সম্বোধন আজই প্রথম), তোমার মালতী সাবাস মেয়ে। তুমি আচ্ছা জুটিয়েছিলে!'

হরি সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করে। এমন ভাবান্তর অজয়ের কখনো দেখেনি। একটা অদ্ভুত, অসুস্থ আনন্দে ও যেন ঝক ঝক করছে।

'জানো তো, এখানের আন্দোলনের রুই-কাৎলা একটাও ধরা পড়েনি। অত কড়াকড়ি সত্ত্বেও। তার রহস্য ধরা পড়েছে। তুমি তো পুলিসের সঙ্গে মালতীর আলাপ করিয়ে দিলে। আর পুলিসের তুচ্ছতম গতিবিধির খবর পর্যন্ত মালতী গোবিন্দর হাতে পৌঁছে দিয়েছে। সাবাস মেয়ে।'

পুরো আধঘণ্টা চুপ করে রইল ওরা দু'জনেই—হরি অতি শান্ত, অতি স্থিরভাবে বসে থাকে, আর অজয়ও ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মুখে সেই অসুস্থ আনন্দের ছটা।

হরি বললে, 'কখন খবর পেলেন?'

'এই মাত্র...'

'তাহলে দোহাই, কোন রকমে মালতীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। যেমন করে হোক।'

'নিশ্চয়ই, তোমার মালতী, তোমার কাছে পাঠাব না?......'

মাথার মধ্যে আগুনের হলকা ছুটছিল। লোকে খুব আঘাত পেলে বলে, ওগো আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত সত্তাটাই জ্বলে গেলে কেমন যন্ত্রণা হয় সেটা হরি অতি পরিষ্কার করে অনুভব করে।

হরি প্রতারিত হয়েছে।

এতদিন অন্যকে ঠকিয়ে এসেছে সে। সুখের ঘর ভেঙে দিয়েছে। ওর বেশ মজা লাগে, যখন কোন লোক হঠাৎ মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে।

তোমা' আজ তাকেই যন্ত্রণায় কাতরাতে হচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ হরি ওইভাবে কাটি' না, নিজের ভেতরকার ওর আসল মানুষটিকে চাঙ্গা করে তোলে। আশে-পাশের দু'একটি গ্রামে লোক পাঠিয়ে দেয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার মত মানুষ দিয়ে মানুষ তুলবার কিছু ব্যবস্থা আছে হরির। সেই রকম কিছু অস্ত্র ও স্মরণ করে।

মদের বোতলটা খুলল হরি। ঢকঢক করে গলায় ঢালল খানিকটে।

আঃ, গলাটা পুড়ে যাবার সময় কি আরাম লাগে, ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে ওঠে যখন। দূরে বনটার দিকে তাকিয়ে রইল হরি। অন্ধকার হয়ে গেছে, দুএকটা জোনাকি মিটমিট্ করছে গাছের পাতার ফাঁকে। একটা শেয়াল খামারের পাশ দিয়ে চলে গেল।

ওই সামনের বনটা পেরিয়ে মাঠ। একেবারে গ্রামের প্রান্তে ঘর হরির। আর একবার গলাটা পোড়াল হরি।

কালু দোলুই, মধু ডোম, আর কিশোরী বাগদী এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

হরি বললে, 'কিরে, নেশা করে এসেছ ? না ? বেকুব কোথাকার ! এখনই যা ভাটি-খানায়। খুব তাড়াতাড়ি যাবি, আর তাড়াতাড়ি এসবি। নেশায় চুরচুর করবি, গা দিয়ে নেশা বেরোবে...আর আনবিও কিছু।'

হাতকাটা ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দিল হরি।

'খুব তাড়াতাড়ি। খবরদার, যেন দেরী না হয়।'

ওরা বিগলিত হয়ে পড়ে।

'আইগ্যাঁ, আজকে কি আমধেড়ে যাব না কি ?'

'আইগ্যাঁ, না......' হরি ক্রুদ্ধ হয়, 'যা বলা হচ্ছে তাই কর।'

ওরা চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, হরি ওদের থামাল।

'বল দিকি অপমান বেশি লাগে, না কেউ যদি ঠকায় থালে বেশি লাগে ?'

'আইগ্যাঁ ?' বলে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'শালা, মুখ্যুর বাচ্চা' হরি গর্জায়, 'লোকে মায় অজয় পর্যন্ত কখন-সখন অপমান আমার করেছে। কিন্তু...কখনো আমি ঠকিনি। অপমান...কিন্তু, সে গায়ে মাখিনি আমি। কিন্তু আমাকে কেউ ঠকাতে পারে নি এর আগে ...যা, যা, তোরা আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেনে।'

প্রায় দু' ঘন্টা পরে ফিরে এল ওরা। নির্দেশ মতো তো বটেই, তারও বেশী করে এসেছে।

স্থির হয়ে দাঁড়াল হরির সামনে। লক্ষ্যের দিকে ছুটবার জন্য অস্ত্র তেমনি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আদেশের অপেক্ষায়। কারণ, হরি যদিও ওদের একরকম প্রতিপালক, তবু এত অনুগ্রহ যে এমনিই নয়, তার বদলে একটা কিছু কাজ করতে হবে সেটা ওরা জানত। তাই সেইটের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

'যা, ওই দরজাটা খুলে ফেল...'

দরজা খুলে মালতীকে দেখে ওরা।

'যা, ওইটেকে লিয়ে যা। ভাগ করে লিবি...'

ওরা একটা অব্যক্ত শব্দ করলে : বিস্ময়, অবিশ্বাস আর লোভের।

'শালারা, ঐ খামারে ধানগাদাটার পাশে লিয়ে যা...তোদের জন্যে কি সোনার পালঙ্ক করে দুব নাকি?'

হরির নেশাটা টিক্‌ছে না। যত রাত হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ছে। কোন মেয়ে যে এই ব্যাপার করতে পারে, সে তো কল্পনার অতীত। কিন্তু আপাতত সে কথা নয়, ও ভাব্‌ছে ও মরে যাবে। এত বড় আঘাত ও সইতে পারবে না। শিকার যখন শিকারীকে ধরে তখন তার অবস্থা যা হয়, হরির অবস্থাও তাই।

কিন্তু ওই মোষ তিনটে বড় বেশি বিদকুটে শব্দ করছে। ও হাঁকে, 'মেধো...'

মধু আসতেই ধমকায়, 'শালা, মাগি কখনো দেখুনি? শালারা চুপ করে কাজ কর একটু।'

আবার একবার নেশা কাটল।

হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

'না এটা আমি ঠিক করলম নি। ও মাগি তো আর পূজোর ফুলটি নেই যে, ওর এতে অপমান হবে, ওকে শাস্তি দেওয়া হবে। অবিশ্যি পুলিসে নির্ঘাত লিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু তাতেই বা কি? ওর রূপ তো দিন দিন বাড়ছে, আর বাড়বেই বা না কেনে, কলাগাছ বর্ষার জল পেয়েছে—তো পুলিস কি করবে ওকে? কিছুই না, মধু যদি পায় ওর কাছ থেকে...'

মধ্যরাত্রি পেরিয়ে রাত্রি শেষের দিকে এগোচ্ছে। ও আর মদ খেল না। নেশা তো হচ্ছেই না, এখন শুধু জলের মতো মনে হচ্ছে। প্রথম দিকে একটু যা লেগেছিল।

একটা হ্যারিকেন নিয়ে খড়গাদাটার পাশে গেল হরি।

'এই শালারা, ভাগ, ভাগ শালারা। হইছে, খুব হইছে...'

ওরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

'হুঁ, যাই বাবু, যাই...আমরা পেরাণটা দুব আপনার জন্যে।' কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপণ করে যায় ওরা।

একটি উলঙ্গ নারী-মূর্তি। রক্তে মাটি ভিজে, পাশে শাড়িটার খানিকটেও ভিজেছে। ছেঁড়া ব্লাউজের একটা অংশ ওর পায়ের কাছে আর একটা অংশ বাঁহাতে জড়ানো।

হরি দেখে। মেয়েটা গর্ভবতী হয়েছিলো, স্রাব হয়ে গেছে।

কিন্তু বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ, আছে। ডান হাতটা তুলল একবার। ঠোঁট দুটো একটু নাড়ল। বোধহয় জল খাবে।

হরির পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে আপাতত মেয়েটাকে সুস্থ করা দরকার। আর মরে গেলে তো সব ফুরিয়েই গেল। অতএব হরি জল এনে ওর চোখে একটু দেয়।

চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা, হাঁও করল জল খাবে বলে। কিন্তু কে ও?

ওই অবস্থাতেই ঘৃণা করতে পারে মানুষ? চিনতে পারে তার শত্রুকে? মুখ বন্ধ করল মেয়েটা। পড়ে রইল মড়ার মতো।

কি হতে কি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হরি। মালতার ঠোঁটের সেই আশ্চর্য ঘৃণা লক্ষ্য করল। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। 'হ্যাঁ, অজয় ঠিক বলেছে। সাবাস মেয়ে তুমি। সাবাস।'

খড়গাদার পাশে পুরণো কোদাল পড়েছিল একটা। আগে হারিকেনটা নিবোল হরি, তারপর সেই কোদালটা সজোরে চালাল, ঠিক ব্রহ্মতালুতে। অনেকক্ষণ মাংসপিণ্ডটা নড়ে নড়ে থেমে গেল।

জীবনে কোনদিন কাউকে শ্রদ্ধা করেনি হরি। মেয়ে মানুষ তো নয়ই। তুচ্ছতম সম্মান পর্যন্ত দেখায়নি কাউকে সে। কিন্তু যদি তার কোনো সম্মান-বোধ থেকে থাকে, তাহলে সে এই প্রথম দেখালে।

ছাব্বিশ

ছেলেবেলার বইয়ে অজয় পড়েছিলেন, সময় চলে যায় আপন মনে। তার চলার তালের সঙ্গে তাল রেখে মানুষ ঘড়ির কাঁটা আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ কম নয়, বেশি নয়, মাত্রা নির্ভুলভাবে ঠিক রেখে চলেছে।

কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। সময় কখনো চলে অতি ধীরে, যখন বছরের পর বছর কেটে গেলেও মনে হবে না তোমার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবার, কখনো সময়ের গতি অতি দ্রুত, কয়েক মাস, এমন কি কয়েকদিন পরে তোমার মনে হবে, তুমি যেন এক যুগ পেরিয়ে এলে। আগেকার সঙ্গে এখনকার কোন মিল নেই তোমার।

অজয়েরও হয়েছে তাই।

একটি বছর আগে যা ছিল তাঁর রক্তমাংস, এখন তা স্বপ্নের মতো বলে মনে হয়। স্মৃতির ভাণ্ডারে হাত বাড়ালে নানারকম জিনিস হাতে ঠেকে, সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ছেলেবেলার খেলবার পুতুল যেন, সেগুলো দিয়ে কাজ হবে না কিছুই, তবু কেমন যেন ভালো লাগে।

অজয় তাঁর প্রিয় জানালার ধারে একটা চৌকী টেনে বসেন। সামনে পুব দিকের মাঠ, সেই মাঠের শেষ প্রান্তে আবার অন্য গ্রাম শুরু হয়েছে। এতদূর থেকে কোনটা কী গাছ বোঝা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে উঠেছে কোন নারিকেল গাছের মাথা, সেগুলোর নড়াচড়া পর্যন্ত দেখা যায়।

আষাঢ় মাসের শেষ তখন। কয়েক দিন জোর বৃষ্টি পড়েছে। তাতেই মাঠ সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে। বাতাসটা অনেক বেশি স্নিগ্ধ। সমস্ত মাঠটার ছোঁয়া তাঁর কপালে অনুভব করেন তিনি।

মাঠ প্রিয় তাঁর। মাঠের শস্য তাঁর প্রিয় বস্তু। মাঠের মানুষগুলি তাঁর প্রিয় বস্তু ছিল। এদের কেন্দ্র করে আকাশচুম্বী কল্পনা ছিল তাঁর। সে কল্পনা গত বছর পর্যন্তও ছিল। অবিশ্যি, ছেলেবেলায় কল্পনার যে-রূপ ছিল, সে-রূপ গিয়েছিল বদলে। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে মিশে সে কল্পনা আরো বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছিল।

মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মানুষকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না।। স্বার্থপরতা, নীচতা, তাঁকে অধিকার করে বসল। তিনি নষ্ট হয়ে গেলেন।

অথচ স্বার্থপরতা, নীচতা, বা লোভ এগুলোকেই ঘৃণা করতেন সব চেয়ে বেশি। নিজের স্ত্রীকেও ক্ষমা করেন নি সেজন্যে। সাবিত্রী যখন অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠল তখন ভালোবাসতে পারেননি তাকে। অবশ্য অতি বাস্তবদৃষ্টি তাঁর ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংসারে এগোতে হলে এসবকে নাড়াচাড়া করতেই হবে। নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারলে সে নাড়াচাড়া করাতে দোষ নেই। কিন্তু সেই নীচতা তাঁকে পেয়ে বসল।

পেছনের দিকে ফিরে তাকান অজয়। প্রথম পাপ তিনি করেছিলেন, সাবিত্রীর বোনকে নিজেকে কাজে লাগিয়ে। অদ্ভুত ভালোবাসত তাঁকে মেয়েটা। তাঁর সব কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত সে। সেই মেয়েকে যখন নষ্ট করল হরি, তখন হরিকে খুন করতে পারতেন না তিনি? কেবল স্বার্থপরতা, কারণ হরি না বাঁচলে তাঁকে রক্ষা করবে কে? কে তাঁকে নানারকম বুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করবে? তারপর ঘর করতে গেল মেয়েটা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করলেন তিনি। মরবার সময়ও ভালোবেসে গেছে মেয়েটা তাঁকে। আর তিনি? তিনি সেই ভালোবাসাকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের সম্পত্তি রক্ষার কাজে।

আর হরির কথাই যদি ধরা যায়, তাহলেই বা তাঁর রেহাই কোথায়? স্বীকার করতেই হবে হরির মতো নীচ লোক কল্পনা করা যায় না, হরি তাঁকে প্ররোচিত করে অনেক হীন কাজে লাগিয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা কী তারই দোষ? কোনদিন কী হরিকে সে জন্যে বাধা দিয়েছেন? কই, নাতো।

তিনি দাঁড়িয়ে দেখেছেন, হরি মালতীকে ঘুষ দিয়েছে। সমর্থন করেছেন তিনি, কারণ ভালো কাজ পাওয়া যাবে বলে। সেই পাপ অবিশ্যি দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসে তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁরই সম্পর্কীয়া ভ্রাতৃবধূকে উচ্ছিষ্ট করেছে ওরা।

কেন এমন হল?

পরের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। তাঁর নিজের মধ্যেই গলদ ছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে এমন ফল হবে কেন। আজ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়, কোন-কালে সাধারণ মানুষের অনিষ্ট তিনি চাননি। কৃষিকে উন্নত করে তার মাধ্যমে মানুষকেও উন্নত করা তাঁর আদর্শ ছিল। তার জন্যে জমি কিনেছেন,

জমিকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সেই জমিই তাঁকে পেয়ে বসল। সেই জমি রক্ষা করবার জন্যে গুপ্তচরও নিয়োগ করেছেন তিনি, পুলিসও ডেকেছেন। কাদের বিরুদ্ধে? না, যাদের বিরুদ্ধে কোনদিন তিনি ভাবেন নি। আশ্চর্য। আর একটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। লোকটি শীরষের জমিদার অনুতোষ সিংহ। অমন শান্তভাবে নৃশংস হতে কোন মানুষকে দেখেন নি অজয়।

এসেছিলেন শান্তি-অভিযানের প্রস্তাব নিয়ে। সে-সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বলেছিলেন কাজে নামতে। কিন্তু মেনে নিতে পারেন নি ব্যাপারটা। যে কয়েকটা মিটিং অনুতোষ বাবু করেছিলেন, একটাতেও যাননি তিনি। যেখানে চাষীদের ন্যায্য দাবি স্বীকার করা হচ্ছে না, সেখানে তারা যদি খেপে যায় তাহলে তাদের দোষটা কী হল। অজয় বলেছিলেন, 'আমাদের এখন কী করা উচিত জানেন? সরকারের এই কার্যক্রমের বিরোধিতা করা। এক-একটা কার্যক্রম তাঁরা নেবেন, আর তার ফলে আমাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হবে, এ আমি চাইনে। এই যে পুলিসের জন্যে আমাদের ছোটাছুটি করতে হচ্ছে, সেটার জন্যে কী আমাদের সত্যিই কোন গরজ ছিল। গরজটা আমাদের ঘাড়ে চড়ানো হয়েছে। ফলটা দাঁড়ালো কী, আমরা আরো বেশি করে সরকারের গলগ্রহ হলাম, আর কৃষকদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ালাম।'

অনুতোষ বাবু বোঝাতে চাইলেন যে, সরকার বাধ্য হয়েই এই নীতি গ্রহণ করেছেন।

'স্বীকার করিনে। কৃষকেরা যদি ঐ দামে ধান বিক্রী না করতে চায়, তাহলে সে বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমি ফ্রীডম অব এন্টার-প্রাইজে বিশ্বাস করি।'

অনুতোষ বাবুর বক্তব্য ছিল, সেটা এখন সম্ভব নয়। বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না অজয়। সময় অতি দ্রুত বদ্‌লে গেছে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই ধরো। জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে চাষ-করা আজকাল কত বেশি লাভের, নয় কী? যে জন্যে যে-কোন মূল্যে তুমি জমি বাড়িয়ে চলেছ, সেই কারণেই আমি সুযোগ পেলেই জমি খাস করে নিই। কিন্তু তাওতো সম্পূর্ণরূপে করতে পারিনে, কারণ প্রজা রাখতেই হবে। নানা শ্রেণীর প্রজা তোমার রাখা চাই-ই।'

'মানে? আপনি তাদের মারতেও চান, আবার একটু রাখতেও চান...' হাসলেন অজয়।

'ঠিক, সমস্ত কৃষকই যদি ভূমিহীন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ওরা কী হয়ে দাঁড়াবে বুঝ্‌তে পারছ!'

ইতিমধ্যেই তো ওরা ভয় লাগিয়ে দেয়। জমির মায়া বড়ো মায়া, সেটা নষ্ট করতে নেই। আর জমিও যদি কেড়ে নাওতো, বাস্তুভিটে কাড়বে না, কিছুতেই না।

'আমি হলে সব···অবিশ্যি কেড়ে নয়, ন্যায্য দাম দিয়েই নিতুম। তারপর ওদের থাকবার জন্যে তৈরী করে দিতুম ভাড়াটে বাড়ি।'

'ফলটা ভেবে দেখো, সারা দেশ জুড়ে সর্বস্বান্ত কৃষকরা কিলবিল করছে। তাদের পিছনে কোন টান নেই। কল্পনা করতে আমার ভয় হয়।'

শুধু বেঁধে রাখা। মানুষকে পাকে পাকে জড়িয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া। অনুতোষবাবুরা বোঝেন না যে, ওদের বেঁধে রাখলে নিজেদেরও কোন লাভ নেই। পরিণামে নিজেদেরই ক্ষতি।

কিন্তু কই, নিজেও তিনি কিছু করতে পারেন নি তো।···

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। এ অঞ্চলটার মধ্য দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল।

মালতীর ব্যাপারটা নিয়ে কী জানি কেন তিনি স্বস্তি বোধ করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন যে, ভালোই হয়েছে, হরিরা একটা উচিত শিক্ষা পাবে। নীচে নামলে মানুষের এই রকম শাস্তি পেতে হয়। সেই জন্যেই হরিকে তিনি নিজে গিয়ে সানন্দে খবরটা জানিয়ে এসেছিলেন। আর হরি কি করল? খুন করে ফেলল মালতীকে।

ভালোই হয়েছে। ও মেয়ে শাস্তি পেয়েছে মরে গিয়ে।

কিন্তু, এই অত্যন্ত বেদনার মধ্যেও হাসি পায় অজয়ের। তিনি যা ভাবছিলেন তা নয়, ঘটনার জাল গিয়ে পৌঁছেছিল অনেক গভীরে। সে জাল আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে তাঁকে, আর ছাড়াতে পারবেন না। অবিশ্যি, এ রকমই একটা কিছু আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। অনুতোষ বাবু তাঁর মতামত যে ভালো চক্ষে দেখেননি, আর, সেটা যে পুলিসের কান পর্যন্ত পৌঁছবে সেটা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর ভালো লাগছিল না তাঁর, যে কোন রকমে নিজেকে নিরাপদ করতে। ফলে, ওরা মালতীর জন্য তাকে দায়ী করল: মালতীর সমস্ত কার্য-কলাপের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। তিনিই না অফিসারদের প্রলুব্ধ করেছেন মালতীর সঙ্গে যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হতে? তাছাড়া, ব্যাপারটা ধরা পড়লে যাতে নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ না হয়ে পড়ে, সে জন্যে মালতীকে গুণ্ডা দিয়ে খুনও করিয়েছেন।

হ্যাঁ তো। এই অভিযোগের কোনটাই মিথ্যে নয়। মালতীর ব্যাপারের সঙ্গে আগাগোড়া তিনিই জড়িত, তিনিই দায়ী।

অতএব? যদি বাঁচতে চাও, তাহলে ছোটাছুটি করো: অনুতোষ সিংহ থেকে শুরু করে চন্দ্রকোণা থানা, সদর, দরকার হলে প্রাদেশিক দপ্তর পর্যন্ত। সঙ্গে হরিকে নিয়ে নাও। হরি তোমায় নানা-রকম বুদ্ধি বাতলে দিতে পারবে, অন্তত, কর্তাদের হাত করবার সমস্ত বুদ্ধি।

অজয় আবার হাসলেন।......

অনেকদিন সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলেননি অজয়। তাই উঠে গিয়ে ওর ঘরে বিছানায় বসলেন।

তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সাবিত্রীর মাথার কাছে ঝি পিদিম দিয়ে গেছে একটা।

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। কেমন আছ?'

সাবিত্রী শুধু শান্তভাবে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ দুটি একেবারে ফাঁকা, তার মধ্যে কোন অনুভূতির প্রকাশ নেই।

'ভালো হতে চাও, সাবিত্রী? শান্তি চাও? আর একবার চেষ্টা করে দেখব আমি।'

সাবিত্রী হঠাৎ বললে, 'তুমি সরে যাও, সরে যাও। তোমাকে সহ্য করতে পারি না আমি। তোমাকে আমি ঘেন্না করি।' বলে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ লুকিয়ে নিলে। অজয় বেরিয়ে আসে। ওর ঘরে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে সাবিত্রীর ঘরে আবার গিয়ে দাঁড়ায়। না, শান্তিই দেবেন ওকে। হরিকেও।

সাবিত্রী বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ও। কত ছোট মানুষ ওই মেয়েটা। মনটা কতো নীচু ওর।

হঠাৎ তাঁর অতি তীব্র আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। না, এতদিন যা তিনি ভেবেছেন বা করেছেন তাতে কোন গলদ ছিল না। শুধু, ওদের মতো ছোট জীব তাঁকে টেনে নামাবার চেষ্টা করেছে মাত্র। ওরা অতি তুচ্ছ জীব, ওদেরকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

আঃ, কী আনন্দ। কী আশ্চর্য আনন্দ। অজয় রিভলভারের মুখটা তুলে ধরলেন সামনে, সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে। কতক্ষণ কেটে গেল। অনুভব করলেন তাঁর হাত কাঁপছে। সহসা একটা অদ্ভুত হাসিতে মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর। রিভলভারটা ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কণ্ঠনালীর কাছে চিবুকের নিচেই রাখলেন মুখটা, তারপর ট্রিগারটা টেনে দিলেন।

সাতাশ

ধীরে ধীরে এলাকাটা উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে মরা গাছপালায় প্রাণসঞ্চার হচ্ছে বলতে হবে।

এই দীর্ঘ দিন গোবিন্দর কোন অবসর ছিল না। কেমন করে দিনগুলো কেটেছে সে জানে না। জানতেও হয়নি। তার নিজের জন্যে ভাবনা চিন্তা অন্যে ভাগ করে নিয়েছিল। তার খাওয়া-পরা, থাকা শোয়ার জন্যে অতি যত্ন সহকারে অন্যে দেখেছে।

জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ কাকে বলে, সেটা এখন অতি প্রত্যক্ষ অতি বাস্তব হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। এই সময় কেউ তাকে সমীহ করে চলেনি, ভয় করেনি, কিন্তু তাকে রক্ষা করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। কতবার গুলির আশঙ্কা সত্ত্বেও বুক দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে কোন কৃষক। কত কৃষক-রমণী নানা ছলনা করে পুলিস ভাগিয়েছে, তাকে পালাতে সাহায্য করেছে।

আন্দোলন এবং দমননীতি তো পুরো মাত্রায় চলেছে। মানুষের এ হচ্ছে চরম পরীক্ষা। মানুষের স্নেহ ভালোবাসা চুরমার হয়ে যায়, আবার নতুন করে গড়েও ওঠে। আশ্চর্য, এ অভিজ্ঞতা অতি আশ্চর্য। সমস্ত অনুভূতিকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়।

মানুষের জীবনের সব তুচ্ছতা সব অভিমান কোথায় ভেসে যায়। জীবনটা কী এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে ঝলমল করে ওঠে। তখন মৃত্যুও কতো সুন্দর হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, এই জন্যেই তো মৃত্যুকে সুন্দর বলেছেন কবিরা, জীবনদ্রষ্টারা।

গোবিন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

একটা প্রস্তাব এসেছিল একবার যে, গোবিন্দ সাময়িক ভাবে অন্যত্র চলে যাক। তা হয় না। তাছাড়া তার দায়িত্ব আছে, কর্তব্য-বোধ আছে। কেমন যেন মায়া বসেও গেছে। এদের মধ্যে অনেকদিন কাজ করেছে গোবিন্দ, এখন ছেড়ে যেতে কেমন লাগে। ও ভাবে, যা হবার হোক। এত লোকের যা হচ্ছে তাই হবে, আমি থাকবই। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ভালো লাগা না-লাগার

প্রশ্ন নয়, কাজটাই বড়। তার এখন ধরা পড়াও চলবে না। তাছাড়া এদের ছেড়ে যাবে কোথায় সে? এদের মধ্যে না থাকলে সে বাঁচবে কী করে।

একটা কথা ছিল, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিগুলি যদি স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়তে না পারে, নানা কারণে ব্যাহত হয়, তাহলে সেটা সংকটকালে প্রকাশ পায়। গোবিন্দের এই অভিজ্ঞতা অনেক বারই হয়েছে। কিন্তু এবারে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

একটি কৃষক ধরা পড়লে, তার জন্যে অন্য কৃষকদের ভাবনার অন্ত ছিল না। এমন কি ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। যত রকম করে পারে, সেই কৃষকটির পরিবারকে সাহায্য করেছে। নানা কারণে এমনিতে কতখানি স্বার্থপর ওরা, কিন্তু সবার দুঃখকে এমন করে নিজের করে দেখতে এর আগে এত ব্যাপকভাবে সে দেখেনি।

কিন্তু এইবারে গোবিন্দর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা মর্মন্তুদও বটে।

মানুষের হৃদয় অতি বিচিত্র, নানা খাতে নানারকম করে তার গতি। অতি ভালোবেসে সেই হৃদয়কে বুঝতে হয়। ছোট্ট শিশুটির মতো অতি সাবধানে নাড়া-চাড়া করতে হয় সেটিকে। নইলে তা তোমার ওপর মর্মান্তিক প্রতিশোধ নেবে।

মালতী আর গায়ত্রীর কথা মনে পড়ে তার। এই দুটি মেয়ে তার জীবনে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে গেছে। একজন তাকে মারতে চেয়েছিল, অন্য জন নিজেকে মেরে তাকে বাঁচিয়ে গেছে। তাদের পরিণতি হল কী করে এমনতর? তার জন্যে সে-ই দায়ী। ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে সে জড়িত।

মা মারা যাবার কিছুদিন পরে মালতী তার বাড়িতে ডেকেছিল গোবিন্দকে। সতীশের মারফৎ এসেছিল সেই অনুরোধ, সেই তাকে পৌঁছে দিয়েছিল। মালতী রুটি সেঁকে বেগুন ভাজা দিয়ে খাওয়ালে। তারপর গোবিন্দ উঠতে চাইলে বলেছিল, 'বস না গোবিন্দদা একটু।'

তখন শীতের রাত্রি, রাতও হয়েছিল। বাইরে শীতে বাতাসটা ভারী হয়ে আসছিল।

'কি বলবি বল, আমাকে আবার কতদূর যেতে হবে জানিস তো। তুই তো এখন লেপের মধ্যে ঢুকবি।'

'বড় ভাগ্যি আমার, রাজ্যের লেপ বালিশ আমার ঘরে গিজগিজ করছে।' বলে ওর সামনে এসে পিঁড়ি পেতে বসল মালতী।

কী যেন ও বলবে, অথচ বলতে পারছে না। চোখ নিচু করে নখ খোঁটরাচ্ছে। সেটা লক্ষ্য করে গোবিন্দ বললে, 'কি রে, কিছু বলবি ?'

'তোমরা খুব ভাল লোক, লয় গোবিন্দদা ? তোমরা খুব ভালো লোক।' বলে হঠাৎ ওর মুখের দিকে একবার চাইলে, আবার হঠাৎই চোখ নামিয়ে নিলে। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'তার মানে ? মানে কি হল তোর কথার ?' অতি তীক্ষ্ণ সকৌতুক একটি হাসি গোবিন্দর ঠোঁটে ঝকঝক করে।

মালতী আরো ঘাবড়ে যায়।

কিন্তু মনের কথাটা বলতেই হবে যে কোন রকমে। এই সুযোগ ছাড়লে তো হবে না। কতদিন ধরে ভেবেছে সে। আজ না বললে মরে যাবে।

'আমি খুব খারাপ মেয়ে, লয় ? আমি মুখ্যু, লয় ? তোমার পায়ের নখের যুগ্যি লয়।' বলে একবার হাসবার চেষ্টা করলে, তাতে ও আরো অসহায় হয়ে পড়ল।

'না হয় তুই আমার পায়ের নখের যোগ্য নস, তাতে হল কী। সেইটে বল।'

এর পর গম্ভীর হয়ে গেল মালতী। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ও কী ভাবলে বোঝা গেল না, কিন্তু বললে, 'লোকে আমাকে খারাপ মেয়ে বলে, গোবিন্দদা, আমি খারাপ লয়। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।'

গোবিন্দ এবার হো-হো করে হেসে দিল : 'লোকে বলল বা না বলল তাতে কি। তুই যখন খারাপ নস, তখন আরো ভাল।'

এরপর আর কী বলা যেতে পারে। অতএব, মালতী, গোবিন্দ চলে যাবার সময় প্রণাম করল শুধু, পায়ের ধুলো নিলে।……

একটি দুঃখী মেয়ের অতি নরম ভালোবাসা সে ফুলের পাপড়ির মতো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলেছে। আর তার প্রতিশোধও নিয়েছে মালতী। একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে গোবিন্দর কাছে।

কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না গোবিন্দ। তার হৃদয়হীনতার জন্যেই তো এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে। কোন মতেই সে ক্ষমা করতে পারবে না নিজেকে।

শুধু এই নয়। তার স্ত্রী গায়ত্রীর পরিণতিও তারই জন্যে হয়েছে। কোনদিন সে গায়ত্রীকে স্ত্রীর আদর দেয়নি, একটি মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে যে ভালোবাসা চায় তার এতটুকু পায়নি সে। শুধু ক্ষমা পেয়েছিল। কুমারী

অবস্থায় যে অপরাধ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে অপরাধের ক্ষমা। ছোঃ। আর গোবিন্দ মানুষের মত তৈরী করতে চেয়েছিল মেয়েটাকে! লেখাপড়া শিখিয়ে, তার কাজের মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছিল।

মালতী সেই রাত্রে কী আবেদন জানিয়েছিল, তখন তা বুঝতে পারে নি কেন সে? মালতীকে বিবাহ করে সে কী তাকে সার্থক করতে, নিজে সুখী হতে পারত না? মাও তাকে বলে গিয়েছিলেন বিয়ে করতে, গরীবের ঘরের মেয়ে আনতে। সে নিজেও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারপর ভুলে গিয়েছিল কী করে সে? মালতী তাকে সেদিন সেই প্রতিশ্রুতির কথাই নীরবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আর দুর্বিনীত সে, পাষণ্ড সে, সেদিকে ফিরেও তাকায়নি।

না, এ অপরাধের ক্ষমা হয় না।

মর্মান্তিক বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলে। ও বুক চেপে কেবলই পড়ে থাকে। অহরহ জ্বালা করছে যেন।

কবিগুরুর কোন কবিতা সে যেন পড়েছিল। লাইনগুলো মনে নেই তার: আমার বক্ষে যে তুমি অমন আঘাত করছ, যদি পাথর ফেটে উৎস না বেরোয় তাহলে তুমি কী করবে।

হ্যাঁ, আমাকে সফল করো। পাষাণ গলিয়ে দাও। আমার পাপ ক্ষালন করো, আমার বেদনা সার্থক করো।

আঠাশ

এরপর দীর্ঘদিন বিরতি।

এমনিতেই আষাঢ় মাসের শেষ হয়ে গিয়েছিল। কৃষকরা ধান-বোনা, জমি তৈরী করা ধান রোয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত রইল প্রায় সারা বর্ষাকালটা। কোনদিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না কারুর। এমন কি নিজের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের ভাবনা পর্যন্ত না। রোজকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা খাওয়া-দাওয়ার মতো যন্ত্রবৎ ব্যাপারটা শেষ করে দিলে।

শরৎকালে ওরা জমির বাড়ন্ত ধানগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। বা খালে বিলে কোঁচ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বকের মতো।

হেমন্তে ওদের বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল যেন। ধানশীষ দেখে দেখে জেগে উঠল ওরা। জৈবিক নিয়মেই রক্ত চলাচল ওদের আরো সতেজ হয়। ওরা আশা করতে শুরু করে। এতদিন তাকালেই ওদের চোখে একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব দেখা যেত, সেখানে স্নিগ্ধতা দেখা দিল। মুখের টান টান রেখাগুলো নরম হয়ে এল একটু।

লখীন্দর আর থাকতে পারল না। ও দেখা করল গোবিন্দর সঙ্গে।

উনত্রিশ

তখনও ভোর হয়নি। লখীন্দর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আস্তে আস্তে আবৃত্তি করতে থাকে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এ অভ্যাস তার চিরদিনের। ঘুম থেকে উঠেই এটা যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করবেই লখীন্দর। তার বাবাও করত, বাবার কাছ থেকেই সে শিখেছে। চোখে মুখে জল দিয়ে পূবদিকে মুখ করে দাঁড়াল লখীন্দর। সামনের মাঠটায় অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। নারিকেল গাছটা আর অশথ গাছটার মাঝখানের আকাশটা একটু পরিষ্কার। ওটা ক্রমে লালবর্ণ হয়ে উঠবে। সূর্যদেব আসছেন। লখীন্দর হাত জড়ো করে প্রণাম করে। মোটা শাদা চাদরটা বুকের ওপর পাক দিয়ে দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে নেয় লখীন্দর, এখনই মাঠে যেতে হবে। যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে চাদরের নিচে একটা ফতুয়াও এঁটে নিয়েছে সে। তবুও রাস্তায় নেমে কাঁপতে থাকে।

চালের বাতা থেকে কাস্তেটা পেড়ে নিয়েছিল সঙ্গে। সেটা কোমরে গুঁজতেই ছ্যাঁৎ করে লাগে। যাক, ও ঠাণ্ডাটা একটু পরেই সয়ে যাবে। বাঁহাতে বিচালি দিয়ে পাকানো রসি আর ডান হাতে হুঁকোটা টানতে টানতে এগোয়। এমনিতে পথের ধুলো ঠাণ্ডা বরফ, রক্ত জমে যাবার উপক্রম। কিন্তু হেঁটে হেঁটে ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। একটু পরেই লখীন্দরের সয়ে যায়।

এখন ধান কাটবার, খামারে ওঠানোর সময়। তাই কাজের চাপ খুব বেশি। লখীন্দর একটা মুনিষ অবিশ্যি করেছে, সে আবার কখন আসে। লখীন্দর ভেবেছিল সেইই বোধহয় সবার আগে মাঠে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে। কিন্তু রাস্তায় আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হল।

'কি লখীন্দদাদা, ভাল আছ ?'

'তোমরাও বেরিছ দেখছি। ভাল ভাল।'

'না বেরালে চলবে কেনে। কাজ ত আর কম নাই।'

মাঠে গিয়ে লখীন্দর অবাক হল। ওর আগেই অনেক লোক এসেছে। তারা ধান কাটতে শুরু করে দিয়েছে কখন।

ভাল, ভাল। লখীন্দর আনন্দিত হয়। এখনকার লোকেরা এইটে বোঝে না যে, সূর্য ওঠার আগেই কাজ এগিয়ে রাখলে কত 'সুসার' হয়। আগে এটা ছিল বটে। তাছাড়া এই ভোর বেলা মাঠে কাটাতে পারলে যত বেলা হবে, তত তোমার জোর বাড়বে। তা কুঁড়েমি করলে হবে কী করে।

লখীন্দর কাজ শুরু করে। এক-'দম' কাজ করবার পর ও যখন মুখ তুলে তাকায়, তখন বেশ চারদিক আলোয় ভরে গেছে। শিশিরগুলো ঝলঝল করছে ঘাসের ডগায়। ওর তখন চার লাচাড়ি (সারি) ধান কাটা হয়ে গেছে।

কলকেটায় আগুন ধরাবে বলে বসেছে এমন সময় রতন এসে হাজির। বলে, 'জান লখীন্দদাদা, তমার জমিএ কাজ করব আমি।'

লখীন্দর একজনকেই ডেকেছিল, ওকে মুনিষ ডাকেনি। কিছু বলেও নি ওকে। তবু যে ও কাজ করবে বলছে তাতে অবাক হয় সে।

রতন বলে, 'তুমি আমাকে খেতে দিও চারটি। আর যা হয় দু-চারটে পয়সা দিও। না থাকে দিবে নি। কিন্তু কাজ আমি করলম।' বলে সে ধান কাটা শুরু করে দেয়।

লখীন্দর হেসে বলে, 'বেশ, কর কর।'

লখীন্দর এতক্ষণে সারা মাঠটার দিকে তাকিয়ে দেখে। আঃ, একি! চোখ যে জুড়িয়ে যায়। কতদূর, কতদূর চলে গেছে...ওটাতো রামের জমি, তারপর রঘু খাঁ-এর, তারপর মেঠেনীর যদুবাবুর...তারপর, তারপর, তারপর! কিন্তু সেকথা নয়। প্রত্যেকটি জমিতে ধান কাটতে লেগেছে মেয়েরা, পুরুষেরা। বসে বসে ধান কাটা যায় না, দাঁড়িয়ে শরীরের উপরার্ধ ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাটতে হয়। বাঁহাতে ধানগোছের গোড়া ধরে ডান হাতে কাস্তে চালায়। তারপর ঝুঁকে পড়া শরীরটা একটু ওপরের দিকে ওঠে, বাঁহাতটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে টেনে ধানের গোছাটা দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়, তারপর আবার আগেকার মতো। বাঁহাত ভরে উঠলে এক 'হালা' ধান হবে, সেটা মাটিতে রেখে আবার এক হালা, দু'হালাতে এক আঁটি। এক আঁটি ধান। মেয়েদের হাতের মুঠি ছোট বলে, তাদের তিন হালা লাগে এক আঁটি হতে।

কিন্তু আশ্চর্য। কেউতো কাজ থামাচ্ছে না। লখীন্দর একাই কাজ বন্ধ করে দেখছে। ও একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজে লাগে আবার। রতনকে বলে, 'আজকে মাঠের বাহারটা হইছে দেখেছ!'

'হ্যাঁ, তাইত দেখি।'

কিছুক্ষণ কাজ করার পর লখীন্দর আবার দাঁড়িয়ে দেখে। আবার কিছুক্ষণ কাজ করে। আবার দেখে। দেখে দেখে ওর চোখ দুটি সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

রতন তাড়া লাগায়, 'কাজ বন্ধ করে দিলে যে গো, লখীন্দদাদা।'

'এই ভাই, এই লাগি...' বলে কিছুক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে কাজ করে। তারপর বলে, 'রতন, কী বললে তুমি তখন, তোমার কাজ ছিলনি বলে তুমি ধান কাটতে এলে?'

'হাঁ গো, দাদা। সবাই গাঁ ছেড়ে চলে এল দেখলম। তা আমার ত জমি নাই, তুমি জান। তা নাই থাক। চাষীর বেটা ত আমি। ত আমি ঘরে বসে থাকব? তাই ধান কাটতে এলম। ধান কাটতে ভাল লাগে গো, দাদা। তাছাড়া সবাই কাটছে, আর আমি কাটব নি, ইটা কেমন দেখায়? মনটা থালে খারাপ হয়।'

'ই কথা বললে তুমি? তুমি বললে? তুমি যে আমাকে আনন্দ দিলে রে ভাই।'

'আমি সেই ভোর বেলা উঠে ভাবছিলম কি করব, আমাকে ত কেউ আজ মুনিষ ডাকেনি। তাই ভাবলম যার হোক জমিএ যেয়ে লেগে পড়ব।' ওরা কাজ করতে করতে কথা বলে।

আস্তে আস্তে মাঠের শিশির শুকিয়ে আসে। ক্রমশ গায়ের চাদর গরম বোধ হয়, তখন ওরা সেটা খুলে ফেলে। এক সময় ওরা অল্প-সল্প ঘামতেও শুরু করে।

প্রহর দুই বেলা হলে, কৃষকরা খেতে বসে। প্রথমে দু' একজন শুরু করে, তারপর হাঁক-ডাক করে সবাইকে বসায়। এদিক-ওদিক করে সমস্ত মাঠটায় একই রকম দৃশ্য ফুটে ওঠে। 'জলখাবার' বেলা হয়ে গেছে। যাদের দূরে দূরে ঘর, তারা মুড়ি-পেঁয়াজ কলাই শুঁটি বেঁধেই এনেছিল। অন্যদের জন্যে পাশাপাশি গাঁ থেকে ঘরের ছেলেমেয়েরা জলখাবার নিয়ে হাজির হয়।

গামছার খুঁটে কোঁচড় তৈরী করে মুড়ি খেতে শুরু করে। জাম্বাটিতে ভিজিয়ে নেয় কেউ। খেতে খেতে গল্প-সল্প চলে, যারা এখনো কাজ করছে, তাদেরকে ডাকে, 'ও খুড়া, আর কেনে, শরীলে একটুন জোর করে লাও কেনে, বেলা ত কম হলনি...'

মাঠে ভাত কিংবা রাঁধা কোন জিনিস আনা বারণ, মা-লক্ষ্মী তাহলে বেরাগ হবেন। তাই, যাদের বাড়ি সেদিন মুড়ি নেই, তারা একছুটে গিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে আসে।

লখীন্দরের মুড়ি আনবে টুকি। কিন্তু কী জানি কেন সে দেরী করছে। পাশের জমির হারাণ লক্ষ্য করছিল সেটা, সে ওকে ডাকলে, 'লখীন্দদাদা, এস গো, আমাদের সঙ্গে বসে যাও।'

'না ভাই না, তোমরা বস, এই টুকি এখনি এল বলে...'

কিন্তু লখীন্দরের কিন্তু এই নেমন্তন্নটা ভালোই লাগে। ওদের সঙ্গে এক সাথে বসে খেতে তার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কতদিন সে এমন করে খায়নি। কিন্তু সে তো একা নয়, রতন আছে, সেই মুনিষটি আছে।

হারাণ কিন্তু ছাড়ে না, লখীন্দরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, টুকি মা যখন আসবে, তখন লয় আমরাও ভাগ পাব। তোমার দাদা রাজার ঘর, তোমার ঘর ঠিঙে কত কী আসবে, গরীবের শুধু লঙ্কা মুড়ি, তো এস কেনে। রতন, তোমরা এস গো...'

লখীন্দর কোঁচড় পেতে মুড়ি, খেঁসারির ডাল সেদ্ধ, আর কাঁচা লঙ্কা নেয়। 'দাও, দাও, লখীন্দদাদাকে দুটা পিঁয়াজ দাও গো...'

খেতে খেতে নানারকম কথাবার্তা হয়।

'লখীন্দদাদা, টুকি মায়ের বিয়া দাও এবারে...'

'তাই ভাবছি। হাতে তেমন পাত্তর থাকে ত বলবে ভাই।'

হারাণ বলে, 'আমাদের মাকে দেখেছ? অ মা, বড় মা, তোমার লখীন্দ-দাদাকে পন্নাম কর মা...' লখীন্দর সম্পর্কে সবারই দাদা (দাদু), সবারই ঠাট্টার লোক।

একটু দূরে হারাণের বড় বিধবা মেয়ে, আর নব পুত্রবধূ এদিকে পিঠ করে মুড়ি চিবোচ্ছিল। বউটির উল্লেখে সে লজ্জায় এত বড় ঘোমটা টানে। ঘটির জলে হাতটা ধুয়ে পায়ে পায়ে এসে লখীন্দরকে প্রণাম করে একটা।

'অ লাত বউ, মুখটা একটু দেখি গো। আমি তোমার বর হই যে...'

মেয়েটি আরো লজ্জা পেয়ে ত্রস্ত হয়ে পালায়। হারাণের বড় মেয়ে বলে, 'ই তুমি ঠিক বলেছ, লখীন্দদাদা। কিন্তু তুমি যে বুড়া হইচ গো...'

লখীন্দর বলে, 'বুড়া বলেই ত আদর বেশি, ভাই। আর তুমি বললে কি হবে, লাত-বৌএর ঠিক আমাকে পছন্দ হইচে, দেখলে কেমন মান করে তিড়িং করে পালি' গেল...হুঁ।' 'তিড়িং' কথাটা এমন ভঙ্গী করে লখীন্দর উচ্চারণ করলে, যে সবাই হেসে ফেললে। নতুন বউটি থামতে পারে না, ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ও ননদের হাতটা ধরে। ননদ বলে, 'আ মল, এগবারে গেলি যে লো...'

লখীন্দর রতনকে বলে, 'তুমি একলা এখন একটু কাজ কর ভাই, আমি মাঠটা একটু ঘুরে দেখে লিই...'

রতন বুঝতে পারে না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। লখীন্দর বলে, 'অনেকদিন এমনটি দেখিনি ভাই, আজ আমার পেরাণটা খুব শান্তি পেল ..'

সব জমিতেই ধান কাটা হচ্ছে না। অনেক জমিতে ধানের আঁটি বাঁধা হচ্ছে। এই আঁটি বইতেও শুরু করেছে কেউ কেউ। সেই ধান খামারে নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে, তারপর গাদা দিতে হবে। যতদিন না ধান ঝেড়ে খামারে তোলা হয়, ততদিন খামারে রোজ ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করা চাই, তুলসীতলার মতো রোজ সন্ধ্যা দেখাতে হবে। প্রণাম করতে হবে।

ধানের আঁটি বাঁধা দেখতে লখীন্দরের খুব ভালো লাগে। প্রথমে কয়েক গাছি ধান শুদ্ধ খড় দুহাত দিয়ে ধরতে হবে, যেন দুহাতের মুঠোর মাঝখানে কিছু ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকের অংশটুকু দিয়ে চেপে ধরতে হবে আঁটির তাড়া, তারপর কৌশলে বেড় দিয়ে জমি থেকে তুলে নিতে হবে, প্রথমে ডানদিক্ থেকে বাঁদিকে তারপর সামনে, ধানের আঁটিগুলিকে বেশ দোলা দিতে হয়। তবেই শক্ত করে বাঁধা হবে। লখীন্দর কিন্তু বেশি দূর এগোয় না। ও যে কাজ ছেড়ে এসেছে এবং আর সবাই কাজ করে চলেছে, তাতেই ওকে পেছনে টানে। ও শুধু কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে আসে।

'জান ভাই রতন, এই মা লক্ষ্মীর সেবা করতে পাই বলেই এখনো বেঁচে আছি। তা নালে কবে মরে যেতম।'

'ই কথা ঠিক বলেছ, লখীন্দদাদা, ইকথা ঠিক বলেছ।'

পাশে হারাণের জমিতে ধানের বোঝা বাঁধা হচ্ছে, রাম, রামে রাম দুই, রামে দুই তিন......। গণ্ডা হিসেবে বোঝা বাঁধছে ওরা। কত ফলেছে দেখবার জন্যে।

একটা গরুর গাড়ি এসেছে, সেটাতে যা ধরে বোঝাই করা হল। কিন্তু সেটা চলে গেলেও কিছু বাকি থাকে। সেগুলো ওরা চারজনে মিলে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে।

বিকেলের শেষ হয়ে এসেছে। আবার শীত পেতে শুরু করে। লখীন্দর আজ আর কাজ করবে না, বাকিটা কাল করবে। তাছাড়া ওর এখনো অনেক বাকি, ধান 'এঁটোতে' হবে, বইতে হবে।

'রতন, তুমি এ-ক'দিন আমার একটু লেগে পেতে দাও। পরশু থেকে সে-মাঠে লাগব, তখন আরও কটা মুনিষ চাই...'

এই সময় একটা ব্যাপার ঘটে। হারাণের নতুন-বৌটি বোঝা মাথায় করে এগোচ্ছিল। বোঝাটা তার পক্ষে একটু বড়ই হয়েছিল বলতে হবে। ননদ হেসে হেসে কেবলই বলছিল, 'এই পড়ল, এই উলটি' পড়ল গো...' উদ্দেশ্য, এতে যার মাথায় বোঝা সে আরো সতর্ক হয়ে উঠবে, বোঝা বইবার ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু বেচারী বউটি একটা উঁচু আল ডিঙোতে গিয়ে পায়ে শাড়ী জড়িয়ে পড়ে যায়। সবাই ছুটে আসে। শ্বশুর, স্বামী, ননদ, আরো দুএকজন লোক। লখীন্দরও যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়, কাছে এগিয়ে আসে।

'আহা, পড়ে গেল...'

ধান অনেকগুলি শিস থেকে ঝরে ঝরে পড়ে গেছে। বোঝাটাও একরকম খুলে ঢিলে হয়ে গেছে।

কেউ কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ এমন সময় ননদটি হেসে ফেলে, 'লখীন্দদাদা, দেখ দেখ, বউএর মুখটা দেখ।'

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছল বউটি। এতগুলি ধান ঝরে পড়ে গেল, ওকে না জানি কী বলবে।

ওর মাথার কাপড় খুলে গেছল, এমনভাবে মুখটা ফাঁক করে ও দাঁড়িয়ে ছিল যে, দেখে হাসি চাপা দুষ্কর। ননদের সঙ্গে সবাই যোগ দেয়, প্রথমে ওর স্বামী তারপর লখীন্দর, তারপর হারাণ। লখীন্দর কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে কেবলই। ওর মুখ দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিট্‌কে ছিট্‌কে বেরোয়, ও কোমরে হাত দিয়ে ঠাঠা করে হাসে। অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে বলে, 'বাহা রে লাতবৌ, বাঃ...'

হারাণ কিন্তু তারপর খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। বললে; 'লখীন্দদাদা, ধান ঝরে পড়ে গেল, ইটা অমঙ্গল হয়নি?' আবার সবাই গম্ভীর হয়ে ওঠে। লখীন্দর কিছু আশ্বাস দেয়, 'না ভাই, ই ত রাস্তায় পড়েনি যে অমঙ্গল হবে। জমিএ পড়লে দোষ নাই। তা ছাড়া ই তোমার নিজের জমি। এক কাজ কর, ই ধানগুলি তুমি তুলে লাও খুঁটে খুঁটে, ভাত রাঁধবে নি, লক্ষ্মীর পেসাদ করে পৌষপাব্বণ করবে।'

যাক্। ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আর মেয়ে দুটি তৎক্ষণাৎ কোঁচড়ে করে ধান খুঁটতে থাকে।

গ্রামের পথ দিয়ে মাথায় করে ধান নিয়ে নিয়ে আসছে কৃষকেরা, মজুরেরা। ঝিম্‌ঝিম্ করে অতি মৃদু শব্দ হচ্ছে, অতি মিষ্টি। ওদের চলবার কেমন একটা ছন্দ আছে, কী সুন্দর লাগে দেখতে। লখীন্দর খুশি হয়। কত দিন, কত দিন ও

এমনি শব্দ শুনে আসছে। সেই ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে যখন মাঠে যেত তখন থেকে। আশ্চর্য। ও চোখ বোজে একবার।

'ও আমার গাঁয়ের লক্ষ্মী মাগো...'

বৈরাগী গান গেয়ে ভিক্ষা সেরে বাড়ি আসছে। আশ্চর্য সুন্দর ওর গলা, গ্রামের লোকেরা ওকে ডেকে গান শুনবে, ভক্তি করবে। সব চেয়ে ওর চরিত্রের গুণ, লোকের সঙ্গে কী ব্যবহার, কোন দোষ নাই। 'ও আমার গাঁয়ের লক্ষ্মী মাগো, তুমি আমার প্রণাম লও...'

বৈরাগী কাছে আসতে লখীন্দর দুহাত জড়ো করে নমস্কার করে।

ত্রিশ

'গোবিন্দ, ভাই, এই সময় কিছু একটা কর।'

বোঝা গেল লখীন্দর কথায় ঠাসা হয়ে এসেছে। অতি শান্তভাবে কথাও বলছে, কিন্তু সে যেন কানায় কানায় ভরা নদী। জলে টই-টই, কিন্তু হুড়োহুড়ি নেই।

'তাই করব।' গোবিন্দরও কথা কিছু কম আছে বলে মনে হয় না।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে আনন্দিত হয়েছে।

'কি করবে ভাই, বল আমাকে।'

'আমরা ছাব্বিশে জানুয়ারি পালন করব কৃষক-সভার পক্ষ থেকে। ছাব্বিশে জানুয়ারি কী জানো? তবে শোন...'

'তাই কর। তোমার উবরে আমার খুব বিশ্বাস হইছে, ভাই। আমার মন বলছে, তুমি ছাড়া ই কাজ কেউ পারবেনি। কেউ পারবেনি।' আবার বললে, 'হ্যাঁ, কি করবে বলছিলে? কবে করবে?'

'ছাব্বিশে জানুয়ারি। সে এখনো একমাস দেরী আছে।'

'এ-ক-মা-স—! সে যে অনেক। অতদিন কী চাষারা অমনটি থাকবে...' বলে সে কি যেন চিন্তা করলে, তারপর বললে, 'আমি কি দেখলম জান। চাষা জমিতে পড়ে আছে। আনন্দ করে ধান কাটছে, এঁটাচ্ছে। জান ভাই, ই হচ্ছে আনন্দের কথা। চাষার বউ এবুরে কাপড় চাইবে, চুড়ি চাইবে।'

নিজের মনেই মাথা নাড়ল লখীন্দর। মিলিয়ে নিল কিছু যেন। 'এই হল গিয়ে কথা। মানুষ যদি মানুষের সঙ্গে হেসে না কথা বলল, তাহলে হল কি। ত এতদিন পরে সেইটে আমি দেখলম। যাতে এইটা থাকে, তাই কর।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গোবিন্দ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'আমি তো সুখ দিতে পারব না। আমি স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারি। কিন্তু তাতে কষ্ট আছে।'

লখীন্দর সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাল।

'আমি যে ঠিক বুঝতে পারলম নি ভাই।'

'লখীন্দদাদা, তোমাকে তো আমি ছাব্বিশে জানুয়ারি সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছিলাম। তুমি জান না। শোন বলি। ছাব্বিশে জানুয়ারি আমরা এতদিন পালন করেছি স্বাধীনতা-দিবস হিসেবে। এবারেও তাই করব। আমাদের কথা আমরা মুখ ফুটে বলতে পারিনে, তার স্বাধীনতা চাই। আমাদের ভাগ্য আমরা নিয়ন্ত্রণ করব, তার স্বাধীনতা চাই। চাই, মানে কারো কাছে ভিক্ষে করে নয়। সেটা আমরা সৃষ্টি করে তুলব। আমরা রক্ষা করব। কিন্তু তাতে যে দুঃখ আছে।'

গোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'অবিশ্যি, দুঃখ আছে বলে আনন্দ নেই, তা নয়। আনন্দ এক অদ্ভুত জিনিস, লখীন্দদাদা। সব সময়ে একে গড়ে তুলতে হয়। কোন এক তীব্র আনন্দের সময় তুমি যদি মনে করলে তোমার আনন্দ পাওয়া হয়ে গেছে, তাহলে তুমি গেলে। প্রত্যেক মুহূর্তে সজাগ থাকতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই। স্বাধীনতা চাই। কার কাছে ? না, পরস্পরের কাছে। আর সবাই মিলে হাত-ধরাধরি করে সেই স্বাধীনতা গড়ে তুলব।'

'একথা তোমার সত্য, গোবিন্দ। একে অন্যকে না দেখলে মঙ্গল নাই, আর মঙ্গল না হলে আনন্দও নাই। আমি ই কথা হাজার বার মানি।'

'লখীন্দদাদা, জীবন-সংগ্রামের কথা শুনেছ ? প্রত্যেক মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়। এক পা এগিয়ে গিয়ে থামতে নেই, আর এক পা এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হতে হয়। আমরা গেল বছর এক পা এগিয়েছি, এবারে আর এক পা। যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে মরে যাব।'

'যদি না পারি ?'

'অসম্ভব। এ না পেরে উপায় নেই। ভেবে দেখ, আমরা ত চিরকাল এই পৃথিবীতে ছিলুম না। আমাদের আগে আমাদের পিতা পিতামহ ছিলেন। তাঁদেরও আগে তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে এই স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন। কত তো অত্যাচার হয়েছে, পেরেছে তাঁদের থামাতে ? সেই ভার এখন আমাদের ওপর।' ও আবার বললে, 'ধর আমরা মরে গেলাম, কিন্তু তাতেই কী। আমাদের ভার আর একদল নেবে।'

'ই তুমি কী কথা শুনালে ভাই। ই আমার মনের কথা তুমি বলেছ। আমাদের পিত্রিপুরুষের অত কথা আমি জানিনি, কিন্তু আমি দেখেছি, একজন

মানুষ না পারলে তার কাজ আর একজন করে। তবে হ্যাঁ, যে করতে পারল নি, তার মত হতভাগ্য নাই আর। অন্যায়কে মেনে নিলেই পাপ তোমাকে গেরাস করবে। গোবিন্দ, আমি আর থানায় যাবনি, উ আইন আমি মানবনি আর।'

দীর্ঘ আলোচনা চালাল ওরা। পরস্পরের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি মিলিয়ে মিলিয়ে একে অন্যকে গ্রহণ করল।

পরিশেষে সুধীরের কথা ওঠে।

'বাবাকে আমার একবার দেখতে পাবনি, সে কি এখানে নাই?'

'না, তাকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছে। লড়াই করবার কায়দাকানুন শিখতে গেছে সে। আমরা আর দাঁড়িয়ে মার খাব-না, আমাদের মার দিলে আমরাও দেব।'

'হ্যাঁ? কিন্তু সুধীরের হাতে ঐ ভার দিলে কেন। সে যে পাগলা, তার মাথা ভীষণ গরম। মারামারি খুব খারাপ জিনিস, গোবিন্দ...' খবরটাকে লখীন্দর এত সহজে নেবে গোবিন্দ ধারণা করতে পারেনি। ওর ধারণা ছিল মারামারির কথা উঠলে লখীন্দর ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু একটু পরে আরো খানিকটে ভেবে লখীন্দর বললে, 'কুরুক্ষেত্তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেছিল : আমি আগেই সব মেরে রেখেছি, তুমি শুধু উপলক্ষ্য। তবে, সুধীর বড় ছেলেমানুষ। ই কাজে খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। দেখ, তোমার হাতে একটা লাঠি আছে, তা সেই লাঠি দিয়ে তুমি সাপও মারতে পার, নিজের মাথাও ভাঙতে পার। তা সেই রকম মাথা চাই...'

গোবিন্দ ওকে সান্ত্বনা দেয়। 'তোমারই ছেলেতো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া, মানুষ শিক্ষার গুণে সব কিছু করতে পারে।'

কথাবার্তা শেষ হবার পর গোবিন্দ বললে, 'চল, তোমাকে বনটা একটু পার করে দিয়ে আসি।'

'না, না। আমি যেতে পারব ঠিক। তোমার আবার রান্না-বান্না আছে।'

'ও কিছু না। আমি এই চাল চড়িয়ে দিলাম, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে ফুটে উঠবে।' গোবিন্দ হাঁড়িতে চাল চড়াতে থাকে।

লখীন্দর এতক্ষণ কথাবার্তায় মগ্ন ছিল বলে খেয়াল করে নি। এতক্ষণে ঘরটা চোখে পড়ল। ডোমের তৈরী চাঁচ দিয়ে দেয়াল তোলা। তার ওপর মাটির প্রলেপ পড়েছে। তালপাতা আর খড় মিশিয়ে চাল ছাওয়া।

মেঝের ওপর দুটো ত্যালাই বিছানো। দুটো কম্বল, একটা দড়িতে কয়েকটা জামা কাপড় ঝুলছে। 'গোবিন্দ-ভাই, একবারে সংসার করে ফেলেছ।'

'তাই। মহাভারত পড়েছ, লখীন্দদাদা? এ হচ্ছে আমাদের বনবাস। জনপাঁচেকই থাকি আমরা। তার মধ্যে রেঁধে মরি আমি আর সতীশ। বাকিরা জ্বালন কাটে, জল আনে।'

'সবই আছে ভাই, একটি দ্রৌপদী থাকলে হত।'

হঠাৎ যেন পায়ের অতি নরম জায়গায় কাঁটা ফোটে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় গোবিন্দ।

'কে, পাঞ্চালী? হবে, হবে। একদিন হবে।'

'মহাভারতের কথা যদি বললে ভাই, ত আমি একটা কথা বলি। ধম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে পাঠি' ছিল অস্ত্র শিক্ষা করতে। ত তুমিও সুধীরকে পাঠিছ।'

'এ তুমি ঠিক বলেছ। পাণ্ডব কৌরবের সঙ্গে একদিন শক্তিপরীক্ষা তো হবেই।'

কুটির থেকে বেরুতেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। এতক্ষণ পিদিমের আলোতে ছিল, তাই কিছুই দেখা যায় না।

এদিক ওদিক দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর গোবিন্দ বললে, 'লখীন্দদাদা, একলা ত চলে যাবে বলেছিলে। যাও দেখি।'

লখীন্দরের ইতিমধ্যেই ধাঁধা লেগেছিল। বললে, 'হার মানলম ভাই। এই পাশের গাঁয়েই থাকি বটে, ত ই আমি নিশান পেলমনি।'

কোন কোন গাছ লম্বা, কোন কোন গাছ ঝাঁকড়া হয়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে। কোনটাকেই চেনা যায় না।

'লখীন্দদাদা, এই যে এত ঝোপ দেখছ, যদি কেউ তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ওখান থেকে?

'না, আমার ঘাড়ে পড়বেনি কেউ।'

'পড়বে, পড়বে। যদি কোন দিন আমাদের পিছু ধাওয়া কর, তাহলে দেখবে, ওই ঝোপগুলোই ভূত হয়ে ঘাড়ে পড়বে। বন্দুকই আন, আর কামানই আন, এখানে হল ভূতের রাজত্বি।'

ওরা দুজনেই হাসল।

একত্রিশ

২৬শে জানুয়ারি অতি প্রত্যূষে উঠেই কৃষকেরা অবাক হয়ে গেল। ছেলেরা, ব্যাপারটার সমস্তটা বুঝল না, তবু আনন্দে লাফিয়ে, হাততালি দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল ওরা।

প্রথম মল্লিকা দেখলে, একটা লাল পতাকা তাদের উঠোনের পাশে শিরিষ গাছটায় উড়ছে। ও ছুটে গিয়ে মাকে বললে। ওর মা দেখে ছুটে গিয়ে জাগালে কৃষকটিকে। 'ওগো, দেখবে এস, দেখবে এস, আমাদের শিরিষ গাছে... বলি, উঠ না গো...'

কৃষকটি উঠে এসে দেখলে। ঘুম তখনো তার ছাড়েনি, পুবদিকে লালবর্ণ হতে শুরু করেছে। বোধহয় ওর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু তারপরে ও গম্ভীর হয়ে গেল। কী করতে হবে বুঝতে পারল না।

মল্লিকা ইতিমধ্যে আর একটা পতাকা আবিষ্কার করেছে। 'ঐ যে গো, ঐ অশথ গাছটায়, একটা নয় মা, তিনটে। হি-হি।'

পাশের বাড়ির গয়লাদের খোঁড়া ছেলে মুকুন্দ ডাকছে, 'মল্লিকা ও মল্লিকা, দেখ, দেখ অশথ গাছে, পতাকা দেখ!'

'ওমা, আমাকে দেখায় দেখ। আমি আগে দেখলম নি?

'ও আমার আহ্লাদী মেয়ে, আমি সেই কখন ঠিঙে দেখছি।'

ছেলে মেয়েরা রাস্তায় নামল। এখান থেকে ওখানে। সব পতাকাগুলো দেখবে ওরা।

'ঐ রে, ঐ একটা। চল দেখি।'

গ্রাম ছেড়ে অন্যগ্রামে ওরা গেল। সেখানেও ঐ ব্যাপার। কিন্তু ওরা আর কতদূর যাবে? যদি হারিয়ে যায়?

সেই খোঁড়া মুকুন্দ ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছিল, সে বললে, 'জানু মল্লিকা, সমস্ত পিথিমিতে পতাকা উড়ছে, বুঝলি। কত আর দেখব। চল ঘুরে যাই।'

পতাকা হাতে নিয়ে কৃষকেরা বেরোল একটু পরে। পাড়ার থেকে চার পাঁচজন মাত্র, রমানাথ, কালু, কানাই আর অনিরুদ্ধ, আর সেই মুকুন্দ। মুকুন্দ মল্লিকাকে ডেকেছিল, কিন্তু মল্লিকা যায়নি, বলেছে, 'আমি যে খুব ছোট। তোর মত বড় হলে যেতম। ওখেনে কি হয় এসে আমাকে বলবি।'

বাগ্‌দি পাড়ার তিনজন বেরোল। অবিশ্যি পাড়াটা খুব ছোট। 'ওগো দক্ষ-পিসী যাবে নাকি গো।'

'হ্যাঁ, বাবা, তোরা সব কি করু দেখব।' 'এস বাবু এস।' এ পাড়া-ওপাড়া করে সমস্ত গ্রামটাতে জন চল্লিশেক লোক বেরোল। ছোট্ট গ্রাম, ওই যথেষ্ট।

'বল ভাই বল—স্বাধীন দিবস—'

'স্বাধীন দিবস জয়।'

অতি শান্ত নির্জীব মাঠগুলিতে এই আওয়াজ স্বাভাবিক নয়। কতদিন ধরে পড়ে আছে ওগুলি। একটি গ্রাম্য মেয়ের মতো অতি শান্ত, কোন রকমে দিনগুলো নিশ্চুপ হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ তাকে ঘা-মারা হচ্ছে যেন।

চারদিক থেকে লোক আসছে দেখতে। মাঠের এদিকে-ওদিকে ছুটে ছুটে আসছে ওরা।

'কতদূর যাবে গো...'

'ঝাঁকরা।'

সবার আগে পৌঁছল বালা-কিয়াগেড়ের দল। ওদের দলটাই বড় সব চেয়ে, ওরা অনেকদূর দিয়ে ঘুরেও এসেছে। তারপর শাওড়া-শ্যামগঞ্জ। ধানগাছিয়া। শীরষে-কেঁচকাপুর। ওহে শোন, শোন, আমনপুর থেকে লোক এসেছে, দেখনি?

'নমস্কার।' 'পন্নাম লিও ভাই।'

'আর ইদিকে দেখ। কেশপুর ঠিঙে এসেছে।' এদের দল আসেনি, কয়েকজন এসেছে মাত্র।

'এঁ্যা? তাই বুঝি? কত আনন্দ পেলম। তোমাদের মত কিছু করতে পারিনি আমরা। তোমরা আমাদের গুরু, ই কথা বলতে গেলে।'

'উটি বলবে নি, ভাই। একজনে কি সব হয়। গত বছর তোমরা যা করেছ, কেউ কখনো ভুলবেনি।'

শহর ঠিক বলা যায় না, একটা বড় গঞ্জের মতো জায়গাটা। ঝাঁকরা। তবে কাজ-কর্ম আমদানী-রপ্তানীর জায়গা। ধানের ব্যবসাই বেশি। এখান থেকে সমস্ত অঞ্চলটার ধান রপ্তানি হয়। দু'সারি দোকানপাট আছে। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাওয়া, অনেক খড়ের ছাওয়াও আছে। কাপড়-চোপড় মনোহারী দোকান। মাল আসে প্রধানত ঘাটাল, নয়তো খড়্গপুর থেকে। কলকাতা থেকেও আসে, তবে খুব কম।

সেইখানে এসে দলগুলো বসে পড়ল। একটা মোড়ের মতো রয়েছে।

এক কৃষকের জ্বর হয়ে গিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে তার ভাইপোকে বের করা হল। 'লাও বাবু, তোমার খুড়াকে দেখ একটু।'

'লাও ঠেলা। আমি এখন ওই ঝামেলা লিয়েই থাকি। কত করে বললম, খুড়া, তমার কাল জ্বর হইছিল, আজ বেরাও নি। তা শুনা হল নি।'

অন্যত্র একটি কৃষক বললে, 'বলি ও নকুলের মা, তুমি কোথা চললে?'

'নোকলা মাঠে যাবে বলছে, একটু ঘুরি' লিএসি।'

'তাড়াতাড়ি এস বাবু, কাছে-পিঠে থেক। সব সময় দেখতে পারবনি...'

রাধু দলুই মুড়ি এনেছিল বেঁধে। সঙ্গে পেঁয়াজ কড়াইশুঁটি ছিল। ও খুলে বললে, 'মামা, খাই এস।'

'এই দেখ, যদি খাবি ত, শুনবি কি।'

'তা তুমি যাই বল, খিদায় পেট গেল। খেতে খেতে শুনি বাবু।'

সতীশ বলতে উঠেছিল।

'আমরা এই পবিত্র দিনে ঘোষণা করছি, আমাদের ভালো-মন্দ ইষ্ট-অনিষ্ট আমরা বুঝব। আমাদের নিজেদের কথা বলবার অধিকার আমাদের সবারই আছে। যারা আমাদের সুখের ভাত কেড়ে নেয়, আমাদের জীবন দুঃখপূর্ণ করে তোলে, তারা আমাদের দুশমন, তাদের আমরা ক্ষমা করব না।'

তারপর উঠল লখীন্দর। একটা ছোট্ট ঢিপির মতো ছিল জায়গাটায়, সেইখানে উঠে দাঁড়াল ও। দূরের লোকগুলো চিৎকার করে ওঠে, 'শুনতে পাচ্ছি নি, শুনতে পাচ্ছি নি...'

লখীন্দর ডান হাতটা নাড়লে, কি বললে বুঝতে পারা গেল না।

'আমরা শুনতে পাচ্ছিনি গো...' বলে ওরা নিজেরাই ঘন হয়ে এল।

লখীন্দর মহা বিব্রত হয়ে পড়ল। কপালের ঘাম মুছলে একবার; ডান

কাঁধের গামছাটা বাঁ কাঁধে ফেললে। লাঠিটা হাতে তুলল একবার, তারপরে মাটির ওপর রেখে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, প্রবীণ লোক বটে। বাপ-ঠাকুদ্দাকে অমন দেখতম বটে, কিন্তু এখন অমন লোক দেখিনি...' দুটি কৃষকের চোখ লখীন্দরের দিকে, কিন্তু ঘাড় দুটি ওদের কাছাকাছি হয়ে আসে।

'হ্যাঁ, ভাই। অত বয়স হইছে, তবু দেহটা দেখেছ একবার। পুণ্যের জোর আছে ভাই। আমরা ই-কালের পাপে-তাপে ভুগছি, অমন হবে কি করে। ই একটা কিযেন বটে।'

ওদিকে গোবিন্দ ওকে উৎসাহিত করছে, 'বল, লখীন্দদাদা, বল।'

সহসা অতি জোরে শুরু করল লখীন্দর। প্রায় চিৎকার করে। প্রথমটা অতি বিকট শোনায়, তারপর ঠিক হয়ে আসে।

তৃতীয়বার একই কথা বলল ও: 'আপনারা পঞ্চজন এখেনে আছেন, আপনারা লারায়ণ।'

হ্যাঁ, একথা বলতে হয়। কৃষকেরা সব মজলিসে ওই কথা বলে। যেখানে পাঁচজন, সেখানে নারায়ণ। 'আমি ই সবের কিছু জানিনি। অত্যন্ত অধম লোক আমি। আমার ভুল আপনারা নিজগুণে ভাল করে লিবেন।'

'বাহবা, বাঃ। ইকথা ভাল বলেছ লখীন্দর। ভাল বলেছ।'

'সতীশ ভাই বলল, আমাদের সব জিনিস আমরা দেখব। ই অতি উত্তম কথা। আমাদের ধান আমরা দেখব বই কি। আমাদের জমি আমরা দেখব বই কি। আমাদের মান-ইজ্জত ভাল-মন্দ সব আমাদিকে দেখতে হবে। কিন্তু ভাই, আমার ক্ষুদ্দ বুদ্ধিতে এই লেয়, যে ওতে অহংকার করলে চলবেনি। লোভ করলে চলবেনি। সবই আমরা করলম, তবু, আমরা করলম এই কথা বললে চলবেনি। ভাত খাবার সময় কি করতে হয় মনে কর, ভাই, চারটি ভাত পাতের নিচে দিতে হয়, আর একটু জল। কি, না, মা ভূমাতা, তোমার ঠিঙে আমি চাষ করে ফসল লিই নি, তুমি আমাকে পেসাদ দিচ্ছ। সেই পেসাদ আমি খাচ্ছি।'

'লখীন্দর, এ তুমি কি বলছ ভাই। আর তারপর? আবার বল।'

'ইটি পবিত্ত দিন, ইটি আনন্দের দিন। ত আমার ঐ এক কথা, আনন্দ। ভগমানের আনন্দের লীলাখেলা এই পিথিমী, ভাই। ত আনন্দ রাখবে মনে। আনন্দ যদি মনে না থাকে, থালে তুমিই লরক হবে, আর আনন্দ যদি রাখতে পার তাহলে তুমিই স্বগ্গে যাবে।'

নিজের মনে তারপর ও কী মিলিয়ে নিলে। বললে, 'আর ভালবাসা রাখবে, ভাই। মানুষকে ভালবাসবে, পুত্ত-কন্যাকে ভালবাসবে। এই আমাদের দেহেই ভগমান আছেন। পুত্ত-কন্যা-স্ত্রী ভগমান দিয়েছে কেনে? না তোমাকে পরীক্ষা করতে। তুমি যদি তাদিগে ঘেন্না কর, দূরছিঃ কর থালে ভগমান তোমার উব্‌রে বেরাগ হবে। আর একটা কথা, এই সংসার, তোমার পরিবার অতি পবিত্ত, এখেনে পাপ করতে নাই, পাপ করবেনি এখেনে ··' বলে ও মাথা নিচু করে হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করল, তারপর নেমে গেল।

নকুলের মা কাঁদ্‌ছিল। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেল একটা। ভালবেসে ওকে এখন ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

রাধু দোলুই মামার হাতটা সজোরে চেপে রেখেছিল। তার কোঁচড়ের মুড়ি কখন মাটিতে পড়ে গেছে।

আর বলবেনি লখীন্দ? আর বলবেনি? বল, তুমি আবার বল।

'চুপ কর, চুপ কর।'

গোবিন্দ বলতে উঠেছে। ও লখীন্দরের কথার জের ধরে বললে, 'আর, পাপ যেমন আমরা করব না, পাপকে সহ্যও করব না তেমনি। লখীন্দদাদা আনন্দের কথা বলেছেন, সেই আনন্দের শত্রু হচ্ছে পাপ। পাপকে যদি প্রশ্রয় দিই, তাহলে আনন্দ নষ্ট হবে। অতএব পাপকে ধ্বংস করব আমরা।'

কি, কি বললে। একটু পরিষ্কার করে বল। আমরা মুখ্য মানুষ, সব বুঝতে পারবনি।

'অর্থাৎ আনন্দ যদি পেতে হয়, তাহলে পাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ লড়াই আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গেছেন, আমরা করছি, আমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও করতে হবে। এই লড়াইয়ের শেষ নাই কোন দিন। যারা করবে না, তারা এর ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না কখনো!'

কৃষকেরা একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। কারো মুখ একটু বা ফাঁক হয়ে যায়।

'অবিশ্যি, এরও পরিবর্তন আছে। আজ আমাদের কাছে যা আনন্দ, কাল সেটা নাও থাকতে পারে। আজ যেটা পাপ, পরশু দিন সেটা থাকবে না। কিন্তু আর একটা এসে যাবে।'

হ্যাঁ, একথা বোঝা যায়। এই রকমেই দেখা যায় বটে।

'একেই আমরা বলি আনন্দ। আমরা বলি স্বাধীনতা।'

বত্রিশ

বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে উঠোনে কাঠের চৌকীর ওপর বসল লখীন্দর। বেশ শীত আছে বলে ভালো করে চাদর মুড়ি দিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু আজকের শীতটা তার ভালোই লাগে। কপালের ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা লেগে তার একটা আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি হয়। ও ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু চুপ করে বসে থাকে।

রাত্রিটা অন্ধকার। একটু সামনের গাছপালাগুলোও ভালো করে দেখা যায় না। ঐ অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, যেন আকাশ থেকে অন্ধকার ঝরে ঝরে পড়ছে। অতি ধীরে ধীরে নেমে মাটিকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে চুপ করে থাকে যেন। হাত বুলিয়ে দেয় আস্তে আস্তে।

আকাশটা অত্যন্ত পরিষ্কার। তারাগুলি ঝিকমিক্ করছে। সারা আকাশময় কে যেন পিদিম জ্বেলে জ্বেলে সন্ধ্যা দিয়েছে। সেগুলি সস্নেহে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

এক সময় লখীন্দর ভেতরে যাবে বলে উঠেছে, এমন সময় আস্তে আস্তে গোবিন্দ এসে হাজির। 'লখীন্দদাদা।'

লখীন্দর প্রথমটা অবাক হয়, তারপর শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোন কিছু খারাপ খবর এনেছে ভেবে ও উদ্বিগ্ন হয়। গোবিন্দ কিন্তু ওকে আশ্বস্ত করে। না, সে-রকম কিছু নয়।

'তোমার সঙ্গে এর পরে আর দেখা হবে না বোধ হয়, তাই একটু কথা বলতে এলাম। তুমি অন্তরীণ-আদেশ ভঙ্গ করেছ, তোমাকে ওরা নিয়েই যাবে।'

লখীন্দর চুপ করে থাকে।

'আমি কী বলছিলাম জানো, তুমি বাইরে থাকলেই ভালো করতে। কাজ-কর্ম ভালো হত তাহলে।'

লখীন্দর প্রতিবাদ করে, 'না, ভাই না। উকথা বলবে নি। আমি অতি নগণ্য জীব। আমার মত সবাই, কত লোক আছে। উটি তুমি বলবে নি।'

আবার ওরা চুপ করে থাকে। ইতিমধ্যে একটা ত্যালাই পেতে ওরা দুজনে বসেছিল।

অনেকক্ষণ পরে গোবিন্দ বললে, 'ওরা তোমাকে কষ্ট দেবে খুব। জেলে আজকাল অত্যাচারের চরম হচ্ছে।'

লখীন্দর সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার তেমনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাটিকে। ওর চোখ-মুখকে। আচ্ছা, অন্ধকারের কী শব্দ আছে? বোধহয় একটি অতি মৃদু শব্দ, যেন অনুভব করা যায়।

লখীন্দর বললে, 'একথা কেনে বলছ ভাই। আমার কী মিত্যু-ভয় আর আছে? মিত্যু মাহা শান্তি, মাহা-পরিণাম।'

আবার ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর গোবিন্দ বলে, 'তোমার কাছে কেন এসেছিলাম জানো লখীন্দদাদা, তোমার সাহচর্যে এসে আমি শক্তি পেয়েছি, সেকথা স্বীকার করবার জন্যে। তোমার চরিত্র অতি সুন্দর। আরো কি জানো, সুন্দর হলেই শক্তি। আমাদের শক্তি যে অপরাজেয় তা আগে বুদ্ধি দিয়ে জেনেছিলুম, আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি।'

কিন্তু কি ভেবে হঠাৎ ও ভিন্নতর উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে উঠল, 'পৃথিবীর প্রথম থেকে মানুষের কত সম্পদ জমা হয়ে আছে জানো লখীন্দদাদা, সে সব আমাদের। এই শক্তিকে ঠেকাবে কে। আমরা আজ ধন্য হয়ে গেলাম।' ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল গোবিন্দ। তারপর এক সময় কথা বন্ধ করে চুপ করে রইল।

লখীন্দর ওর হাতটা ধরলে ডান হাত দিয়ে: 'তোমাদের মতন ছেলে দেখে মরতেও আনন্দ আছে ভাই।'

ওরা খুব কম কথা বলল; অনেক রাত্রি পর্যন্ত পাশাপাশি বসে রইল দুজনে। মাঝে মাঝে গোবিন্দের নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে চলে যেতে বলেছিল লখীন্দর। কিন্তু গোবিন্দ অস্বীকার করেছে, 'না, আমাকে ধরতে পারবে না।'

কিন্তু এক সময় উঠতে হয়। রাত গড়িয়ে যাচ্ছে।

যাবার সময় গোবিন্দ লখীন্দরকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। তারপরে চলে গেল।

ভোর হয়ে আসছে। শুকতারা দপদপ করছে পুবদিকে।

লখীন্দর সেদিকে তাকিয়ে ঠায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আঃ, এত আনন্দও আছে পৃথিবীতে।

সেদিন নয়, তার পরের দিন সকালে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ওকে।